আব্বাসী যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্যঃ পর্যালোচনা (Arabic Literature in Translation During the Abbasid Period: An Overview)



পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ ইসমাঈল হোসেন

রেজিঃ নং-১৪ (পুনঃ)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০২৪-২০২৫

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

অধ্যাপক, আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মোঃ ইসমাঈল হোসেন, রেজিঃ নং-১৪/২০২৪-২০২৫ (পুনঃ) কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **"আব্বাসী যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্যঃ পর্যালোচনা (Arabic Literature in Translation During the Abbasid Period: An Overview)"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এরূপ গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আব্বাসী যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্যঃ পর্যালোচনা (Arabic Literature in Translation During the Abbasid Period: An Overview)"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব মৌলিক গবেষণাকর্ম। ইতোপূর্বে এ গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

মোঃ ইসমাঈল হোসেন
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিঃ নং-১৪/২০২৪-২০২৫ (পুনঃ)
দ্বিতীয় যোগদানঃ ০৪.০৩.২০২৪
প্রথম যোগদানঃ ০৪.০৩.২০২০
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আ.	:	আলাইহিস সালাম
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা. বি.	:	তারিখবিহীন
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
রা.	:	রাদিআল্লাহু আনহু/রাদিআল্লাহু আনহুমা/রাদিআল্লাহু আনহুম
সম্পা.	:	সম্পাদিত, সম্পাদনা
সং.	:	সংস্করণ
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হি.	:	হিজরী সন
ed. /eds.	:	edited by, edition, editor, editions
p.	:	page
pp.	:	pages
pub.	:	published, publication
trans.	:	translated
vol.	:	volume

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণমালার প্রতিবর্ণায়ন

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণের নাম	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণের নাম
ا	অ	(আলিফ)	ض	দ	(দদ্)
ء	অ/ে	(হাম্যাহ)	ط	ত্ব	(ত্ব)
ب	ব	(বা)	ظ	জ	(জ)
ت	ত	(তা)	ع	উল্টা কমা ‘	(‘আইন)
ة	ত/হ	(সা)	غ	গ	(গ’ইন)
ث	স	(সা)	ف	ফ	(ফা)
ج	জ	(জীম)	ق	ক্ব	(ক্বফ)
ح	হ	(হা)	ك	ক	(কাফ)
خ	খ	(খ)	ل	ল	(লাম)
د	দ	(দাল)	م	ম	(মীম)
ذ	য	(যাল)	ن	ন	(নুন)
ر	র	(র)	ه	হ	(হা)
ز	জ	(জা)	و	ও/উ/ব	(ওয়াও)
س	স	(সীন)	ى	য়/ই	(ইয়া)
ش	শ	(শীন)	ي	ে	(ইয়া)
ص	স	(সদ্)			

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বাগ্রে মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি যার অসীম কৃপা ও অনুগ্রহে আমি **"আব্বাসী যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্যঃ পর্যালোচনা (Arabic Literature in Translation During the Abbasid Period: An Overview)"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পাদনা করতে পেরেছি। শত কোটি দুরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহামানব, নবীকুল শিরোমণি, বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ স্যারের প্রতি; যিনি আমার গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তত্ত্বাবধন করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বিভিন্নভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তিনি শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও সার্বিক বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি সবসময় গবেষণার খোজ-খবর নিতেন। অনেক সময় তিনি আমাকে ফোনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিতেন। এমনকি গাড়িতে ভ্রমণরত অবস্থায় পরামর্শ দিতে বিরক্তবোধ করতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি আমাকে কাছে ডেকে গবেষণার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ করতেন। তিনি আমার অনেক অস্বচ্ছ উপস্থাপনা ও অজ্ঞত ধারণাকে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করেছেন।

আমার গবেষণা কাজে অনেকের উৎসাহ উদ্দীপনা ও দিক-নির্দেশনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় আরবী বিভাগের স্বনামধন্য চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. এ বি এম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী, অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী, অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল-মারুফ এবং অন্যান্য সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দেকে যারা সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে এ অভিসন্দর্ভকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধাভাজন শ্বশুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ কামিল মাদ্রাসার মুফাসসির জনাব মাওলানা আব্দুল মাতিনের প্রতি যিনি আমার এ অভিসন্দর্ভ সম্পাদনে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রাজশাহী সরকারি কলেজের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মোঃ আফাজ উদ্দীন স্যারের প্রতি যিনি আমার এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছেন।

সর্বাত্মক শ্রদ্ধা, সম্মান ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা মোঃ মজনু আলী ও স্নেহময়ী মা তাজকেরাতুন কে, যাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগ, ভালোবাসা, ও অশ্রুসিক্ত দু'য়ার বরকতে মহান আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমার মা-বাবা উভয়কে হাইয়্যাতে তাইয়্যিবাহ দান করেন। আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার ছোট ভাই মোঃ ইস্রাফিল আলী, আলী হানজালা, হযরত আলী, মোঃ সোলায়মান আলী-এর প্রতি যাদের আন্তরিক উৎসাহ, পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে।

এ অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে দীর্ঘ সময় পারিবারিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি সাহস ও উদ্দীপনা দিয়ে সহযোগিতা করায় আমার প্রাণপ্রিয় সহধর্মিনী খাদিজা তানয়িম-এর প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ। আমার স্নেহের সন্তান তাসফিয়া ইসমাঈল বুশরা, আলী আব্দুল্লাহ সাদ ও আব্দুর রহমান মুয়াজকে ভালোবাসা বঞ্চিত করে যে কষ্ট দিয়েছি তার বদলায় মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে স্বীয় দয়ার চাদরে আবৃত করে রাখুন এবং উভয় জগতে সফলতা দান করুন এই দু'য়া করি। অনুরূপভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও আরবী বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রতি; যারা বিভিন্ন সময় সেবা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। এছাড়া যেসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা থেকে আমি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সেসব লেখকের অবদানও আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় বন্ধু মোঃ রন্‌জু মিয়া (এসএএস সুপারিনটেনডেন্ট), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয় অনুজ মোঃ জসিম উদ্দীন ও মোঃ শাহাদাৎ হোসাইন-এর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি যারা অত্যন্ত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সাথে এ অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আমাকে সহায়তা করেছেন। আরো যারা আমাকে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

"আব্বাসী যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্যঃ পর্যালোচনা (Arabic Literature in Translation During the Abbasid Period: An Overview)" শীর্ষক গবেষণাকর্মটিকে চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'আব্বাসী যুগের পরিচিতি'। এ অধ্যায়ে আব্বাসী যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং আব্বাসী যুগের পতনের কারণ সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'। এ অধ্যায়ে অনুবাদের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনাপূর্বক আব্বাসী যুগের অনুবাদ সাহিত্যের বিষয়াবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'আব্বাসী যুগের খ্যাতিমান অনুবাদক' এ অধ্যায়ে আব্বাসী শাসনামলের প্রথিতযশা কয়েকজন অনুবাদকের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর অভিসন্দর্ভের শেষাংশে গবেষণার ফলাফল, উপসংহার এবং গ্রন্থপঞ্জি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ফলাফলে দেখা যায় যে, আরবী ভাষা পৃথিবীর অতিপ্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম ভাষা। এটি 'সামী' বা সেমেটিক ভাষার নিকটতম ভাষা। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এ ভাষায় সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ ঘটে। বর্তমান যুগেও এ ভাষার আবেদন সার্বজনীন। ইসলামের প্রচার ও প্রসার এবং উঁচুমানের সাহিত্য রচনা এ ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় উন্নীত করেছে। অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় আরবী সাহিত্যের সূচনা হয় কবিতার মাধ্যমে এবং এর পরিপূর্ণতা আসে গদ্য সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে। আর এ পূর্ণতার মূলে কাজ করে অনুবাদ সাহিত্য। প্রাচীনকাল থেকেই আরবী অনুবাদ সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয় এবং মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে এর গতি প্রকৃতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে বিকাশ লাভ করে। ইসলাম পূর্ববর্তী আরব সমাজে অনুবাদচর্চার সুস্পষ্ট ধারা ছিল না। তবে আরব উপদ্বীপের সীমান্তবর্তী অঞ্চল-বিশেষত সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন ও নাজরানে-খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের উপস্থিতি আন্তঃসাংস্কৃতিক সংযোগের দ্বার খুলে রেখেছিল। ধর্মীয় পরিবেশ ও বাণিজ্যপথের প্রভাবে কিছু পবিত্র গ্রন্থের আংশিক মৌখিক আরবী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কালে অনুবাদের প্রমাণ পাওয়া যায় সেসময়ে প্রচলিত দোভাষীদের থেকে। তারা বিভিন্ন ভাষার পত্রাবলি পাঠ করে মুহাম্মাদ (স.)-কে বুঝিয়ে দিতেন এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসারে জবাব লিখে দিতেন। এক্ষেত্রে সুরিয়ানী, ফারসী, হাবশী, রোমান ও কিবতী ভাষায় পারদর্শী হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.)-এর অবদান অনস্বীকার্য। আব্বাসীয় শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তার বীজ গ্রীক, সিরীয় ও পারসীয় সংস্কৃতির মিলনে উমাইয়্যা যুগেই উপ্ত হয়। এজন্য এ যুগকেই আরবী অনুবাদ সাহিত্যের সূচনাপর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময়ে অনুবাদের মাধ্যমে আরবরা গ্রীক, পারস্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সীমিত পরিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

আরবী অনুবাদ সাহিত্যের অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধনে আব্বাসীয়দের অবিস্মরণীয় অবদান অনস্বীকার্য। আব্বাসীয় শাসনামল অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মূলত এ আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রথম যুগ ছিল অনুবাদের যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন ভাষায় মানুষের জ্ঞানের যেসব দিক সংরক্ষিত ছিল, আরবরা তা-ই প্রথমদিকে অনুবাদের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন। আর এযুগে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে এমনিভাবে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা সংস্কৃতির আদান-প্রদান অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে বিকাশ ঘটে। এযুগকে আরবী সাহিত্যের 'সোনালী যুগ' বলার এটিও অন্যতম কারণ। এসময় আব্বাসীয় ৩৭ জন খলিফার প্রায় ৫০৮ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বছরের শাসনামলে অনারবদের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কেননা আরবদের দেশ জয় ও শাসনকার্য শতাব্দীকাল অতিক্রম করায় পারসিক, রোমান ও অন্যান্য জাতির সমন্বয়ে এমন এক প্রজন্মের আগমন ঘটে, যারা আরবদের মতই আরবী ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেছিল। যারা পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে আরবী ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন। আব্বাসী যুগের "إمام المترجمين" (শীর্ষস্থানীয় অনুবাদকদের নেতা) হিসেবে খ্যাত আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) " كليلة و دمنة " (কালিলা ওয়া দিমনা)-সহ অসংখ্য গ্রন্থ অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্বরণীয় হয়ে আছে। তাছাড়া " شيخ المترجمين " (অনুবাদকদের শেখ) হিসেবে পরিচিত হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) আরবী ভাষায় ৮৬টি এবং সিরীয় ভাষায় ৮৭টি গ্রন্থ অনুবাদ করে সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধকরণে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন। পাশাপাশি কুসতা বিন লাওকা

Dhaka University Institutional Repository

আল-বা'লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.), সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.), ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (২০০ হি./৮১৫ খ্রি.), আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) প্রমুখ মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিতগণ আব্বাসী যুগের আরবী অনুবাদ সাহিত্যে অমূল্য অবদান রেখে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক, সুরিয়ানী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, ভূগোলশাস্ত্র ও জ্যোতিষবিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। এক্ষেত্রে খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর (৭১৪-৭৭৫ খ্রি.), খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৬৩-৮০৯ খ্রি.) ও খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) অবদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত بيت الحكمة (বাইতুল হিকমাহ) অনুবাদ আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানে পণ্ডিত ও অনুবাদকগণ একত্র হয়ে বিভিন্ন ভাষার মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অনুবাদকর্ম পরিচালনা করতেন। তবে 'বায়তুল হিকমাহ' ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোও এ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।

এসময় খলীফাদের পাশাপাশি রাজপুত্র, মন্ত্রী এবং বিশিষ্টব্যক্তিবর্গও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও অনুবাদ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খলিফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)-এর মন্ত্রী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক আয-যাইয়্যাত (মৃ. ৮৪৭ খ্রি.) ও খলিফা মুতাওক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)-এর মন্ত্রী ফাতহ ইবনে খাকানও (৮১৭-৮৬১ খ্রি.) এক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। তাদের উদ্যোগ ও উৎসাহে অনুবাদ সাহিত্য ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

আরব সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উদারতা-তাঁরা বহিরাগত সংস্কৃতিকে কখনও হেয় প্রতিপন্ন করেনি; বরং মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেগুলো গ্রহণ ও আত্মস্থ করে এক নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। ফলে এ যুগের অনুবাদ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাচীন বিভিন্ন জ্ঞানভান্ডার আরবী ভাষায় সংরক্ষিত হয়েছে এবং তা পরবর্তীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ভিত্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১২৫৮ সালে মঙ্গল সৈন্য কর্তৃক বাগদাদ নগরী আক্রান্ত হলে তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। আরবী ভাষাকে কেন্দ্র করে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছিল তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলেও আরবী আনুবাদ সাহিত্য তার সোনালী ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ যুগের অনুবাদ আন্দোলোনের হাত ধরেই আধুনিক যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হলো, আব্বাসী শাসনামলে অনুবাদ আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি, ক্রমবিকাশ এবং অনুবাদকদের সৃজনশীল ভূমিকা অনুসন্ধান করে বাংলাভাষী জ্ঞানপিপাসুদের জন্য তা তুলে ধরা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
		প্রত্যয়নপত্র	**i**
		ঘোষণাপত্র	**ii**
		সংকেত পরিচয়	**iii**
		প্রতিবর্ণায়ন	**iv**
		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	**v**
		সারসংক্ষেপ (Abstract)	**viii**
		ভূমিকা	**১-৪**
প্রথম অধ্যায়		**আব্বাসী যুগের পরিচিতি**	**০৫-৯৪**
১ম পরিচ্ছেদ		আব্বাসী যুগের পরিচয়	০৬
২য় পরিচ্ছেদ		আব্বাসী যুগের সামাজিক অবস্থা	৪২
৩য় পরিচ্ছেদ		আব্বাসী যুগের প্রশাসনিক অবস্থা	৫২
৪র্থ পরিচ্ছেদ		আব্বাসী যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা	৬৬
৫ম পরিচ্ছেদ		আব্বাসী যুগের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	৭৬
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ		আব্বাসী যুগের পতনের কারণ	৯৩
দ্বিতীয় অধ্যায়		**আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ**	**৯৫-১১৬**
১ম পরিচ্ছেদ		অনুবাদের পরিচয়	৯৭
২য় পরিচ্ছেদ		অনুবাদের প্রকারভেদ	১০৩
৩য় পরিচ্ছেদ		প্রাক ইসলামী ও ইসলামী যুগে ক্রমবিকাশ	১০৭
৪র্থ পরিচ্ছেদ		উমাইয়্যা যুগে ক্রমবিকাশ	১০৯
৫ম পরিচ্ছেদ		আব্বাসী যুগে ক্রমবিকাশ	১১১

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
তৃতীয় অধ্যায়		**আব্বাসী যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্য**	**১১৭-১৭৯**
১ম পরিচ্ছেদ		আব্বাসী যুগের অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	**১১৮**
২য় পরিচ্ছেদ		আব্বাসী যুগের অনুবাদের বিষয়াবলি	**১২১**
৩য় পরিচ্ছেদ		আব্বাসী যুগের অনুবাদের বৈশিষ্ট্যাবলি	**১৩৭**
৪র্থ পরিচ্ছেদ		আরবী অনুবাদ সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান	**১৪১**
৫ম পরিচ্ছেদ		আরবী অনুবাদ সাহিত্যে বিভিন্ন পরিবারের অবদান	**১৪৪**
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ		শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভূমিকা	**১৪৯**
চতুর্থ অধ্যায়		**আব্বাসী যুগের খ্যাতিমান অনুবাদকগণ**	**১৮০-২৬৬**
১ম পরিচ্ছেদ		আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.)	**১৮২**
২য় পরিচ্ছেদ		হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.)	**২২১**
৩য় পরিচ্ছেদ		কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.)	**২৪০**
৪র্থ পরিচ্ছেদ		সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.)	**২৪৪**
৫ম পরিচ্ছেদ		ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (মৃ. ২০০ হি./৮১৫ খ্রি.)	**২৫০**
৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ		আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.)	**২৫৫**
		অভিসন্দর্ভের ফলাফল	**২৬৭**
		উপসংহার	**২৬৯**
		গ্রন্থপঞ্জি	**২৭১**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সকল প্রশংসা অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালার জন্য যিনি জগৎসমূহের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিচার দিবসের মালিক। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যিনি বিশ্বমানবতার সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। মহান আল্লাহ প্রাণপ্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান দান করেন।

মানুষের পারস্পারিক যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের একটি মাধ্যম হলো ভাষা। আর আরবী পৃথিবীর অতিপ্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম ভাষা। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এ ভাষায় সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ ঘটে।[১] বর্তমান যুগেও এ ভাষার আবেদন সর্বজনীন। এটি জাতিসংঘের ৬টি দাপ্তরিক ভাষাসমূহের অন্যতম ভাষা। ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং উঁচুমানের সাহিত্য রচনা এ ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাষায় উন্নীত করেছে। অন্যান্য সাহিত্যের ন্যায় আরবী সাহিত্যের সূচনা হয় কবিতার মাধ্যমে এবং এর পরিপূর্ণতা আসে গদ্য সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে। এ পূর্ণতার মূলে কাজ করে অনুবাদ সাহিত্য। প্রাচীনকাল থেকেই আরবী অনুবাদ সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয় এবং মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে এর গতি প্রকৃতি বিভিন্ন আকার ধারণ করে বিকাশ লাভ করে।

আব্বাসীয় শাসনামল অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মূলত এ আমলে জ্ঞান চর্চার প্রথম যুগ ছিল অনুবাদের যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন ভাষায় মানুষের জ্ঞানের যেসব দিক সংরক্ষিত ছিল, আরবরা তা-ই প্রথমদিকে অনুবাদের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। এ যুগে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে এমনিভাবে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা সংস্কৃতির আদান-প্রদান অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে বিকাশ ঘটে। এ যুগকে আরবী সাহিত্যের 'সোনালী যুগ' বলার এটিও অন্যতম কারণ। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আব্বাসীয় শাসনামলে অনারবদের প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। কেননা আরবদের দেশ জয় ও শাসনকার্য শতাব্দীকাল অতিক্রম করায় পারসিক, রোমান ও অন্যান্য জাতির সমন্বয়ে এমন এক প্রজন্মের আগমন ঘটে, যারা আরবদের মতই আরবী ভাষায় দক্ষ

---

১. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (ইরাক: মাকতাবাতুল বুলসিয়াহ, তাবি), পৃ. ২০; আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে উঠেছিল। পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া ফারসী ও গ্রীক ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি তারা আরবী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেন।[২]

আব্বাসী যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়, তা কেবল ইসলামের ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসে এর গভীর তাৎপর্য বিদ্যমান। উমাইয়্যা যুগে সাম্রাজ্য বিস্তারের যে ধারা সূচিত হয়েছিল, আব্বাসী যুগে তা প্রসারিত হয়ে বিজয়ের রূপ ধারণ করে। এসময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক জাগরণ সৃষ্টি হয়, যা আজও ইতিহাসে বিরল উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। আরব সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উদারতা। তাঁরা বহিরাগত সংস্কৃতিকে কখনো হেয় প্রতিপন্ন করেনি; বরং মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেগুলো গ্রহণ ও আত্মস্থ করে এক নতুন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

আব্বাসী খলিফাগণের পৃষ্ঠপোষকতা ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় বিশেষত, আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁরা অনুবাদকদের একান্ত সাহচর্য দান এবং আর্থিক ও সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতেন। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে খলিফা আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.), খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.), খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.), খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.), খলিফা মুতাওক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। এসময় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজপুত্র, মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরাও জ্ঞানচর্চা ও অনুবাদকরণে এগিয়ে আসেন। খলিফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ-এর মন্ত্রী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক আয-যাইয়্যাত (মৃ. ২৩৩ হি./৮৪৭ খ্রি.) ও খলিফা মুতাওক্কিল বিল্লাহ-এর মন্ত্রী ফাতহ বিন খাকানও (৮১৭-৮৬১ খ্রি.) এক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। পাশাপাশি এসময়ে অনেক বিখ্যাত পরিবার অনুবাদ সাহিত্য বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আব্বাসী যুগের গ্রন্থাগারসমূহ ইসলামী সভ্যতার গৌরবময় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিস্তারে, মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগাতে এবং ইসলামের বাণী অনুধাবনে এগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারই সভ্যতা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ভিত্তি; জাতির

---

২. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম* (কায়রো: মাকতাবাতুল উসরহ্, ১৯৯৮, খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতি বা অবনতির মাপকাঠিও নিহিত রয়েছে গ্রন্থাগারের প্রতি যত্ন ও গুরুত্বের মধ্যে। এ প্রেক্ষাপটে ‘বায়তুল হিকমাহ’ আব্বাসী যুগে কেবল একটি গ্রন্থাগারই নয়; বরং একটি অনুবাদকেন্দ্র, গবেষণাগার ও প্রাচীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বাগদাদের বৈজ্ঞানিক ও বৌদ্ধিক নবজাগরণের সূতিকাগার হয়ে উঠে এবং কায়রো, কর্ডোবা ও স্পেনসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এসময় ‘বায়তুল হিকমাহ’ ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো অনুবাদ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে।

খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিবর্গের অবদানের ফলে অনুবাদকগণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যভাণ্ডার থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থাবলি অনুবাদ করে আরবী অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল।

আব্বাসী যুগের “إمام المترجمين” (শীর্ষস্থানীয় অনুবাদকদের নেতা) হিসেবে খ্যাত আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) “ كليلة و دمنة ” (কালিলা ওয়া দিমনা)-সহ অসংখ্য গ্রন্থ অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্বরণীয় হয়ে আছে। তাছাড়া “ شيخ المترجمين ” (অনুবাদকদের শেখ) হিসেবে পরিচিত হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) আরবী ভাষায় ৮৬টি এবং সিরীয় ভাষায় ৮৭টি গ্রন্থ অনুবাদ করে সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধকরণে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেন। পাশাপাশি কুসতা বিন লাওকা আল-বা’লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.), সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.), ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (২০০ হি./৮১৫ খ্রি.), আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) প্রমুখ মুসলিম ও অমুসলিম পণ্ডিতগণ আব্বাসী যুগের আরবী অনুবাদ সাহিত্যে অমূল্য অবদান রেখে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছে।

“আব্বাসী যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্য: পর্যালোচনা” শীর্ষক শিরোনামে পিএইচ.ডি গবেষণার বিষয় নিবন্ধনের পরই আমি উপলব্ধি করি, বিষয়টির গভীরতা ও ব্যাপ্তি কতটা বিস্ময়কর এবং একই সঙ্গে কতটা দুরূহ। নির্ভরযোগ্য উৎস ও তথ্যসূত্রের স্বল্পতা সত্যেও অভিষ্ঠলক্ষ্যে পৌঁছানোর পথকে করেছে দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য। তবু বিশ্বাস, ধৈর্য, অধ্যবসায়, অটল সংকল্প, সর্বপোরি মহান আল্লাহর কৃপাকে পাথেয় করে আমি কঠোর অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করি। গবেষণার প্রয়োজনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ভ্রমণ করেছি এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মূল্যবান উৎস সংগ্রহ করেছি। তারই ফলশ্রুতিতে অভিসন্দর্ভে

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসী যুগের অনুবাদ সাহিত্যের গতি প্রকৃতির একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছি।

অভিসন্দর্ভটিতে পাদটিকা এবং অথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও সর্বাধিক প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করেছি। গবেষণাকর্মে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি দোষণীয়। বক্ষমান অভিসন্দর্ভ রচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় আমাকে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পুনরাবৃত্তি এড়াতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এরপরেও দু'একটি জায়গায় হয়তো পুনরাবৃত্তির ন্যায় মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটা পুনরাবৃত্তি নয় বরং তা বর্ণনার ধারাবাহিকতা বা পূর্ণভাব প্রকাশের প্রয়াস মাত্র।

আমি বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর বোধগম্য ও উপভোগ্য করে উপস্থাপনের লক্ষ্যে অভিসন্দর্ভটিতে ভূমিকা ও গ্রন্থপঞ্জি ছাড়া ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের অধীনে একাধিক পরিচ্ছেদ যথাযথভাবে যুক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আমি আব্বাসী যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং আব্বাসী যুগের পতনের কারণ সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'। এ অধ্যায়ে অনুবাদের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনাপূর্বক আব্বাসী যুগের অনুবাদ সাহিত্যের বিষয়াবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আব্বাসী যুগের প্রথিতযশা অনুবাদক আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.), হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.), কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.), সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.), ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (২০০ হি./৮১৫ খ্রি.), এবং আল-কিন্দীর (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) আরবী অনুবাদ সাহিত্যে যে অবদান রয়েছে তা উপস্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছি। অভিসন্দর্ভের শেষাংশে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলসহ উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আব্বাসী যুগের পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : আব্বাসী যুগের পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আব্বাসী যুগের সামাজিক অবস্থা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আব্বাসী যুগের প্রশাসনিক অবস্থা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আব্বাসী যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আব্বাসী যুগের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আব্বাসীয় খেলাফত পতনের কারণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগের পরিচয়

আব্বাসীয় খেলাফত মধ্যযুগে ইসলামের ইতিহাসে বৃহত্তম রাষ্ট্রশক্তি ছিল। খেলাফতের স্থায়িত্ব ও সংহতির দিক থেকে আব্বাসীয় যুগ সমসাময়িক বিশ্বে অনন্য স্থান দখল করে আছে। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বৃহদাংশসহ অর্ধ-পৃথিবীর এ বিশাল সাম্রাজ্যকে ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুইস[৩] (Bernard Lewis) (১৯১৬-২০১৮খ্রি.) 'ইসলামী সাম্রাজ্য' নামে অভিহিত করেছেন। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আদর্শিক দ্বন্দ্বের কারণে উমাইয়্যা বংশের ধ্বংসস্তুপে আব্বাসীয় খেলাফতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়, যা ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল অভিযানে বাগদাদ নগরী ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ৩৭ জন খলিফা দীর্ঘ ৫০০ বছর ধরে খেলাফতে আসীন থেকে আব্বাসীয় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিহাসে বিশেষ অবদান রেখে খ্যাতি অর্জন করেন এবং তৎকালীন ইসলামী সাম্রাজ্যের ধারক ও বাহক হিসেবে সমাদৃত হন। উমাইয়্যা বংশের পতনের পর আব্বাসীয় বংশের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কেবল শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটেনি; বরং এর ফলে শাসন নীতিরও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এ যুগে মুসলমানদের সভ্যতা, কৃষ্টি এবং জ্ঞানানুশীলন বিশ্ব সভ্যতার শীর্ষদেশে উন্নীত হয়।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আল-আব্বাস[৪]-এর বংশধরদের আব্বাসীয় বলা হয়। বানু হাশিম ও বানু উমাইয়্যা গোত্র দু'টি ছিল আরবের কুরাইশ বংশের অন্তর্গত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই উমাইয়্যাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিল বানু হাশিম গোত্র।[৫] এ গোত্রের প্রাণ

---

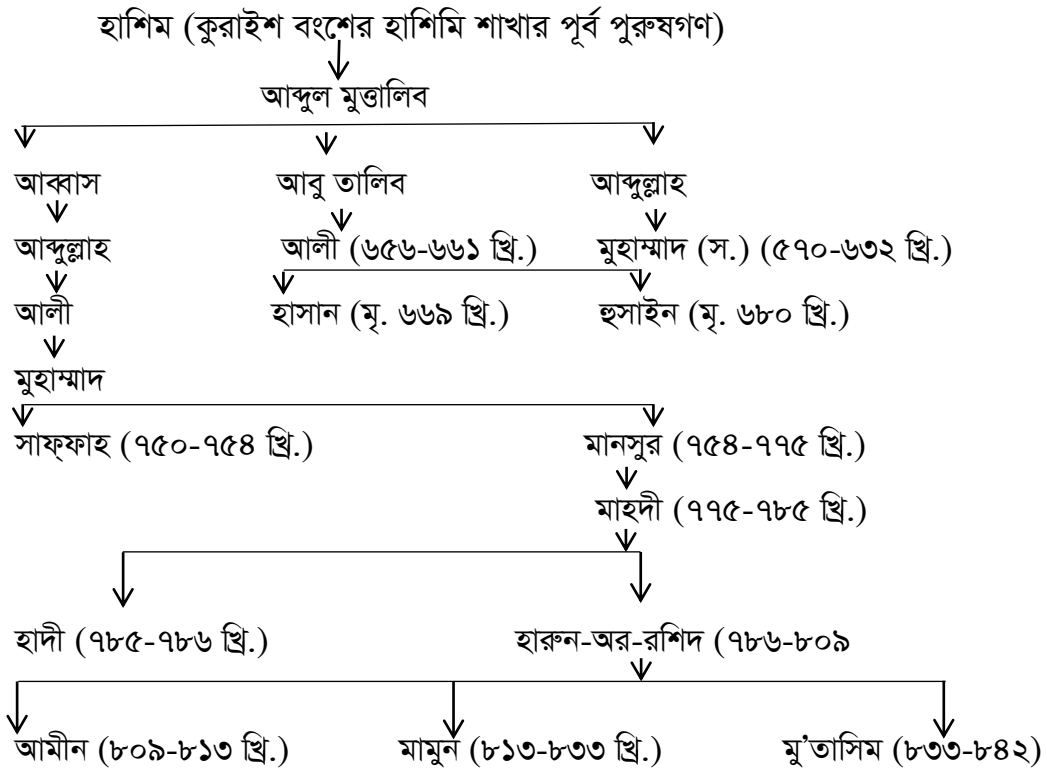
৩. বার্নার্ড লুইস একজন ব্রিটিশ-আমেরিকান ঐতিহাসিক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদ। তিনি প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক ছিলেন। ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস, পাশ্চাত্যের ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-A Handbook of Diplomatic and Political Arabic (1947), Istanbul and the Civilization of the Ottoman Empire (1963), The Cambridge History of Islam (1971), Race and Color in Islam (1972), The Muslim Discover of Europe (1982), Islalm: The Religion and the People (2008), The End of Modern History in the Middle East (2012).

৪. আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিমের ১০ ছেলে ও ৬ মেয়ে ছিল। ছেলেরা হলেন: আব্বাস, হামযা, আব্দুল্লাহ, আবু তালিব ওরফে আবদে মানাফ, যুবায়র, হারিস, হাজলা, মুকাব্বিম, যিয়ারা ও আবু লাহাব ওরফে আব্দুল উয্যা। আর কন্যাগণ হলেন: সাফিয়্যা উম্মে হাকিম বায়যা, আতিকা, উমায়মা, আরওয়া এবং বাররাহ। দ্র. *ইবন হিশাম* আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক, অনূ: সম্পাদনা পরিষদ, সীরাতুননবী (স.), (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪), ১ম প্রকাশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২

৫. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০২২), ১ম প্রকাশ, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ হযরত আব্বাস (রা.)-এর উত্তরসূরীগণ তাদের বংশের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত বানু উমাইয়্যা গোত্রের নেতৃত্বকে উৎখাত করতে আমরণ তৎপর ছিলেন। মুহাম্মাদ (স.)-এর পিতৃব্য আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিব বিন হিশাম বিন আবদ মানাফ আল-কুরাইশী আল-হাশেমী[৬] বংশধরগণই ইতিহাসে আব্বাসীয় যুগের প্রবর্তক। আল-আব্বাসের নামানুসারে এ বংশ بنو العباس (বানুল আব্বাস) বা আব্বাসীয় বংশ নামে পরিচিত।[৭] প্রাথমিক আব্বাসীয়গণ এবং মুহাম্মাদ (স.)-এর কুরাইশ বংশের সঙ্গে আব্বাসীয়দের সম্পর্কের তালিকা এখানে দেওয়া হলো-[৮]



৬. ইবন হাজার আসকালানী, *তাহজিবুত তাহজিব* (হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মায়ারিফিন নিযামিয়্যাহ, ১৩৩৬ হি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬

৭. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens* (London: Macmillan and Co. Limited, 1916), Reprinted, p. 134; Syed Ameer Ali, *The Spirit of* Islam (London: Christophers, 22, Berners Street, 1902), New Addition, p. 305

৮.Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, USA, 1970), P. 79

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহ, ফযল, উবায়দুল্লাহ ও কায়সান নামে চারজন পুত্র রেখে আল-আব্বাস ৩২ হিজরী/৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এ চার ভাই-ই معركة الجمل (উষ্ট্রের যুদ্ধে)[৯] এবং معركة الصفين (সিফফিনের যুদ্ধে)[১০] অংশগ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি ইবনে আব্বাস ও তার ভাইদের দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল।[১১] ইতিহাসে ইবনে আব্বাস নামে পরিচিত আব্দুল্লাহ সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। তিনি বারবার খলিফা আলী (রা.)-এর দূত হিসেবে কাজ করেন এবং আলী (রা.) তাকে মুহাম্মাদ (স.)-এর পরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করতে চেয়েছিলেন, যখন তার অবাধ্য সেনাবাহিনী তার ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার বিরোধ সালিসির মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে তাকে বাধ্য করছিলেন। কারবালায় ইমাম হুসাইন (রা.)-এর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর ভগ্নহৃদয় ইবনে আব্বাস ৬৭ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তায়েফে ইন্তিকাল করেন। তার

---

৯. রাজনৈতিক বিভাজন ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে আলী (রা.) কর্তৃক প্রশাসন ও নির্বাহী বিভাগ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোর কারণে তাঁর বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র আন্দোলোন গড়ে ওঠে। উমাইয়ারা উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। আলী (রা.) মৈত্রীজোটের সৈন্য সমাবেশের সংবাদ শুনে ৩৬ হিজরী, রবিউস সানি মাসের শেষ সপ্তাহ মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মদিনা থেকে ইরাকের বসরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং প্রায় ২০,০০০ সৈন্য নিয়ে বসরার নিকটবর্তী الزاوية (আল-জাবিয়াহ) নামক স্থানে তাঁবু গাড়েন। অপরদিকে মৈত্রীজোটের প্রায় ৩০,০০০ সৈন্য الفرضة (আল-ফারজাহ) নামক স্থানে উপস্থিত হন। সন্ধির জন্য আলোচনা চলা অবস্থায় উসমান (রা.)-কে হত্যাকারীদের পক্ষ থেকে একটি দল বিশ্বাসঘাতকতা করে উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করে অতর্কিত হামলা শুরু করে। ফলে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। হযরত আয়েশা (রা.) যে উটের পিঠে বসে ছিলেন তা যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। উটকে কেন্দ্র করে একদল আক্রমণ করছিল এবং অপর দল আক্রমণ প্রতিহত করছিল। এ কারণে এ যুদ্ধকে معركة الجمل (উষ্ট্রের যুদ্ধ) বলা হয়। যুদ্ধে আলী (রা.) জয়লাভ করেন এবং তালহা (রা.) এবং যুবায়ের (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আয়েশা (রা.)-কে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে মদিনায় প্রেরণ করা হয়। দ্র. তাক্কুশ, ড. মুহাম্মাদ সুহাইল, *আত-তারিখুল ইসলামিল ওয়াযিজী* (বৈরুত: দারুন নাফাইস, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ১০৬-১০৮

১০. উষ্ট্রের যুদ্ধের পর আলী (রা.) তাঁর সহজাত মানবিকতা বশত মুয়াবিয়ার সাথে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এজন্য আলী (রা.) তাকে তার বাইয়াত গ্রহণ করে মুসলিমদের বড় দলের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আহবান জানিয়ে পত্র লেখেন। মুয়াবিয়া তাঁর পত্রের জবাবে দু'টি শর্ত আরোপ করেন। ১. উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের থেকে কিসাস নিতে হবে। ২. নতুন খলিফা নির্বাচনের জন্য শুরা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ফলে পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ৩৭ হিজরীর সফর মাস মোতাবেক ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ফোরাত নদীর তীরে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা করে উভয় পক্ষ শান্তি চুক্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ লক্ষ্যে আলী (রা.) আবু মুসা আশয়ারি (রা.)-কে এবং মুয়াবিয়্যা আমর ইবন আসকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেন। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য তাদেরকে ছয় মাসের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতি আস্তে আস্তে আরো খারাপ হতে থাকে। জটিলতা নিরসনের জন্য মধ্যস্থতাকারীদ্বয় এ সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া উভয়কে পদচ্যুত করে সকলের পরামর্শের ভিত্তিতে একজন খলিফা নির্বাচিত করা হবে। কিন্তু সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় ঘটে ভিন্ন ঘটনা। আবু মুসা আশয়ারি (রা.) আলী (রা.) ও মুয়াবিয়াকে পদচ্যুত করে খেলাফতের বিষয়টি মুসলমানদের ওপর ন্যাস্ত করেন। কিন্তু আমর ইবন আস আলী (রা.)-কে ক্ষমতাচ্যুত করে মুয়াবিয়াকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে মতবিরোধ ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং ৪০ হিজরী রমজান মাস মোতাবেক ৬৬১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে খারেজি নেতা আব্দুর রহমান ইবন মুলজিমের হাতে আলী (রা.) শহিদ হন। দ্র. তাক্কুশ, ড. মুহাম্মাদ সুহাইল, *আত-তারিখুল ইসলামিল ওয়াযিজি*, পৃ. ১০৮-১১০

১১. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু 'আলামিন নুবালা* (বৈরুত: মুয়াস্সাতুর রিসালাহ, ১৪০৬ হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, p. 306

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র আলী, যার নাম খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছিল, তিনিও পিতার ন্যায় আলী (রা.)-এর বংশধরদের অনুগত ছিলেন। তিনি ১১৭ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র মুহাম্মাদ পরিবারের শীর্ষ স্থান অধিকার করেন।[১২]

অতিশয় ক্ষমতাবান ও উচ্চাভিলাষী মুহাম্মাদ বিন আলী ছিলেন আব্বাসীয় আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা যিনি প্রথম আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি নিজ পরিবারের নেতৃত্বের দাবি ন্যায়ানুমোদিত করার জন্য এক নতুন মতবাদের প্রচলন করেন। কারবালায় ইমাম হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের পর ইসলামের ধর্মীয় নেতৃত্ব তার জীবিত পুত্র আলীর (জয়নুল আবেদীন) কাছে ন্যস্ত না হয়ে তার বৈমাত্রিয় ভাই মুহাম্মাদ বিন হানীফার ওপর আরোপিত হয়। হানীফার মৃত্যুর পর তা তার পুত্র আবুল হাশিমের ওপর অর্পণ করা হয়, যিনি পরবর্তীতে এ নেতৃত্ব মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহকে প্রদান করেন।[১৩]

মুহাম্মাদ বিন আলী বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি প্রেরণ করে উমাইয়্যাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। ফলে আস্তে আস্তে বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় জনমত আব্বাসীয়দের পক্ষে চলে যায়। মুহাম্মাদ বিন আলী বিচক্ষণ নেতা হওয়ায় এ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে 'খোরাসান'-কে মনোনীত করেন। কারণ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য শহরে তখন ক্ষমতাসীন উমাইয়্যাবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা সহজ ছিল না। যে কোনো ভালো কাজের প্রচারণা খোরাসানের জনগণ সানন্দে গ্রহণ করত। মুহাম্মাদ (স.)-এর পরিবারের প্রতি তাদের অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। পূর্বাঞ্চলের 'খোরাসান ' উমাইয়্যাদের রাজধানী পশ্চিম এশিয়ার 'দামেস্ক' থেকে অনেক দূরে ইত্যাদি বিবেচনা করে আব্বাসীয়রা জনগণের সঙ্গে আবু হাশিমের সুসম্পর্ক থাকায় আন্দোলন ও প্রচারণা এখান থেকে চালানো আব্বাসীয়দের সহজ হয়। ফলে মুহাম্মাদ বিন আলীর নেতৃত্বে 'খোরাসান ' আব্বাসীয়দের ঘাঁটি হিসেবে গড়ে উঠে।[১৪]

আব্বাসীয়দের পক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি খোরাসানের পূর্বাঞ্চলে অতিসংগোপনে প্রচারণা শুরু হয়। আব্বাসীয় গুপ্তচররা নিরীহ বণিকের ছদ্মবেশে বা হজ্জ যাত্রীদের বেশ ধরে বিভিন্ন স্থানে গমনপূর্বক উমাইয়্যা বিরোধী তৎপরতা শুরু করে। কিন্তু মুহাম্মাদ যে আব্বাসী বংশের তৎকালীন নেতা ছিল তা

---

১২. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 134-135; Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam,* p. 305; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু *'আলামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫

১৩. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 135

১৪. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

Dhaka University Institutional Repository

উমাইয়্যা শাসনকর্তা সাইদ-এর কাছে পৌঁছে যায়। সন্দেহভাজনদের খুঁজে বের করে ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে তাদের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর ও যেসব লোকদের সাথে তারা বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন তাদের আশ্বাসে সাইদ তাদেরকে মুক্তি দিতেন। কিন্তু আব্বাসীয় গুপ্তচররা সংগোপনে তাদের কার্যক্রম চালাত, ধরা পড়লেই সে যুগের নিয়মানুযায়ী তাদেরকে বর্বরোচিত শাস্তি দেওয়া হতো। গোপনীয়তা ফাঁস হলে উমাইয়্যা শাসকদের হাতে প্রাণ দিতে তারা কুণ্ঠিত হতেন না। দমন-নিপীড়নের সকল প্রয়াস সত্ত্বেও এ বিপজ্জনক প্রচারণা অবিরাম গতিতে চলতে থাকে। তাদের অনুগামীদের সবদিকেই তালিকাভূক্ত করা হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই বানু উমাইয়্যা বংশের ধ্বংস সাধনের জন্য সমগ্র পারস্যকে গুপ্ত সংগঠনগুলো মৌচাকের মত ঝাঁঝড়া করে ফেলে। এ সময় নানাবিধ কারণ একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র বিস্তার ও চরম বিদ্রোহ প্রকাশের সহায়ক রূপ লাভ করে; কয়েক বছর পর যা আকস্মিক প্লাবনের মতো উমাইয়্যাদের ভীষণ ধ্বংসের কবলে পতিত করে।[১৫] হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৬৯৮-৭১৪ খ্রি.)-এর নিষ্ঠুরতার কথা জনসাধারণের স্মৃতি থেকে সামান্য মুছে যেতে না যেতেই দ্বিতীয় ইয়াযিদ (৭২০ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইয়াজিদ বিন মুহাল্লিব নামক বিদ্রোহীদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তার নিষ্ঠুর আচরণ ইয়ামানিদের বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। এর পাশাপাশি আরেকটি বিশেষ কারণ আব্বাসীয়দের পথকে পরিষ্কার করে দেয়। দ্বিতীয় ইয়াজিদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, পাপাচার ও অপশাসনে অতিষ্ঠ চতুর্দিকের মানুষের মধ্যে মুহাম্মাদ (স.)-এর বংশধরদের তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ব্যগ্র বাসনা জেগে উঠে। এ সংকটময় মুহূর্তে যখন জনসাধারণ মুহাম্মাদ (স.)-এর পরিবার থেকে কোনো সংকেতের জন্য ঐকান্তিকভাবে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু ধর্মীয় নেতাগণ পার্থিব জীবন থেকে অবসর নিয়েছিলেন; সংসার জীবনে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। ঠিক সেসময়ে বানু আব্বাস অশান্ত পরিবেশে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। আব্বাসীয় গুপ্তচরগণ জনসাধারণকে এ বলে আশ্বস্ত করেন যে, তারা মুহাম্মাদ (স.)-এর পরিবার (أهل البيت)-এর স্বার্থরক্ষার জন্যই আন্দোলন করছেন। ফাতিমা (রা.)-এর বংশের অনুগামী লোকজন এ প্রচারণার বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে ইমামদের

১৫. বুতরুস আল-বুসতানি, উদাবাউল আরাব ফিল আসুরিল আব্বাসিয়্যাহ (বৈরুত: দারু মারুন আব্বুদ, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ.১৪; *A* Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* pp. 133-134

অগোচরে এবং তাদের অনুমতি ছাড়াই মুহাম্মদ বিন আলী ও তার দলকে সাহায্য করতে থাকে, ফলে তার কার্যক্রম যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত হিসেবে গৃহীত হয়।[১৬]

১২৫ হিজরীতে মুহাম্মাদ বিন আলী মৃত্যুবরণ করেন এবং এ বছরেই মারা যান শেষ শক্তিশালী উমাইয়্যা খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক। উমাইয়্যা খলিফা হিশাম কোনো শক্তিশালী উত্তরাধিকারী না রেখে গেলেও মুহাম্মাদ বিন আলী তার পুত্র ইব্রাহিম আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস এবং আব্দুল্লাহ আবু জাফরকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যায়।[১৭] ইব্রাহিম আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাসও পিতার মতো যোগ্য নেতা ছিলেন। তিনি ইব্রাহিম বিন মুহাম্মাদ আবু মুসলিম খোরাসানীর মতো একজন বুদ্ধিদীপ্ত সেনানায়ককে আব্বাসীয় আন্দোলনে নিয়োজিত করেন। তিনি তাকে খোরাসানের আব্বাসীয় তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন এবং খোরাসানের অন্যান্য আব্বাসীয় নেতাদের তার নির্দেশনা মানতে আদেশ করেন। ইমাম ইব্রাহিম কর্তৃক নিয়োগকৃত আবু মুসলিম খুব জোরালোভাবে আব্বাসীয়দের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তিনি এবং অন্যান্য আব্বাসীয় প্রতিনিধি খোরাসানের জনসাধারণকে উমাইয়্যাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। তাদের এ সক্রিয় কর্মকাণ্ডে অধিকাংশ মানুষ আব্বাসীয়দের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় আবু মুসলিম তরুণদের একাংশকে গোপনে রণকৌশল শেখাতে থাকেন।[১৮] খুব দ্রুত শিয়া, সুন্নি, খারেজি, মাওয়ালী, পারস্যবাসী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় যারা কোন কারণে উমাইয়্যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল তারা সকলেই আব্বাসীয় পতাকাতলে সমবেত হয়। ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে আবু মুসলিম যখন আব্বাসীয়দের কালো পতাকা উত্তোলন করেন তখন সকলেই কালো পোশাক ও কালো পতাকা ধারণ করেন। রাসুল (স.)-এর পতাকার রং কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার ফলে এ রং হয়ে উঠে আব্বাসীয়দের প্রতীক।[১৯]

ইমাম ইব্রাহিমের নির্দেশনা অনুযায়ী আব্বাসীয়রা প্রকাশ্যে উমাইয়্যাবিরোধী প্রচারণা চালানো শুরু করে। ইতোপূর্বে গোপনে যে প্রচারণা চালানো হয় তার বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য আবু মুসলিমও ইমাম ইব্রাহিমের নির্দেশে প্রকাশ্য কার্যক্রমে সক্রিয় হন। তিনি তার অনুসারিদের নিয়ে খোরাসানের গভর্নর

---

১৬. ibid, pp. 134-135

১৭. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 135

১৮. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১৯. Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt,* p. 76

নসর বিন সাইয়ারের ওপর আক্রমণ চালিয়ে পরাস্ত করেন এবং মার্ভ অঞ্চল থেকে তাকে বহিষ্কার করেন। এ সময় ইমাম ইব্রাহিমের একটি পত্র উমাইয়্যাদের নিকট পৌঁছলে আব্বাসীয়দের তৎপরতা এবং তাদের নেতা সম্পর্কে উমাইয়্যারা জানতে পারে। এরূপ বিপর্যয়ের সংবাদে উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ক্ষুব্ধ হয়ে ইমাম ইব্রাহিমকে গ্রেফতার করেন। তবে ইব্রাহিম গ্রেফতারের আগে তার ভাই আবুল আব্বাসকে তার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন এবং আবু মুসলিমকে সেনাপতিত্ব প্রদান করার কথা বলে যান।[২০]

আব্বাসীয় বংশের বিদ্রোহী নেতা আবু মুসলিম অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তার অমায়িক শিষ্টাচার ও সৌজন্য শত্রুদেরও মন জয় করত এবং তাদের সমর্থন লাভে সহায়ক হতো। সেনাবাহিনী গঠন ও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। খোরাসানের ইবনে নাসর (মৃ.১৩০ হি.) যখন পশ্চিমাঞ্চলে ধর্মান্ধ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংগ্রামরত সেই মুহূর্তে আরব দূর্গগুলোকে প্রহরীশূন্য দেখে আবু মুসলিম ঘোষণা করেন তার দীর্ঘ-পরিকল্পিত ইশতেহার। অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী বানু উমাইয়্যার বিরুদ্ধে 'আহলুল বায়ত'-এর অধিকার প্রতিষ্ঠাই এর উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয় এবং নিজেকে হাশিমের বংশধর বলে প্রচার করার মাধ্যমে ফাতেমিদের সমর্থনও সুনিশ্চিত করে। সুযোগ বুঝে ২৫শে রমাদান, ১২৯ হিজরী পর্বত শিখরে বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে হত বা নিহত প্রধানদের জন্য শোক প্রকাশের চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ পোশাক পরিহিত বিশাল জনতা দলে দলে নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয় এবং কয়েক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে না হতেই আব্বাসীদের রাজপথে অভিষেকের কালো পতাকা তাদের পশ্চিমমূখী অভিযানে নগর থেকে নগরে উড়তে থাকে। উমাইয়্যা দূর্গরক্ষীদেরকে 'হিরাত' ও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন শহর থেকে বহিষ্কার করা হয়। মুদার বংশীরা আবু মুসলিমের সাথে যোগ দেয় এবং তাদের সম্মিলিত বাহিনী নাসরকে মার্ভ অঞ্চল থেকে বরখাস্ত করা হয়। বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তাতের হেজাজ ও ইরাকের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ আরব অঞ্চল যোগ দেয়। মার্ভ অঞ্চল ত্যাগ করার পূর্বে নাসর শেষবারের মত মারওয়ানকে কবিতাকারে চিঠি লিখে অনুরোধ করেন তাকে সাহায্য করার জন্য। নাসর এর আবেদনে সাঁড়া দিয়ে

---

২০. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

মারওয়ান ইরাকের রাজপ্রতিনিধিকে অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর নির্দেশ দেন, কিন্তু সেনাদল পৌঁছানোর পূর্বেই 'ফারগানা' ও 'খোরাসান ' আবু মুসলিমের কাছে সম্পূর্ণরুপে নিপতিত হয়।[২১]

আবু মুসলিমের সেনাপতি কাহতাবা বিন শাব্বি ফার্সে বসবাসকারী হেজাজের এক আরব নাসরকে 'সাররাখস' অঞ্চল পর্যন্ত অনুসরণ করে তাকে পরাজয়ের আঘাত হানেন। সেসময় নাসরের বয়স ছিল ৮৫ বছর, তিনি জুরজানে পশ্চাদপসরণ করেন এবং ফার্সে যাওয়ার সময় পথিমধ্যেই ইন্তিকাল করেন। জুরজানে নাসরকে পরাজিত করে কাহতাবা খালিদ বিন বারমেককে সঙ্গে নিয়ে দ্রুতগতিতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। দেশের সর্বত্রই তখন চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজমান। কাহতাবার পুত্র হাসান এবং আবু আয়ুন উমাইয়্যা ও ধর্মান্ধ খারিজিদের বিতাড়িত করেন। হাসান বিন কাহতাবা নগরটি অবরোধ করেন এবং তার পিতা কাহতাবা মারওয়ানের এক বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করেন। এরপর কাহতাবা আব্দুল্লাহকে বাধা দেওয়ার জন্য আবু আয়ুন এর নেতৃত্বে একটি বাহিনীকে পৃথক করেন এবং প্রধান বাহিনী নিয়ে তিনি কুফা অভিমুখে যাত্রা করেন; যেখানে ইয়াজিদ বাহিনীর শিবির ছিল। এরপর তিনি সোজা ইরাকের দিকে রওনা দেন। কাহতাবার এ অভিসন্ধি জানতে পেরে ইয়াজিদ তৎপর হন এবং কুফা ও শত্রুবাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। ইয়াজিদ তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইউফ্রেটিস নদীর তীর ঘেষে ঐতিহাসিক কারবালা প্রান্তরে কাহতাবার মোকাবিলা করে। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর উমাইয়্যারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়; কিন্তু কাহতাবা নদীতে ডুবে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। অতঃপর কাহতাবার পুত্র হাসান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন এবং পিতার সাফল্য অনুসরণ করে ইয়াজিদকে তার শিবির থেকে বিতাড়িত করেন এবং তাকে ওয়াসিতে[২২] প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করেন। কুফা নগরী এসময় অরক্ষিত থাকায় বিশেষ কোনো বাঁধা ছাড়াই তিনি দখল করেন। এ বিপর্যয়ের সংবাদ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে ক্রোধান্বিত করে তোলে এবং তিনি প্রবৃত্ত হন এমন এক বর্বরোচিত কাজে, যা উমাইয়্যা বংশধরদের ওপর ভয়াবহ প্রতিশোধ বয়ে এনেছিল। আবু মুসলিমের সৈন্যদলের সাথে ইমাম ইব্রাহিমের যোগাযোগ আছে জানতে পেরে তিনি তাকে হত্যার আদেশ দেন এবং সেসময়ে অন্যান্য বন্দীদেরও হত্যা করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে হতভাগ্য ইব্রাহিম তার ভাই আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহকে

---

২১. বাত্রুস আল-বুস্তানী, *উদাবাউল আরাব* (বৈরুত: দারুল জিল, ১৯৭৯ খ্রি.) পৃ. ১৪; Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* pp. 174-175

২২. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক স্থাপিত একটি সুরক্ষিত দুর্গ নগরী; যেটি ইরাকের কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

আব্বাসীয় ইমামের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে একটি ইচ্ছাপত্র রেখে যেতে সফল হয়েছিলেন। ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতাগণ কুফায় পালিয়ে যান এবং হাসান বিন কাহতাবা নগরটি দখল না করা পর্যন্ত সেখানে আত্মগোপনে থাকেন। কুফা নগরী বিজয়ের পর হাসান বিন কাহতাবার সাথে যোগ দেন আবু সালামা আল-খাল্লাল, যিনি মুহাম্মাদ (স.)-এর বংশধরগণের মন্ত্রদাতা হিসেবে খ্যাত ছিলেন।[২৩]

আবু সালামা এবং হাসান বিন কাহতাবার যৌথনামে কুফা বাসিদের প্রতি একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, পর দিন মসজিদুল জাম'য়া (কেন্দ্রীয় মসজিদ)-তে একজন খলিফা নির্বাচন করা হবে। ঐ দিন কুফায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা দেয়। বানু আব্বাসের কালো পোশাক পরিহিত বিশাল জনতা প্রতিটি এলাকা থেকে দ্রুত মসজিদুল জাম'য়ার দিকে দলে দলে ধাবিত হয় বহু প্রতিক্ষিত ঘোষণা শুনতে।[২৪] বিস্ময়করভাবে যথাসময়ে আবু সালামা ঘটনাস্থলে বিষদময় কালো পোশাক পরিধান করে উপস্থিত হন। নামাজে ইমামতির পর তিনি সমবেত জনতার কাছে সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, ধর্মের রক্ষক ও আহলুল বায়তের স্বার্থ রক্ষাকারী আবু মুসলিম অনাচারের শীর্ষ থেকে উমাইয়্যাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন; ফলে এখন প্রয়োজন একজন ইমাম ও খলিফা নির্বাচন। আর এ পদের জন্য ধার্মিকতা, দক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় সর্বগুণে গুণান্বিত আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ[২৫]-এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তির কোনো বিকল্প নেই এবং তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য জনসাধারণের কাছে প্রস্তাব করেন। আবুল আব্বাসকে খলিফা হিসেবে প্রস্তাবের কথা আবু সালামার ওষ্ঠ থেকে নিঃসৃত হতে না হতেই সহসা জনতা উচ্চস্বরে 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি দিয়ে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। দ্রুত একজন লোক পাঠানো হয় আবুল আব্বাসকে তার গুপ্তস্থান হতে নিয়ে আসার জন্য। তিনি খাকী রঙের গাধার পিঠে চড়ে সশস্ত্র সৈনিকদের সাথে নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশ করেন। এরপর মসজিদে

---

২৩. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* pp. 175-177

২৪. ড. শাওকি দায়িফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী আল-আসরুল আব্বাসিল আওয়াল* (কায়রো: দারুল মায়ারিফ, তা.বি), ৮ম সংস্করণ, পৃ. ১৩; Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 178

২৫. আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ সাফ্ফাহ ইবন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ইবন হিশাম ১০৪ হিজরীতে বালকা এলাকার হামিমাহ নামক স্থানে জন্মগহণ করেন। তিনি সেখানেই প্রতিপালিত হন এবং পরবর্তীকালে আপন ভাই ইমাম ইব্রাহিমের স্থলাভিষিক্ত হন। দ্র. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস)*, অনু. মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী ও মাওলানা আবদুল্লাহ ইবন সাঈদ জালালাবাদী (ইফাবা: অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, জুন, ২০০৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৪৯

উপনীত হলে জনতার একাংশ তার কাছে বাইয়াত করার জন্য অস্থির হয়ে উঠে। ১৩ রবিউস সানি, ১৩২ হি./২৫ নভেম্বর, ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে আবুল আব্বাস খলিফা নির্বাচিত হন। এরপর তিনি মঞ্চে আরোহণ করে খুতবা প্রদান করেন, খুতবায় তিনি আব্বাসীয় বংশধরদের দীর্ঘ প্রশস্তি, খেলাফতের ওপর তাদের অধিকার এবং ধর্ম ও আইন রক্ষায় অধার্মিক উমাইয়্যা বংশধরদের বিরুদ্ধে তাদের প্রয়াসের কথা এক নাতিদীর্ঘ ভাষণের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তখন থেকেই তিনি মুসলমানদের ইমাম ও খলিফা হিসেবে গণ্য হন।[২৬] খলিফা হিসেবে নাম ঘোষণার পর আবুল আব্বাস কুফার মসজিদে যে উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন সেই অনুষ্ঠানেই তিনি আস-সাফ্ফাহ السفاح বা রক্তপিপাসু উপাধি ধারণ করেন।[২৭]

ইতোমধ্যে উত্তরাঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ অগ্রসর হচ্ছিল দ্রুতগতিতে। ছোট জাব নদীর পূর্বতীরে 'শাহরজুর' নামক স্থানে সেনাপতি কাহতাবার সহকারী আবু আয়ুন উমাইয়্যা খলিফা মারওয়ানের পুত্র আব্দুল্লাহকে আক্রমণ করেন এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাকে পরাজিত করেন। শহরের পতন এবং পুত্রের পরাজয় মারওয়ানকে ক্রোধান্বিত করে তোলে এবং তার বিগত তৎপরতা জাগিয়ে তোলে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে শেষবারের মত আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার জন্য প্রায় ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করে বৃহত্তর জাব নদীর দিকে অগ্রসর হন। আবুল আব্বাস তার পিতৃব্য আব্দুল্লাহ বিন আলীকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে আবু আয়ুনকে তার সহকারী হিসেবে বহাল রেখে একটি নতুন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন।[২৮]

আবু মুসলিম এবং তার অনুসারিদের কর্মকাণ্ড এবং খোরাসানের চলমান পরিস্থিতি অবগত হয়ে মারওয়ান তার বাসস্থান 'হাররাম' ছেড়ে মুসলের নিকটবর্তী জাব নদীর পশ্চিম তীরে শিবির স্থাপন করেন। অপরদিকে আবুল আব্বাস-এর অনুগত সেনাপতি আবু আয়ুন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মারওয়ানকে প্রতিরোধ করার জন্যে এগিয়ে আসে। আবুল আব্বাস তার পরিবারের যেসকল সদস্য যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী তাদেরকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আহবান জানান। আব্দুল্লাহ বিন আলী তার

---

২৬. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* pp. 178-179

২৭. হাফিজ ইবন কাসির আদ-দামেস্কী, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বৈরুত: মাকতাবুতুল মায়া'রিফ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), ১০ম খণ্ড, ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৪০; Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt,* p. 79

২৮. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 180; ড. শাওকি দায়িফ দ্বায়ফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী আল-আসরুল আব্বাসিল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

ডাকে সাড়া দিয়ে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবু আয়ুন-এর নিকট পৌঁছেন। আবু আয়ুন সেনাপতির পদ থেকে সরে গিয়ে আব্দুল্লাহ বিন আলীকে উক্ত পদে স্থলাভিক্ত করেন এবং আব্দুল্লাহ বিন আলী পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব প্রদান করেন হিয়াশ বিন হাবিব তাই ও নাসির বিন মুহতাফিজকে।[২৯]

১১ জামাদিউস-সানি, ১৩২ হি./২৫ জানুয়ারি, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জাব নদীর বাম তীরবর্তী 'কুশাক' নামক পল্লীতে এক যুদ্ধ সংগঠিত হয়। মারওয়ান নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করেন এবং তার সহজাত স্পর্ধায় যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যান। মারওয়ান প্রথম আক্রমণে সফল হন এবং আব্বাসীয় বাহিনী পিছু হটে। কিন্তু আবু আয়ুন তার সেনাদের অশ্বপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করান এবং তাদের বর্শাগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলেন। অপরদিকে আব্দুল্লাহ বিন আলী তার ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সৈন্যবাহিনীকে উত্তেজিত করেন। তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'ইয়া মুহাম্মাদ! ইয়া মানসুর !' এবং সেই রণধ্বনি সৈনিকদের মাঝে প্রতিধ্বনিত হয়। পক্ষান্তরে মারওয়ানও তার বংশের গৌরব রক্ষায় সৈন্যবাহিনীকে উজ্জীবিত করেন কিন্তু তার আবেদনে কোনো সুফল হয়নি। আব্বাসীয় সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণের ধাক্কায় মারওয়ানের সিরীয় বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে।[৩০]

অবশেষে সিরীয় বাহিনী পরাজয়বরণ করেন এবং খোরাসানিগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। সেদিন যতলোক নিহত হয়েছিল তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক নদীতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছিল। আব্বাসী সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন আলী সেতু পুন:স্থাপন করেন এবং ডুবন্তদের তুলে আনার নির্দেশ দেন। তিনি তখন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন-

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.

অর্থাৎ "যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে।"[৩১]

মারওয়ানের সৈন্যবাহিনীর ফেলে যাওয়া ধন-সম্পদ ও পশুপালসহ সবকিছু সেনাপতি আব্দুল্লাহ দখলে নেয়। পরে এ বিজয়ের সুসংবাদ ও শত্রুপক্ষ থেকে প্রাপ্ত ধন-সম্পদের বিবরণ জানিয়ে খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহকে পত্র লিখেন। বিজয়ের সুসংবাদ শুনে খলিফা মহান আল্লাহর প্রতি

---

২৯. হাফিজ ইবন কাসির আদ-দামেস্কী, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩

৩০. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 181

৩১. সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ৫০

কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সেনা সদস্যকে ৫০০ দিরহাম করে পুরস্কার প্রদান এবং তাদের নিয়মিত ভাতা বৃদ্ধি করার ঘোষণা দেন।[৩২]

মারওয়ান হাররান ত্যাগের সময় আবু মুহাম্মাদ সুফিয়ানকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং তার ভাগ্নে ও জামাতা আবান বিন ইয়াজিদকে সেখানকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আব্বাসীয় সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন আলী যখন হাররান-এ পৌঁছেন তখন ইবনে ইয়াজিদ লজ্জিত, অনুতপ্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার নিকট উপস্থিত হন। আব্দুল্লাহ বিন আলী তাকে নিরাপত্তা প্রদান করে স্বপদে বহাল রাখেন। এদিকে মারওয়ান 'কিন্নিস্‌রিন' (قنسرين) পার হয়ে 'হিমস' পৌঁছান এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে দামেস্কের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সেখানে প্রশাসক ছিল তারই জামাতা ওয়ালিদ বিন মুয়াবিয়া বিন মারওয়ান। ওয়ালিদকে সেখানে রেখে মারওয়ান মিশরের উদ্দেশ্যে 'দামেস্ক' ত্যাগ করেন। অপরদিকে মারওয়ানের সন্ধানে আব্দুল্লাহ বিন আলী 'হিম্‌স' অভিমুখে অগ্রসর হন। প্রত্যেকটি জনপদ অতিক্রমকালে স্থানীয় জনসাধারণ তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং আত্মসমর্পণ করে তার হাতে বাইয়াত করেন। তিনি সকলকে নিরাপত্তা দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'কিন্নিস্‌রিন' (قنسرين) নামক স্থানে পৌঁছালে চার হাজার সেনাবাহিনীর একটি দল নিয়ে তার সহোদর আব্দুস সামাদ বিন আলী তার সাথে মিলিত হয়। আব্দুল্লাহ বিন আলীর সাহায্যার্থে খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ এ বাহিনী প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ আরো অগ্রসর হয়ে 'হিম্‌স'-এ পৌঁছান। সেখান থেকে 'বা'লাবাক্কা' হয়ে 'আল-মায্‌যাহ'-এর পথে 'দামেস্ক' পৌঁছে দু'দিন কিংবা তিনদিন অবস্থান করেন। স্থানীয় লোকজন উপহার হিসেবে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও প্রাণী সম্পদ নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হন। এরপর তার আরেক সহোদর ভ্রাতা সালিহ বিন আলী আট হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে খলিফার নির্দেশে তার সাথে যোগ দেন। সালিহ 'আযরা'-এর মারাজ অঞ্চলে, আবু আয়ুন 'কায়সান' ফটকে, বুসাম 'বাবুস সগির' ফটকে, হামিদ বিন কাহতাবা 'বাবুল-তাওমা' ফটকে এবং আব্দুস সামাদ, ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাফাওয়ান ও আব্বাস ইবনে ইয়াজিদ 'বাবুল-ফারাদিস' ফটকে অবস্থান নেন। সেনাপতি আব্দুল্লাহ তার সহযোগীদের

---

৩২. প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৪

নিয়ে কয়েকদিন যাবত হিম্‌স অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে ১১ রমজান, ১৩২ হি. বুধবার আব্বাসীয়গণ হিম্‌স জয় করেন।[৩৩]

মারওয়ানের জীবনাবসানের সাথেই পতন ঘটে উমাইয়্যা বংশের এবং সূচীত হয় আব্বাসীয় খেলাফতের অধ্যায়; যা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। আবুল আব্বাস আস-সাফ্‌ফাহ ১৩২ হি./৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। তবে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে জাবের যুদ্ধে উমাইয়্যা বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের পর আব্বাসীয় খেলাফতের শাসন শুরু হয়। ৩৭ জন খলিফা আব্বাসীয় এ শাসনকার্য পরিচালনা করেন; অবশ্যই তাদের সবাই শ্রেষ্ঠত্যের দাবিদার ছিলেন না। সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে দু'জন, খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) ও খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) অন্তর্ভূক্ত। অন্যান্য খলিফা এ দু'জনের ন্যায় তেমন বিখ্যাত না হলেও রাষ্ট্রের কার্যাবলিতে স্ব স্ব কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।[৩৪]

আব্বাসীয়দের দীর্ঘ ৫০৮ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বছরের শাসনামলের ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে নিম্নোক্ত খলিফাদের নাম পাওয়া যায়।[৩৫]

১. আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফাহ (১৩২-১৩৬ হি./৭৫০-৭৫৪ খ্রি.)

২. আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মানসুর (১৩৬-১৫৮ হি./৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)

৩. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাহদী (১৫৮-১৬৯ হি./৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.)

৪. মুসা বিন মুহাম্মাদ আল-হাদী (১৬৯-১৭০ হি./৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.)

৫. হারুন বিন মুহাম্মাদ আর-রশিদ (১৭০-১৯৩ হি./৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)

৬. মুহাম্মাদ বিন হারুন আল-আমিন (১৯৩-১৯৮ হি./৮০৯-৮১৩ খ্রি.)

৭. আব্দুল্লাহ বিন হারুন আল-মামুন (১৯৮-২১৮ হি./৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)

৮. মুহাম্মাদ বিন হারুন আল-মু'তাসিম বিল্লাহ (২১৮-২২৭ হি./৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)

৯. হারুন বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিক বিল্লাহ (২২৭-২৩২ হি./৮৪২-৮৪৭ খ্রি.)

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৩৪. Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt*, p. 78; ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০২২), ১ম প্রকাশ, পৃ.২৫ ও ৩৫

৩৫. ড. ফারুক ওমর ফাওজি, *আল-খিলাফাতুল আব্বাসিয়াতি আসরুল ক্বুওয়াতি ওয়াল ইজদিহারি* (ওমান: দারুশ শুরুক, ২০০৯), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩; ড. খুদাইর আহমাদ আতাল্লাহ, *বাইতুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসিয়িন* (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, তা.বি), ১ম সংস্করণ, পৃ.৪৬১-৪৬২

১০. জা'ফর বিন মুহাম্মাদ আল-মুতাওক্কিল বিল্লাহ (২৩২-২৪৭ হি./৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)

১১. আবু জা'ফর আহম্মাদ আল-মুনতাসির বিল্লাহ (২৪৭-২৪৮ হি./৮৬১-৮৬২ খ্রি.)

১২. আবুল আব্বাস আহম্মাদ আল-মুস্তাইন বিল্লাহ (২৪৮-২৫২ হি./৮৬২-৮৬৬ খ্রি.)

১৩. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ আল-মু'তাজ বিল্লাহ (২৫২-২৫৫ হি./৮৬৬-৮৬৯ খ্রি.)

১৪. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ আল-মুহতাদী বিল্লাহ (২৫৫-২৫৬ হি./৮৬৯-৮৭০ খ্রি.)

১৫. আবুল আব্বাস আহম্মাদ আল-মু'তামিদ আলাল্লাহ (২৫৬-২৭৯ হি./৮৭০-৮৯২ খ্রি.)

১৬. আবুল আব্বাস আহম্মাদ আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ (২৭৯-২৮৯ হি./৮৯২-৯০২ খ্রি.)

১৭. আবু মুহাম্মাদ আলী আল-মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ (২৮৯-২৯৫ হি./৯০২-৯০৮ খ্রি.)

১৮. আবুল ফজল জাফর আল-মুকতাদির বিল্লাহ (২৯৫-৩২০ হি./৯০৮-৯৩২ খ্রি.)

১৯. আবু মানসুর মুহাম্মাদ আল-কাহির বিল্লাহ (৩২০-৩২২ হি./৯৩২-৯৩৪ খ্রি.)

২০. আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ আর-রাজী বিল্লাহ (৩২২-৩২৯ হি./৯৩৪-৯৪০ খ্রি.)

২১. আবু ইসহাক ইব্রাহিম আল-মুত্তাকী বিল্লাহ (৩২৯-৩৩৩ হি./৯৪০-৯৪৪ খ্রি.)

২২. আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ আল-মুসতাকফী বিল্লাহ (৩৩৩-৩৩৪ হি./৯৪৪-৯৪৬ খ্রি.)

২৩. আবুল কাসিম আল-মুতি বিল্লাহ (৩৩৪-৩৬৩ হি./৯৪৬-৯৭৪ খ্রি.)

২৪. আবু বকর আব্দুল কারিম আত-তায়ী বিল্লাহ (৩৬৩-৩৮১ হি./৯৭৪-৯৯১ খ্রি.)

২৫. আবুল আব্বাস আহম্মাদ আল-কাদির বিল্লাহ (৩৮১-৪২২ হি./৯৯১-১০৩১ খ্রি.)

২৬. আবু জা'ফর আব্দুল্লাহ আল-কায়িম বিল্লাহ (৪২২-৪৬৭ হি./১০৩১-১০৭৫ খ্রি.)

২৭. আবুল ক্বাসিম আব্দুল্লাহ আল-মুকতাদী বি-আমরিল্লা'হ (৪৬৭-৪৮৭ হি./১০৭৫-১০৯৪ খ্রি.)

২৮. আবুল আব্বাস আহম্মাদ আল-মুসতাজহির বিল্লাহ (৪৮৭-৫১২ হি./১০৯৪-১১১৮ খ্রি.)

২৯. আবুল মানসুর আল-ফজল আল-মুশতারশিদ বিল্লাহ (৫১২-৫২৯ হি./১১১৮-১১৩৫ খ্রি.)

৩০. আবু জা'ফর মানসুর আর-রশিদ বিল্লাহ (৫২৯-৫৩০ হি./১১৩৫-১১৩৬ খ্রি.)

৩১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ (৫৩০-৫৫৫ হি./১১৩৬-১১৬০ খ্রি.)

৩২. আবুল মুজাফ্ফার ইউসুফ আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ (৫৫৫-৫৬৫ হি./১১৬০-১১৭০ খ্রি.)

৩৩. আবু মুহাম্মাদ হাসান আল-মুসতাদী বি-আমরিল্লা'হ (৫৬৫-৫৭৫ হি./১১৭০-১১৮০ খ্রি.)

৩৪. আবুল আব্বাস আহম্মাদ আন-নাসির লি-দ্বীনিল্লাহ (৫৭৬-৬২২ হি./১১৮০-১২২৫ খ্রি.)

৩৫. আবু নাসর মুহাম্মাদ আজ-জাহির বি-আমরিল্লা'হ (৬২২-৬২৩ হি./১২২৫-১২২৬ খ্রি.)

৩৬. আবু জা'ফর মানসুর আল-মুস্তানসির বিল্লাহ (৬২৩-৬৪০ হি./১২২৬-১২৪২ খ্রি.)

৩৭. আবু আহম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মুসতাসিম বিল্লাহ (৬৪০-৬৫৬ হি./১২৪২-১২৫৮ খ্রি.)

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রথম খলিফা হলেন আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ। মারওয়ানের বিরুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে তিনি খেলাফতের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেন। ইরাক, খোরাসান, হেজায, শাম ও মিশর ভূখণ্ডে তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে আন্দালুস তার শাসন কর্তৃত্বের অধীন হয়নি এবং তার কর্তৃত্ব সেখানে পৌঁছেনি। সেখানে বানু উমাইয়্যাদের কিছু ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করে। বিভিন্ন এলাকায় একাধিক দল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো কিন্নিসরিনবাসী।[৩৬]

খলিফা পদ গ্রহণ করেই আস-সাফ্ফাহ সিরিয়া হতে ইরাকের কুফা শহরের আনবারে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি আব্বাসীয় প্রচারণার অন্যতম নায়ক আবু সালামাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু কয়েকমাস অতিবাহিত হবার পর তার সঙ্গে খলিফার সম্পর্কের অবনতি হলে তিনি কুফা ত্যাগ করে আম্বারে আল-হাশিমিয়া প্রাসাদ থেকে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পন্ন করেন। এরপর আবু সালামা গুপ্তঘাতক দ্বারা নিহত হলে তিনি কুফায় ফিরে আসেন।[৩৭]

আস-সাফ্ফাহ বিভিন্ন প্রদেশে তার প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। যেমন আপন চাচা দাউদকে প্রথমে কুফার এরপর হেজায, ইয়ামান ও ইয়ামামার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ১৩৩ হিজরীতে দাউদের মৃত্যুর পর তিনি তার আপন মামা ইয়াজিদ বিন উবায়দল্লাহ বিন আব্দুল মিদ্দান হারিসীকে হেজায ও ইয়্যামামার এবং মুহাম্মাদ বিন ইয়াজিদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মিদ্দানকে ইয়্যামানের শাসক নিয়োগ করেন। এরপর ১৩৩ হিজরীতে তাকে পদচ্যুত করে আপন চাচা সুলাইমান বিন আলীকে একাধারে বসরা ও বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ১৩২ হিজরীতে আস-সাফ্ফাহর এক চাচা ইসমাইল বিন আলী বিন ইয়াজিদ মিশরের এবং আবু মুসলিম খোরাসানি খোরাসান ও জাবালের শাসক ছিলেন। আর খালিদ বিন বারমাকী ছিলেন 'দিওয়ানুল খারাজ' তথা অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। ১৩৩ হিজরীতে আবু মুসলিম, মুহাম্মাদ বিন আশয়াসকে নিজের পক্ষ থেকে প্রশাসক নিয়োগ করে পারস্যে প্রেরণ করেন।

---

৩৬. হাফিজ ইবন কাসির আদ-দামেস্কী, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫২

৩৭. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

ঠিক ঐসময়ে আস-সাফ্ফাহও আপন চাচা ইসা বিন আলীকে পারস্যের প্রশাসক নিয়োগ করে সেখানে পাঠান। ইসা বিন আলী তার হাতে পারস্যের শাসনভার হস্তান্তরের কথা বললে মুহাম্মাদ বিন আশয়াস প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেও পরে কিছু শর্তসাপেক্ষে তাকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেন। মুহাম্মাদ বিন আশয়াস মৃত্যুবরণ করলে খলিফা আপন চাচা ইসমাইল বিন আলীকে পারস্যের এবং মুহাম্মাদ বিন সুলকে মাওসিলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।[৩৮]

চীনের রাজার প্ররোচনায় খোরাসানে বিদ্রোহ দেখা দিলে সমরকন্দের শাসরকর্তা জিয়াদ তা দমন করতে সক্ষম হন। এছাড়া খলিফাকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে এবং খেলাফতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বিব্রত দেখে রোমকগণ এসময় হঠাৎ করে মুসলিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল দখল করে ফেলে। খলিফা এ অবস্থায় অতিদ্রুত সৈন্য প্রেরণ করে উক্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করেন।[৩৯] খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফ্ফাহ-এর শাসনামলে ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরায় তাহিরাত (تاهرت) থেকে সুদান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড, পুরো স্পেন এবং কতিপয় শহর বেদখল হয়ে যায়। মাত্র চার বছর আট মাস খেলাফত পরিচালনা করে ১৩ জিলহজ্ব ১৩৬ হিজরী/৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে শনিবার আনবারের হাফিশিয়া প্রাসাদে ৩০ বছর বয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪০] মৃত্যুর পূর্বে যথাক্রমে আবু জা'ফর আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)[৪১] ও ইসা বিন মুসার পক্ষে অঙ্গীকারপত্র লিখে একাটি কাপড়ে জড়িয়ে তার ওপর আহলে বায়তের মোহর লাগিয়ে ইসার হাতে অর্পণ করেন। আল-মানসুরের অনুপস্থিতে ইসা তার পক্ষে

---

৩৮. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৯-৫০; ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

৩৯. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭

৪০. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা* (বৈরুত: দারু ইবন হাজম, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২০৫; হাফিজ ইবন কাসির আদ-দামেস্কী, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৬। Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 211

৪১. আবু জা'ফর আল-মাসনুর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ৯৫ হিজরীতে সালামা নামক একজন ক্রীতদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে সবচেয়ে ভীতিকর, সাহসী, ধৈর্যশীল বিচক্ষণ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী খলিফা ছিলেন। খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা ও আইনবিদ্যায় তিনি যথেষ্ঠ দক্ষ ছিলেন। তিনি প্রায় বাইশ বছর রাজত্ব করেন। তার জীবনের অন্তিম দিনগুলো পবিত্র মক্কায় অতিবাহতি করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ ছেড়ে মক্কার পথে রওনা হন, কিন্তু যাত্রাপথে মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলে 'মায়মুনা' নামক স্থানে ৬ জিলহজ্জ, ১৫৮ হি./৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। খলিফাকে সমাহিত করার জন্য শতাধিক কবর খনন করা হয় এবং সেগুলোর একটিতে অতি সঙ্গোপনে তাকে দাফন করা হয়, যাতে কোথায় তাকে কবর দেয়া হয়েছে তা লোকজন জানতে না পারে। দ্র. আবুল হাসান আলী বিন হুসাইন আল-মাসউদী, *মুরুজুয জাহাব*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯; Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 227; আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

বাইয়াত গ্রহণ করেন।[৪২] খেলাফতের শপথ গ্রহণের পর খলিফা আল-মানসুর তিন দিক হতে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। এদের মধ্যে সিরিয়ার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন আলী প্রকাশ্যভাবে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি তার পিতৃব্য পুত্রের বিদ্রোহ দমনে আবু মুসলিমকে প্রেরণ করেন। খলিফার নির্দেশে আবু মুসলিম আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে তিনি হাররানের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে নাসিবিনের দিকে চলে যান। সেখানে উভয়ের মাঝে দীর্ঘ পাঁচ মাস যুদ্ধ চলার পর ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল্লাহ বিন আলী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। নাসিবিনের যুদ্ধের পর আবু মুসলিম খোরাসানে ফিরে যান। এখানে তার একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় খলিফা তাকে নিজের বিপদের কারণ মনে করেন। অবশেষে আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী আবু মুসলিমকে তিনি মাদায়িনে ডেকে পাঠান এবং ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে তার প্রাণ সংহার করা হয়।[৪৩]

আবু মুসলিম যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন খলিফা আল-মানসুর নিজেকে সিংহাসনে নিরাপদ মনে করতে পারেননি। আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে প্রকৃত শাসক বলে অনুভব করেন এবং টাইগ্রিস নদীর তীরে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। কিন্তু আবু মুসলিমকে হত্যার ফলে খোরাসানে[৪৪] তার অনুসারীরা বিদ্রোহ শুরু করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পরাজিত হন। হাশিমিয়ায় রাওয়ান্দিয়া[৪৫] সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠলে খলিফার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। অবশেষে এ বিদ্রোহ

---

৪২. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৪৩. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene*, p. 215; আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ২য়, পৃ. ২৫৫; ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮-৩৯

৪৪. আবু মুসলিমের অনুসারীগণ নিজেদের নিয়ে 'খুররামী' নামে একটি সম্প্রদায় গঠন করেছিল যারা তাকে ইমাম ও মুক্তিদাতা বলে গণ্য করতেন। এরা খুরাসান ও পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে আধিপত্য লাভ করেছিল। আবু মুসলিমের মৃত্যুর পর এরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে; এদের একদল মনে করত যে তিনি জীবিত এবং পৃথিবীতে ন্যায়বিচার স্থাপন করতে শীঘ্রই আবার আত্মপ্রকাশ করবে; অন্যদল বিশ্বাস করতেন, তিনি সত্যি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ইমামত অর্পিত হয়েছে তার কন্যার ওপর। বিদ্রোহের নেতা সানফাদ ছিলেন এ দলের অন্যতম সমর্থক। দ্র. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene*, p. 217.

৪৫. 'রাওয়ান্দিয়া' সম্প্রদায় আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)-কে 'খাদ্য ও পানীয়দাতা প্রভু' (Providence who supplied them whith food and drink) এবং তার দেহরক্ষীকে মনে করত জিব্রাইল ফেরেশতার অবতার। তারা 'তাসাসুখ' (জন্মান্তরবাদ) ও 'হুলুল' (অবতারবাদ)-এ বিশ্বাসী ছিল। তারা এও বিশ্বাস করত যে, আদাম আত্মা উসমান ইবন নাহিকের এবং জিবরিল হায়সাম ইবন মুয়াবিয়্যার রূপ ধারন করেছেন। এসব লোক রাজধানীতে এসে তাদের এ বাতিল আকিদার কথা প্রচার করতে থাকে। এদের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত। তাদের অনভ্যর্থিত ও নাস্তিকতাপূর্ণ উম্মাদনায় সেসময়ের ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, ফলে খলিফা আল-মানসুর তাদের দু'শ ব্যক্তিকে বন্দী করেন। আর সে জন্যই যারা বাইরে ছিল তারা খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। এমনকি কয়েদখানার ওপর অক্রমণ চালিয়ে তাদের সঙ্গীদের মুক্ত করে দেয়। এরপর তারা খলিফা মানসুরের প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তখন রাজধানীতে এ বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলা করার মত কোনো সেনাবাহিনীও ছিল না। খলিফার জন্য এ মুহূর্তটি ছিল খুবই

দমন করা হয় এবং ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়কে নগর থেকে বহিষ্কার করা হয়। ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে একটি বাইজান্টাইন আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং কনস্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট বাধ্য হয়ে সাত বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতির শর্তে শান্তিচুক্তি করেন।[৪৬]

খারিজি ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) মসুল ও বাহরাইনের খারিজিদের বিদ্রোহ দমন করেন। এ সময়ে খারিজি নেতা হাসান বিন মুজালিদ মসুল অধিকার করেন। খলিফা তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে উক্ত বিদ্রোহের অবসান ঘটান। এ সময়ে উত্তর আফ্রিকায়ও খারিজিগণ খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেখানকার আব্বাসীয় শাসক আমির বিন আব্বাসকে অপসারণ করে খারিজি নেতা মুসা খোরাসানি উক্ত অঞ্চল শাসন করা শুরু করে। খলিফা দ্রুত ইবনে আগলাবের নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রেরণ করে তাদের দমনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীতে সেনাপতি ইয়াজিদ বিন হাইসাম মুহাল্লবির নেতৃত্বে তাদেরকে দমন করা হয়। জর্জিয়ার খাজ্‌রাজ এবং মেসোপটেমিয়ার কুর্দিগণও বিদ্রোহী হয়ে উঠলে খলিফা তাদেরকে দমন করে খালিদ বিন বারমাকিকে সেখানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।[৪৭]

খলিফা আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন খফিফা আল-মাহদী[৪৮] (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.)। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি পিতার রূঢ় ও কঠোর শাসনের প্রতিকার সাধনে প্রয়াসী হন। প্রাণদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বড় অপরাধী ছাড়া অন্যদের কারাগার থেকে মুক্ত করে তিনি শাসনকার্য শুরু করেন। পবিত্র নগরদ্বয়কে (মাক্কা ও মাদিনা) ফিরিয়ে দেন তাদের পূর্বের সুযোগ-সুবিধা, যেগুলো তার পিতা প্রত্যাহার করেছিলেন। ফিরিয়ে দেন তার পিতা কর্তৃক রসুলুল্লাহ (স.)-এর বংশধরদের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি। মিশর থেকে নতুনকরে পণ্য সামগ্রী আমদানি করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

নাজুক। এ সংকটময় অবস্থায় খলিফাকে সহায়তা করার জন্য মা'য়ান বিন জায়দাহ নামক মারওয়ানের এক অনুচর এগিয়ে আসেন; যাকে হত্যা বা বন্দী করার জন্য খলিফা অনুসন্ধান করছিলেন, তার দ্বারাই খলিফার সে যাত্রায় জীবন রক্ষা হয়। মা'য়ান এই যুদ্ধে অধিনায়কের ভূমিকা পালন করেন এবং শহরবাসীদের সহায়তায় বিক্ষোভকারীরা তার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে। খলিফা মা'য়ান সম্পর্কে জানতে পারলে তাকে মাফ করে দেন এবং তার সম্মান ও মর্যাদাও বৃদ্ধি করেন। দ্র. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬২-২৬৩

৪৬. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 217

৪৭. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

৪৮. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আল-মানসুর আল-মাহদী আব্বাসীয় শাসনামলের তৃতীয় খলিফা। তিনি ১২৭ হিজরী/৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার হুমাইমা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম উম্মে আরদা বিনতে মানসুর হিময়ারী। তিনি প্রায় দশ বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে ২১শে মুহর্‌রম, ১৬৯ হি./৩ আগস্ট,৭৮৫ খিস্টাব্দে বাগদাদ থেকে উত্তরে অবস্থিত 'মাসানদান' নামক স্থানে ৪৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

বলপূর্বক অর্থ আদায় ও তহবিল অপচয়ের অভিযোগে পদচ্যুত সরকারি কর্মচারীদের থেকে আদায়কৃত জরিমানা যা 'বাইতুল মাল-লিল-মাজালিম' (নির্যাতিতদের কোষাগার)-এ জমা ছিল আল-মাহদী তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং মৃত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারীবর্গকে ফেরত দেন। এছাড়াও তিনি অনেক আঞ্চলিক প্রশাসককে প্রত্যাহার করে উক্ত পদসমূহে নতুন প্রশাসক নিয়োগ করেন।[৪৯]

খলিফা আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) তার খেলাফতের প্রথম বছরেই হিন্দুস্থানে একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। আব্দুল মালিক বিন শিহাব শিহাব সাময়ী সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করে একটি বাহিনী নিয়ে সিন্ধু উপকূলের দিকে রওনা হন। তারা 'বারবদ' নামক বন্দরে অবতরণ করে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বহু সংখ্যক বারবদবাসী এবং মাত্র বিশজন মুসলমান নিহত হয়। কিন্তু যুদ্ধের পরপরই মুসলমানদের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতে প্রায় এক হাজার মুসলমান মারা যায়। আব্দুল মালিক বিন শিহাব সেখান থেকে জাহাজে আরোহণ করে পারস্য অভিমুখে রওনা হন, কিন্তু উপকূলের নিকটবর্তী হতে না হতেই সামুদ্রিক ঝড় উঠে এবং তাতে বেশ কয়েকটি জাহাজ ডুবে যায়। ফলে সেখানেও বেশ কিছু মুসলমানের সলীল সমাধি ঘটে।[৫০]

পূর্বের দুই খলিফার (আস-সাফ্ফাহ ও আল-মানসুর) চেয়ে খলিফা আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিয়মিত সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছেন। তিনি ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের একটি শহর আক্রমণ করার জন্য আব্বাস বিন মুহাম্মাদের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন ছাড়াই তারা রোমানদের একটি বড় শহর জয় করেন। ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা মুসলিম অঞ্চলে আক্রমণ করে মার'য়াশ (জার্মানিসিয়া/Germanicia) শহর দখল করে সেখানকার বাসিন্দাদের হত্যা করে। এ হামলার জবাবে খলিফা খোরাসান ও অন্যান্য এলাকা থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে ইসা বিন মুসা, আব্দুল মালিক বিন শিহাব সালিহ ও হাসান বিন কাহতাবা প্রমুখ সেনাপতিবৃন্দসহ পুত্র হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনীর প্রেরণ করেন। হারুন-অর-রশিদ রোমানদের সীমান্তে প্রবেশ করেন এবং সামালিয়ানসহ (Samalion) কয়েকটি শহর জয় করেন। দুই বছর পরে রোমানরা সেনাপতি মেগাথাকোমিস (Megathakomes) এর নেতৃত্বে পুনরায় মুসলিম সাম্রাজ্যে আক্রমণ করে। ৭৮২

---

৪৯. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 230
৫০. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম,* প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫

খ্রিস্টাব্দে রোমানদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য খলিফা হারুন-অর-রশিদ (এক লাখ চুরানব্বই হাজার চারশো পঞ্চাশ দিরহামের) রসদসামগ্রী ক্রয় করেন এবং প্রায় এক লাখ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতির কথা শুনে রোমান শাসক চতুর্থ লিওর বিধবা স্ত্রী আইরিন আতঙ্কিত হয়ে উঠে এবং খলিফার সঙ্গে সন্ধি করতে সম্মত হন। ৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে বিজয়ের বেশে খলিফা তার বাহিনী নিয়ে বাগদাদে ফিরে আসলে সর্বত্র উৎসবমূখর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং তাঁকে 'আর-রশিদ' উপাধি দেওয়া হয়।[৫১] ১৪ই রবিউল আওয়াল, রবিবার, ১৭০ হি/৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে আপন ভ্রাতা আল-হাদির (৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.) মৃত্যুর পর খলিফা হারুন-অর-রশিদ ২৫ বছর বয়সে খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। তার শাসনামলে আব্বাসীয় খেলাফতের উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের বিখ্যাত অগ্রগামী প্রজারঞ্জক শাসক।[৫২] সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সর্বপ্রথম খারিজিদের সর্বাত্মক বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। ৭৮৭-৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে মসুলে খারিজি বিদ্রোহ প্রকট আকার ধারণ করে। মেসোপটেমিয়ার আব্বাসীয় শাসনকর্তা আবু হুরাইরা এ বিদ্রোহ দমনে অপারগ হলে খলিফা তাকে হত্যার আদেশ দেন। ওয়ালিদ বিন তারিকের নেতৃত্বে অপর একটি বিদ্রোহ আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং মেসোপটেমিয়ার হুলওয়ান পর্যন্ত চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকে। খলিফা একটি বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে রাষ্ট্রদ্রোহী ওয়ালিদকে পরাজিত করেন। ওয়ালিদের মৃত্যুর পর তার ভগ্নি লায়লা খারিজি বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে আসে। শোকাভিভূত লায়লা ভ্রাতার রোমাঞ্চকর অভিযানের শোকগাথা রচনা করে কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। তার পরিচালনায় খারিজিগণ ইরাকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। পরবর্তীতে তারা উপর্যুপরি কয়েকটি সংঘর্ষে খলিফার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। অবশেষে লায়লা খলিফার জনৈক সেনাপতির নিকট পরাজিত হন। তাকে নারীসুলভ জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং অবশেষে তিনি খলিফার বশ্যতা স্বীকার করেন।[৫৩]

এছাড়া ১৮৭ হিজরীতে রোম সম্রাট নাকফুর (نقفور) মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে সম্পাদিত অঙ্গিকারনামা ভঙ্গ করে খলিফা হারুন-অর-রশিদের নিকট নিম্নোলিখিত পত্র পাঠান।[৫৪]-

---

৫১. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 233; ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮-৪৯

৫২. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* pp. 238-239

৫৩. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬

৫৪. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৮

من (نقفور) ملك الروم، إلى (هارون) ملك العرب، أما بعد: فأن الملكة التى كانت قبلى كانت أقامتك مقام الرخ، واقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها أحمالا، وإلا فالسيف بيننا وبينك.

"রোমান অধিপতির (নাকফুর) পক্ষ থেকে আরব বিশ্বের বাদশাহ (হারুন)-এর প্রতি। নিশ্চয় আপনি অবগত আছেন, যে সম্পত্তি আমার পূর্বে রোমানদের অধীনে ছিল, সেসময়ে আপনার অবস্থা ছিল দাবার গুটির মত এবং তারা ছিল অধিকতর দুর্বল ও নির্বুদ্ধি সম্পন্ন। ফলে তারা প্রচুর ধন-সম্পদের বিনিময়ে আপনার সাথে সন্ধি করেছে। অতএব এ পত্র পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে যে ধনরাজি আপনি তাদের থেকে অর্জন করেছেন তা অবশ্যই ফেরত পাঠাবেন; অন্যথায় তরবারি আমাদের ও আপনার মাঝে সমাধান করবে।" উক্ত পত্রটি পড়ে খলিফা ক্রোধান্বিত হয়ে সভাসদবৃন্দ ও আমির-উমারাগণের পরামর্শ ছাড়াই নিম্নোক্ত পত্র লিখেন[৫৫]:

"بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين، إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه، لا تسمعه."

(করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমিরুল মু'মিনিন হারুনের পক্ষ হতে, রোমান কুকুর নাকফুরের প্রতি। হে কাফেরের বাচ্চা ! আমি তোমার পত্র পড়েছি। এর জবাব শীঘ্রই নিজ চোখে দেখতে পাবে, শোনার প্রয়োজন নেই।)

খলিফা সে দিনই একদল সৈন্য নিয়ে 'হিরাকল' শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সহজেই মুসলমানরা বিজয় লাভ করে এবং নাকফুর প্রতি বছর খারাজ দিতে সম্মত হয়ে খলিফার সাথে সন্ধি করেন। কিন্তু খলিফা সদলবলে 'র'ক্কাহ' (الرقة) জনপদে ফিরে এলে নাকফুর আবার সন্ধি ভঙ্গ করেন এই ভেবে যে, প্রচণ্ড শীতের কারণে খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) আর আক্রমণ করবে না। সন্ধি ভঙ্গের খবর সাহসকরে কেউ খলিফাকে বলতে পারছিলেন না। তখন আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ তামিমী ও আবুল আতাহী এ বিষয়টি কবিতার মাধ্যমে খলিফাকে অবহিত করার চেষ্টা করেন যা দ্বারা খলিফা বিষয়টি অনুধাবন করে আবার ফিরে যান এবং নাকফুর বাহিনীর ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে বিজয়ী হন।[৫৬]

---

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯
৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২২৯

খলিফা আস-সাফ্ফাহ (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.) ও খলিফা আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)-এর শাসনামলে বারমাকীগণ রাজদরবারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) খেলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত হলে খালিদ বিন বারমাকের পুত্র ইয়াহ্ইয়াকে তার উপদেষ্টা ও উজির নিযুক্ত করেন। ইয়াহ্ইয়া খলিফা হারুন-অর-রশিদের শিক্ষক হওয়ার কারণে তাকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করতেন এবং সবসময় তার পরামর্শ ও উপদেশ মেনে চলতেন। খলিফা তাকে সাম্রাজ্যের উজির নিযুক্ত করেন এবং তার হাতে সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। ইয়াহ্ইয়ার পুত্র ফজল, জাফর, মুসা এবং মুহাম্মাদও ছিলেন অতিশয় দক্ষ এবং উচ্চপর্যায়ের শাসনক্ষমতা সম্পন্ন পুরুষ। প্রায় সতের বছর অবিচল নিষ্ঠা ও অসাধারণ যোগ্যতার সাথে বারামাকী পরিবার সম্রাটের সেবা করে। জনসাধারণ ছিল সুখী ও সমৃদ্ধ, সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছিল ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিমান, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছিল বহুগুনে এবং সর্বত্র সভ্য জীবনধারার কলাকৌশলের অনুশীলন হতো। বারমাকীদের প্রভাব ও ক্ষমতা ছিল অপরিসীম এবং তাদের খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্যের সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক উচ্চ পদগুলো তাদের পরিবার বা অনুসারীদের মধ্য থেকে মনোনীত কর্মচারীদের দ্বারাই পূরণ করা হতো। তারা সুকৌশলে সমস্ত ক্ষমতা আয়ত্ব করেছিল। কিন্তু প্রাসাদাধ্যক্ষ ফজল বিন রাবি নিজের পদমর্যাদার মাধ্যমে প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগিয়ে জ্বলন্ত ঈর্ষার বশে বারমাকীদের বিরুদ্ধে খলিফার মনকে বিষিয়ে তোলেন এবং হঠাৎ একরাতে বৃদ্ধ ইয়াহ্ইয়া ও তার পুত্র ফজল, মুসা ও মুহাম্মাদকে বন্দী করা হয়; বাজেয়াপ্ত করা হয় তাদের সম্পত্তি।[৫৭]

খলিফার পত্নী জুবাইদা এবং তার ভ্রাতা ইসা বিন জাফরের চাপে হারুন-অর-রশিদ ১৭৫ হি./৭৯১ খ্রিস্টাব্দে তার পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্র মুহাম্মাদকে 'আল-আমীন' (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এর সাত বৎসর পরে ৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে খলিফা পুনরায় তার পারস্য দেশীয় স্ত্রী মারাজিলের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহকে 'আল-মামুন' (বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত করে দ্বিতীয় মনোনয়ন দান করেন। তাছাড়া খলিফা তাঁর তৃতীয় পুত্র কাশিমকে 'আল-মুতামিন' উপাধি দিয়ে আল-মামুনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।[৫৮] ১৯৫ হি./৮১১ খ্রিস্টাব্দে আল-মামুনকে বঞ্চিত করে আল-আমীন (৮০৯-৮১৩ খ্রি.) তার শিশুপুত্র মুসাকে 'নাতিক বিল-হক্ব' (সত্য বিঘোষক) উপাধী দিয়ে

---

৫৭. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene*, pp. 238-239, 243-245

৫৮. ibid, p. 241; ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯-৮০

উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। অপরদিকে আল-মামুনের সেনাপতি আহওয়াজ, ইমামা, বাহরাইন ও ওমান অধিকার করেন। আল-মামুনের বশ্যতা স্বীকার করেন কুফায় নিযুক্ত আমিনের শাসনকর্তা হাদির পুত্র আব্বাস, বসরার শাসনকর্তা মাহদীর পুত্র মানসুর এবং ইসার পুত্র দাউদ যিনি পবিত্র নগরীদ্বয়ের (মাক্কা ও মাদিনা) শাসনকর্তা ছিলেন। পরিশেষে আল-আমীনের পতনের ফলে প্রতিযোগিতায় আরবরা পরাজিত হয় এবং পারসিকরা জয়লাভ করে। এতে সাম্রাজ্যে পারসিকদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৯] খলিফা আল-মামুনের ক্ষমতারোহণের কিছুদিন পরেই মেসোপটেমিয়ার নসর বিন সাবাহ নামে এক ব্যক্তি তীব্র বিক্ষোভ ও প্রচারণা শুরু করে। তিনি বিক্ষুব্ধ আরবদের নেতৃত্ব দান করে আলেপ্পো ও এর আশেপাশের মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করে নেয়। সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার নবনিযুক্ত শাসনকর্তা তাহির এ বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে নসর পাঁচ বছর এশিয়া মাইনরের সীমান্তবর্তী অঞ্চল শাসন করেন। তাহিরের স্থলে ফজল বিন সাহল স্বীয় ভ্রাতা হাসান বিন সাহলকে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে তিনি ৮১৮ খ্রিস্টাব্দে নসরকে নিরস্ত্র করে খলিফার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন।[৬০]

এছাড়া আবু-সারাইয়া নামক একজন দুর্ধর্ষ তস্কর কুফা অধিকার করে বিন তাবাতাবা নামক একজন আলী বংশীয়কে খলিফা বলে ঘোষণা করে। পারস্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এবং আলী বংশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আবু-সারাইয়া নামের এ প্রভাবশালী ব্যক্তি কুফা অধিকার করে প্রচারণা শুরু করে। আবু সারাইয়া বাগদাদ হতে প্রেরিত আব্বাসীয় সেনাপতি হাসান বিন সহলের বাহিনীকে বারবার পরাজিত করে বসরা এবং মেসোপটেমিয়ার কিয়দাংশ দখল করে নেন। সারাইয়া আলী বংশীয় মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম বিন তাবাতাবাকে অধিকৃত অঞ্চলের খলিফারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনি তার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন। আরবের সর্বত্র এ খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে খলিফা হিসেবে মেনে নেয়। তবে তার প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলে সারাইয়া তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে এবং আলী পরিবারের অন্য এক নাবালক পুত্রকে খলিফা মনোনীত করে। সারাইয়ার প্রভাব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে উজির ফজল বিন সহল হারসামাকে ৮১৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ দমনে পাঠান। অবশেষে সারাইয়া পরাজিত হয়ে ৮০০ জন অনুচরসহ পলায়নকালে নিহত হন।[৬১]

---

৫৯. আবুল হাসান আলী বিন হুসাইন আল-মাসউদী, *মুরুজুয জাহাব*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯
৬০. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯১-৯২
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ.৯২

রাজনীতির ক্ষেত্রে তুর্কীদের প্রভাব ক্রমে ক্রমে এতদূর বৃদ্ধি লাভ করে যে, খলিফা আল-ওয়াসিক বিল্লাহ (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) তার খেলাফতকালে তুর্কীনেতা আশনাসকে ২২৮ হিজরী/৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে নায়েব পদ দান করে তাকে মণিমুক্তা খচিত মুকুট ও পোষাক পরিধান করান। তিনিই প্রথম খলিফা যিনি সর্বপ্রথম নায়েব মনোনীত করেন। তুর্কীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। অসামান্য বদান্যতার অধিকারী খলিফা আল-ওয়াসিক বিল্লাহ (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.)-এর অকাল মৃত্যু আব্বাসীয় খেলাফতে এক অপূরণীয় বিপর্যয় ডেকে আনে।[৬২] তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই আব্বাসীয় খেলাফতে ক্রমাবনতি ও গৌরবের অবক্ষয়ের সূচনা হয়। পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে তাদের ইতিহাস খলিফাগণের ক্ষমতাশূন্যভাবে সিংহাসনারোহণ এবং শোক-দুঃখ ব্যতীত তাদের মৃত্যুবরণের এক গোলযোগপূর্ণ চিত্রই তুলে ধরে। এর মূলে রয়েছে পরবর্তী খলিফাগণের দূর্বলতা এবং তাদের ওপর তুর্কী সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র প্রভাব। আল-ওয়াসিক বিল্লাহ মৃত্যুকালে কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। ফলে তৎকালীন আমির, উজির এবং অন্যান্য সভাসদের অনেকেই খলিফার অল্পবয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে আরোহণের ইচ্ছা পোষণ করলেও তুর্কী নেতাদের আপত্তিতে আল-ওয়াসিক বিল্লাহর ২৬ বছর বয়স্ক ভাই জাফরকে 'আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ' (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) উপাধী দিয়ে খলিফা নির্বাচন করেন। 'আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ' প্রায় ১৫ বছর রাজত্ব করেন।[৬৩] তার মৃত্যুর পর আল-মুনতাসির বিল্লাহ (৮৬১-৮৬২ খ্রি.) তুর্কী সেনাদের সাহায্যে সহজেই খেলাফতের আসনে সমাসীন হন। তবে মাত্র ছয় মাস রাজত্বের পর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার এ স্বল্পকাল খেলাফতের পর তুর্কী নেতাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আল-মুসতা'ঈন বিল্লাহ ৮৬২ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মনোনীত হন। খলিফা আল-মুনতাসির বিল্লাহ-এর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে যে গোলযোগ দেখা যায় তা মুস্তাইন বিল্লাহ-এর ক্ষমতারোহণ প্রক্রিয়াকে আরো দীর্ঘয়িত করে। এসময়ে আঞ্চলিক শাসকগণ নিজ নিজ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে আরো বেশি অনুকূল পরিবেশ পান। তুর্কী রক্ষীদের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে তিনি বাগদাদে গমন করে আরব ও পারসিক সৈন্যদের সমর্থন প্রত্যাশা করেন। কিন্তু তিনি হেজাজের পথে গমনকালে এক গুপ্তচরের হাতে নিহত হলে খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ

---

৬২. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০ এবং ২৭৩
৬৩. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 286-288

(৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)-এর দ্বিতীয় পুত্র আল-মু'তায বিল্লাহ (৮৬৬-৮৬৯ খ্রি.) খলিফা মনোনীত হন। সেসময়ে বাগদাদের পারস্য সেনাপতিগণের সঙ্গে সামারার তুর্কী সেনাপতিদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। খলিফা তুর্কী সৈন্যদের বেতনের দাবি পূরণে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করলে তারা তাকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য খলিফা আল-ওয়াসিক বিল্লাহ-এর পুত্র মুহাম্মাদ আল-মুহ্তাদী বিল্লাহ (৮৬৯-৮৭০ খ্রি.)-কে খলিফা মনোনীত করে। তিনি ছিলেন ন্যায় পরায়ণ, সুদক্ষ এবং নিষ্ঠাবান শাসক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তুর্কী সেনাদের অনুরোধে খেলাফতের দায়িত্ব নেন। তিনি প্রাসাদ থেকে গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ ও অন্যান্য পরান্নভূকদের বহিষ্কার করেন; চেষ্টা করেন ইসলামী শরী'য়াহ অনুসারে রাষ্ট্র শাসন করার। কিন্তু তিনি এমন এক সংকটকালে ক্ষমতারোহণ করেন যখন খেলাফতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। তার প্রতি প্রায় সকলেই আনুগত্য প্রকাশ করলেও সাম্রাজ্যের আমির-অমাত্যদের নানাবিধ দাবি পূরণে তিনি অনেকটা অসহায় হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং মাত্র এক বছর পরে ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসীয় খেলাফতে রাজনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করে। সামরিক ও বেসামরিক আমলাগণ রাজনেতিক কর্তৃত্বে থাকায় তাদের ইশারায় খলিফা মনোনয়ন ও পদচ্যুতি ঘটতে থাকে।[৬৪] অতঃপর আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)-এর জীবিত পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল আব্বাসকে মু'তামিদ আলাল্লাহ' উপাধি দিয়ে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মু'তামিদ আলাল্লাহ' (৮৭০-৮৯২ খ্রি.) দুর্বল, অস্থিরচিত্ত ও আমোদপ্রিয় হওয়ার ফলে তার সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন ভাই আবু আহমাদ মুওয়াফফিক প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্য শাসন করেন। এসময় 'জানাজ' সম্প্রদায়ের হাসান বিন জায়িদ নামক এক পারস্য নেতা নিজেকে আলী (রা.)-এর বংশধর বলে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে বহু মুসলিমকে নিজ দলে সমবেত করে বসরায় বিদ্রোহ শুরু করে। তারা কয়েকবার খলিফার বাহিনীকে পরাজিত করে ইরাক এবং বাহরাইন আক্রমণ করে সাম্রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করে। অবশেষে খলিফার

৬৪. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* pp. 290-292; জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-২৮৮

ভ্রাতা অভিযান প্রেরণ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। কিন্তু ২৭৮ হিজরীতে মুওয়াফফিকের আকস্মিক মৃত্যু এবং কিছুদিন পর খলিফার মৃত্যুতে আব্বাসীয় খেলাফতের নিয়ন্ত্রণ আবার ভেঙ্গে পড়ে।[৬৫]

খলিফা মু'তামিদ আলাল্লাহ (৮৭০-৮৯২ খ্রি.)-এর পর মুওয়াফফিকের পুত্র আবুল আব্বাস আহমাদকে 'আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ' (৮৯২-৯০২ খ্রি.) উপাধি দিয়ে খলিফা মনোনীত করা হয়। তিনি নির্বাচিত হয়ে ক্ষয়িষ্ণু আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে পুণরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। ২২ রবিউস সানি, ২৯৯ হিজরী/৫ এপ্রিল, ৯০২ খ্রিস্টাব্দে আবু মুহাম্মাদ আলী আল-মুক্তাফী বিল্লাহ (৯০২-৯০৮ খ্রি.) আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ১৭তম খলিফা নির্বাচিত হয়ে পূর্ববর্তী খলিফার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্বের পর তিনি ইন্তিকাল করেন। এরপর তুর্কীরা আব্বাসীয় খলিফাগণকে নিজেদের হাতের ক্রীড়ণক করার মানসে কম বয়স্কদের খেলাফতে অধিষ্ঠিত করতে থাকে। তারা ত্রয়োদশ বর্ষীয় জাফর আল-মুকতাদির বিল্লাহকে (৯০৭-৯৩৪ খ্রি.) খলিফা নির্বাচিত করেন; যিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর আব্বাসীয় খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৬৬] এরপর তুর্কী আমীরগণ আল-মুকতাদির বিল্লাহ-এর পুত্র আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ আর-রাজী বিল্লাহ (৯৩৪-৯৪০ খ্রি.)-কে খলিফা মনোনীত করেন। তার খেলাফতকালে প্রদেশগুলো একের পর এক স্বাধীন হতে থাকে। তার সিংহাসনারোহণের পরেই ওয়াসিত ও বসরার শাসনকর্তা মুহাম্মাদ বিন রাইক সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষীগত করেন এবং খলিফা কর্তৃক 'আমিরুল-উমারা' উপাধিতে ভূষিত হন। এভাবেই খলিফাদের ক্ষমতার শেষ চিহ্নটুকু বিলীন হয় এবং প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্তাগণ অবতীর্ণ হন স্বাধীন ভূমিকায়।[৬৭]

খলিফা আর-রাজী বিল্লাহ-এর মৃত্যুর পর আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন মুকতাদির বিন মু'তাজ বিন মুফিক ত্বলহা বিন মুতাওয়াক্কিল (৯৪০-৯৪৪ খ্রি.)-কে 'আল-মুত্তাকী লিল্লাহ' উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করা হয়। তিনি ৩৪ বছর বয়সে অতীব সংকটময় অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। এসময় বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি তুর্কীদের খেলার পুতুলে পরিণত হন। তুর্কী সেনাপতি তুজুন

---

৬৫. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* pp. 292-293 & 296; ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩-১১৪

৬৬. আবুল ফিদা ইসমাইল আলী, *কিতাবুল মুখতাসার ফি আখবারুল বাশার* (কায়রো: দারুল মায়ারিফ, তা.বি), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০০; আহমাদ আমীন, *জহরুল ইসলাম* (কায়রো: মাকতাবাতুল লাজনাহ ওয়াত তালিফ ওয়াত তাজামাহ ওয়ান নাসর, ১৩৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১১-২৭; আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮-৩০০

৬৭. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p.301

বিদ্রোহ করে তাকে খেলাফত থেকে পদচ্যুত করে। অতঃপর আল-মুস্তাকফী বিল্লাহ (৯৪৪-৯৪৬ খ্রি.) খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হলে তুর্কীদের ঔদ্ধত্য ও দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে খলিফা তাদের অক্টোপাস হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য বানু বুওয়াইয়ার সাহায্য প্রার্থনা করলে তাদের নেতা আহমাদ সসৈন্যে বাগদাদে প্রবেশ করলে তুর্কী নেদা সৈন্যবাহিনীসহ পলায়ণ করে। ফলে তুর্কী স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে শুরু হয় বানু বুওয়াইয়ার স্বাধীন শাসনের যুগ।[৬৮]

তুর্কী সেনাপতি তুজুন ৩৩৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করলে তারই সহচর আবু জাফর বিন শিরজাদের মধ্যে সাম্রাজ্য দখলের লালসা সৃষ্টি হয় এবং এ লক্ষ্যে তিনি সৈন্যদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। তবে খলিফা আল-মুস্তাকফী বিল্লাহ (৯৪৪-৯৪৬ খ্রি.)-এর ভ্রাতা আহমাদ বিন বুওয়াইহ বাগদাদে আসলে শিরজাদ আত্মগোপন করেন। খলিফা তার জ্যেষ্ঠ ভাই আহমাদকে মইজুদ্দৌলা (معزالدولة), অপর ভাই আলীকে ইমাদুদ্দৌলা (عماد الدولة) এবং তৃতীয় ভাই হাসানকে রুকনুদ্দৌলা (ركن الدولة) উপাধি দেন। খলিফা নিজেও ইমামুল হক (إمام الحق) উপাধি ধারণ করে ফরমান জারি করেন।[৬৯]

কিছুদিনের মধ্যেই প্রশাসন মইজুদ্দৌলার হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে; তিনি সুলতান উপাধি লাভ করেন। তার নাম মুদ্রায় খচিত হয় এবং খলিফার নামের সাথে তার নাম খুতবায় পঠিত হয়। তিনি খলিফার দৈনিক খরচের জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। কিছুদিন পর খলিফা সম্পর্কে মইজুদ্দৌলার বিরুপ ধারণা জন্ম নেয়। ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে খলিফা আল-মুস্তাকফী বিল্লাহকে সিংহাসনচ্যুত করে জেলখানায় বন্দী করা হয় এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৭০]

অতঃপর ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ (৯০৮-৯৩২ খ্রি.)-এর আরেক পুত্র আবুল কাসিম আল ফজলকে আল-মুতী বিল্লাহ (৯৪৬-৯৭৪ খ্রি.) উপাধি দিয়ে খলিফার পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। বুওয়াইহী বংশ প্রায় এক শতাব্দী কাল তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে; এসময় পদমর্যাদায় তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এমন কেউ ছিল না। তুর্কী সামরিক বাহিনী নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুর ছিলেন, কিন্তু মোটামুটিভাবে তাদের আধিপত্য জনসাধারণের উন্নতি এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার সহায়ক ছিল। ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে মইজুদ্দৌলা প্রয়াত হন এবং তার পুত্র বখতিয়ার 'ইজ্জুদ্দৌলা' উপাধি প্রাপ্ত

---

৬৮. ড. হাসান ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলাম* (বৈরুত: দারুল জিল, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৩২

৬৯. জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা* (বৈরুত: দারুল মিনহাজ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬১৩

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩-৬১৪

হয়ে আমীরুল-উমরা পদে স্থলাভিষিক্ত হন। সাত বছর পর খলিফা আল-মুতী বিল্লাহ (৯৪৬-৯৭৪ খ্রি.) পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বুওয়াইহী আমীরের নির্দেশে তার পুত্র আবু বকর আব্দুল করিমের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন, যিনি আত-তায়ী বিল্লাহ (৯৭৪-৯৯১ খ্রি.) উপাধি নিয়ে ১৩ জুলক্বদ ৩৬৩ হিজরী/০৫ আগস্ট, ৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন।[৭১]

আবু বকর আব্দুল কারিম আত-তায়ী বিল্লাহ (৯৭৪-৯৯১ খ্রি.)-এর সিংহাসনারোহণকালে বিখ্যাত ফাতিমী খলিফা আল-মুইজ লি-দীনিল্লাহ সিরিয়া ও হেজাজ জয় করেন। কিছুদিন পর ইজ্জুদ্দৌলা তার পিতৃব্য আদুদ্দৌলা কর্তৃক পদচ্যুত হন। খলিফা বাধ্য হয়ে আদুদ্দৌলাকে তাজুল-মিল্লাত (ধর্মের মুকুট) উপাধিতে ভূষিত করেন। ৩৭২ হিজরী/৯৮২ খ্রিস্টাব্দে আদুদ্দৌলার মৃত্যুর পর তার পুত্র শামসুদ্দৌলা তার ভাই শরফুদ্দৌলা কর্তৃক পদচ্যুত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত প্রায় চার বছর আমিরুল-উমারা পদে স্থলাভিষিক্ত থাকেন। শরফুদ্দৌলার ইন্তিকালের পর ৩৭৬ হিজরী/৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তার উত্তরাধিকারী হন তার পুত্র আবু নাসির; যিনি বাহাউদ্দৌলা ও জিয়াউল-মিল্লাত উপাধিতে ভূষিত হন।[৭২]

খলিফা আত-তায়ী বিল্লাহ (৯৭৪-৯৯১ খ্রি.) বাহাউদ্দৌলা কর্তৃক পদচ্যুতির পর ১৯ শাবান, ৩৮১ হিজরী/০১ নভেম্বর, ৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ভ্রাতা আবুল আব্বাস আল-কাদির বিল্লাহ (৯৯১-১০৩২ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সময় বানু বুওয়াইয়াদের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। অতঃপর আল-কাদির বিল্লাহ-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু জাফর আব্দুল্লাহ আল-কায়িম বিল্লাহ (১০৩১-১০৭৫ খ্রি.) বাগদাদের খেলাফতে অভিষিক্ত হন। তিনি বুওয়াইহী আমিরদের হেফাজতে প্রায় চব্বিশ বছর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতাহীন খলিফার ভূমিকা পালন করেন। তার সময়ে তুর্কী সেনাপতি আরসানাল আল-বাসাসীরী যাবতীয় ক্ষমতা দখল করেন এবং বুওয়াইহী বংশের মালিক আব্দুর রহিমকে আমিরুল উমারা বা প্রাসাদাধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারিত করেন। মুসলিম সাম্রাজ্যে বাসাসীরী অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিংস্র হয়ে উঠে। তিনি খলিফাকে বন্দী করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ সংকটকালে খলিফা আল-ক্বায়িম বিল্লাহ রায়ের শাসনকর্তা আবু তালিব মুহাম্মাদ বিন মিকালের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইবনে মিকাল বাগদাদে এসে বাসাসীরীর বাসগৃহে আগুন জ্বালিয়ে দিলে সে 'রাহবাহ' শহরে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বাসাসীরী

---

৭১. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 303-304
৭২. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৫-৪৯৮

মিশরের শাসনকর্তা ও তুর্কীদের সহযোগিতায় খলিফার বিরুদ্ধে দীর্ঘ এক মাস লড়াই করে তাকে গানায় বন্দী করে রাখে এবং ফাতিমীয় খলিফা আল-মুনতাসির বিল্লাহকে ধর্মীয় নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আব্বাসীয় খলিফা আল-ক্বায়িম বিল্লাহ (১০৩১-১০৭৫ খ্রি.)-এর খেলাফতের নিদর্শনসমূহ যথা রাজপোশাক, রাজদণ্ড ও ধর্মীয় মঞ্চ মিশরের কায়রোতে পাঠানো হয়। তুগরিল বাক দ্রুত বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে বিদ্রোহী বাসাসীরীকে পরাজিত করে খলিফার শাসন পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৩]

তুগরিল বাককে খলিফা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব দান করে আরব ও পারসিকদের প্রতীকস্বরূপ তার মাথায় দু'টি মুকুট পরিয়ে দেন। অতঃপর ঘোষকগণ তাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তুগরিলের অধীনে সেলজুকগণ এশিয়ার সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী জাতিতে পরিণত হয়। খলিফা আল-ক্বায়িম বিল্লাহ-এর মৃত্যুর পর তার পৌত্র আবুল কাসিম আব্দুল্লাহ আল-মুকতাদি বি-আমরিল্লাহ (১০৭৫-১০৯৪ খ্রি.) উনিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, পূণ্যবান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উদার মনের একজন খলিফা। তিনি তার অধিকৃত রাজ্যগুলো যত্নের সাথে শাসন করেন।[৭৪] খলিফার পরলোকগমনের পর তার পুত্র আবুল আব্বাস আহমাদ আল-মুনতাজির বিল্লাহ (১০৯৪-১১১৮ খ্রি.) ষোল বছর বয়ষে খেলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। কিন্তু তার সিংহাসনারোহণের পরেই ধর্মান্ধতার হিংস্র ঝটিকা প্রচণ্ডবেগে পশ্চিম এশিয়ার ওপর আপতিত হয়। গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব, সুলতানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ক্রুসেডগুলো এক চরম ক্ষিপ্রতাপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীগণ নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক অভিযান চালিয়ে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে। ক্রুসেড-যোদ্ধারা নগরের পর নগর দখল করে অধিবাসীদের হত্যা করতে থাকলে তাদের নিকট হতে মুষ্টিমেয় যেসব শরণার্থী পরিত্রাণ পেয়েছিল তারা স্রোতের মতো বাগদাদে প্রবেশ করে। শরণার্থীদের স্রোতধারায় মসজিদগুলো ভরে যায়। তাদের লোমহর্ষক কাহিনী বাগদাদ নগরীকে করে তোলে শোকাভিভূত। এ পরিস্থিতি দেখে খলিফা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরেন।[৭৫]

---

৭৩. আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা* (বৈরুত: দারুল মিনহাজ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬৪২-৬৪৯

৭৪. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 319

৭৫. আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৪-৬৬২

খলিফা আল-মুনতাজির বিল্লাহ দীর্ঘ পঁচিশ বছর খেলাফতে অধিষ্ঠিত থেকে ৫১২ হিজরীর ১৩ রবিউল আওয়াল মৃত্যুবরণ করেন। পরে আবু মানসুর আল-ফযল্ আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ (১১১৮-১১৩৫ খ্রি.) তার উত্তরাধিকারী হন। তিনি খেলাফতকে সুসংহত ও সুদৃঢ়করণে বিস্তর অবদান রাখেন। তবে সুলতান মাহমুদ বিন মুলক শাহ নিহত হওয়ার পর তার ছেলে দাউদ সুলতান হলে তারই চাচাত ভাই মাসউদ বিন মুহাম্মাদ দাউদের ওপর আক্রমণ করে। বাগদাদে খুৎবায় খলিফার নামের পাশাপাশি মাসউদের নাম পাঠ করা হতে থাকে। কিছুদিন পর মাসউদের সাথে খলিফার দ্বন্দ্ব দেখা দিলে উভয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু খলিফার সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করলে যুদ্ধে মাসউদ জয়লাভ করে এবং খলিফাকে তার সহযোগীসহ হামাদানের নিকটবর্তী এক দুর্গে বন্দী করে রাখে। বন্দী অবস্থায় তিনি ১৬ জিলক্বদ্, ৫২৯ হি./২৮ আগস্ট, ১১৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৬] এরপর তার পুত্র আবু জাফর মানসুর আর-রশিদ বিল্লাহকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই সুলতান মাসউদের সাথে তার মতানৈক্য হলে তাকেও পদচ্যুত করে খলিফা মুসতাজহির বিল্লাহর (১০৯৪-১১১৮ খ্রি.) চল্লিশ বছর বয়সী পুত্র আবু আব্দুল্লাহকে আল-মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ (১১৩৬-১১৬০ খ্রি.) উপাধি দিয়ে খলিফা হিসেবে মনোনীত করা হয়। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর সুবিচারের মাধ্যমে বাগদাদ নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। সুলতান মাসউদ ক্রমশ দুর্বল, অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং ৫৪৭ হি./১১৫৩ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৭৭]

খলিফা আল-মুকতাফী লি-আমরিল্লাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র আবুল মুজাফ্ফার আল-ইউসুফ আল-মুনতানজিদ বিল্লাহ (১১৬০-১১৭০ খ্রি.) খেলাফতের উত্তরাধিকারী হন। খেলাফত লাভের চার বছর পর ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নুরুদ্দীন, আমির আসাদ উদ্দীন শিরকুহর নেতৃত্বে দু'হাজার অশ্বরোহী সৈন্য দিয়ে মিশর অভিযানে প্রেরণ করেন। শিরকুহ প্রায় দু'মাস মিশর অবরোধ করে রাখেন এবং শত্রু বাহিনীর তুলনায় নিজেদের সৈন্য সামান্য হওয়ার পরও বিজয় অর্জন করেন।[৭৮] ৫৪২ হি./১১৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ান সেন্ট বার্নার্ড (St. Bernard) দ্বিতীয় ক্রুসেডের ঘোষণা দেন। এতে যুক্ত হন জার্মানির সম্রাট তৃতীয় কনরাড/Conrad III (১০৯৩-১১৫২ খ্রি.) এবং

---

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৩-৬৬৫

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭০-৬৭২

৭৮. আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৮-৬৭৯

ফ্রান্সের সপ্তম লুইস/Louis VII (১১২০-১১৮০ খ্রি.)। সাইফুদ্দীন গাজী ও সুলতান নুরুদ্দীন মাহমুদের হস্তক্ষেপে তারা দ্রুত দামেস্ক ছেড়ে প্যালেস্টাইনের দিকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। অতঃপর কনরাড এবং লুইস ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং দ্বিতীয় ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে ।[৭৯]

১১৭০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল-মুনতানজিদ বিল্লাহ (১১৬০-১১৭০ খ্রি.)-এর মৃত্যুর পর আবু মুহাম্মাদ আল-হাসান আল-মুসতাদী বি-আমরিল্লাহ (১১৭০-১১৮০ খ্রি.) খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে সকল অবৈধ শুল্কসমূহ রহিত করেন। তিনি অত্যন্ত নম্র, দয়ার্দ্র ও ন্যায়রপরায়ণ খলিফা ছিলেন। ইয়ামান, মিশর ও উসওয়ান পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয় এবং মুদ্রায় তার নাম খোদাই করা হয়।[৮০] খলিফা মুসতাদী বি-আমরিল্লাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র আবুল আহমাদ আন-নাসির লি-দ্বীনিল্লাহ (১১৮০-১২২৫ খ্রি.) খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলে সুলতানগণ তার আনুগত্য ঘোষণা করেন। আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে কঠোর, শক্তিশালী, বাগ্মী, স্পষ্টভাষী, চরিত্রবান, ঝানু রাজনীতিবিদ এবং সাহিত্যজগতের অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এ কারণে তাকে আক্রমণ করার ধৃষ্টতা কেউ দেখায়নি। কোনো বিরোধী চক্র মাথা তুলার সাথে সাথেই তিনি দমন করতেন। তিনি আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ও খেলাফতের পূর্ব গৌরব পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।[৮১]

১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে জেরুজালেমের ফ্রাঙ্কদের একটি দল মুসলমানদের একটি কাফেলাকে আক্রমণ করে বহু মানুষ হত্যা এবং দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করে। জেরুজালেমের রাজা ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানালে সুলতান সালাহ উদ্দীন তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলীর অধীনে একদল সৈন্য ফ্রাঙ্কদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য গ্যালিলি উইসাগরের দিকে প্রেরণ করেন এবং সুলতান নিজেও দ্রুত একদল সৈন্য নিয়ে পুত্রকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বের হন। ফ্রাঙ্কগণ এ সংবাদ শুনে তাদের সৈন্যদের একত্রিত করে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন। ২ জুলাই, বৃহস্পতিবার, ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে 'হিট্রিন' পর্বতের পাদদেশে উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হয়। ৩ জুলাই শুক্রবার, ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধে ফ্রাঙ্কগণ শোচনীয় পরাজয়ে পর্যবসিত হয়; প্রায় দশ সহস্র ক্রুসেড যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় এবং অসংখ্য যোদ্ধা বন্দি হয়। জেরুজালেমের

---

৭৯. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 342

৮০. আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮১-৬৮৪

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৬-৬৮৯

পতনে সমগ্র খ্রিস্টান জগতে ভয়াবহ উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং ধর্মযাজকগণ জনসাধরণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করতে থাকে; ফলে তৃতীয় ক্রুসেডের সুত্রপাত হয়। ১৪ সেপ্টেম্বর, ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সালাহউদ্দিন ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র ক্রুসেড যোদ্ধাদের আক্রমণ করেন। অবশেষে ২ সেপ্টেম্বর, ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সালাহ উদ্দীন ও ইংল্যান্ডের রাজা অ্যাসকালনের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তৃতীয় ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে। সুলতানের মৃত্যুর মাত্র দু'বছর পরে পোপ তৃতীয় সেলেস্টাইন এর উস্কানিতে চতুর্থ ক্রুসেড (১১৯৫-১১৯৮ খ্রি) শুরু হলে সুলতান সালাহ উদ্দীনের পুত্রদের প্রতিরোধের মুখে ক্রুসেড যোদ্ধরা তিন বছরের জন্য শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। তিন বছর পরে তৃতীয় ইনোসেন্ট তার বিলাসিতা ও লালসা চরিতার্থ করার জন্য পঞ্চম ক্রুসেড (১২০০ খ্রি.) এবং এরপর ষষ্ঠ ক্রুসেড (১২১৬-১২১৭ খ্রি.) ঘোষণা করে। কিন্তু মুসলিম সৈন্যদের লাগাতার আক্রমণের কারণে উভয়ের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়।[৮২]

খলিফা আন-নাসির লি-দ্বীনিল্লাহ (১১৮০-১২২৫ খ্রি.)-এর পরলোকগমনের পর তার পুত্র আবু নাসর মুহাম্মাদ আজ-জাহির বি-আমরিল্লাহ (১২২৫-১২২৬ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ মনোযোগী হন। কিন্তু মাত্র সাড়ে নয় মাসকাল খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র আবু জাফার আল-মুনতাসির বিল্লাহ (১২২৬-১২৪২ খ্রি) সিংহাসনে আরোহণ করে খেলাফতের ক্ষমতা ও গৌরব অক্ষুণ্ন রাখেন। পিতার মতই তিনি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলা বিধানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তুর্কী ও তাতারীরা বিভিন্ন প্রদেশ ও জনপদে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাতারীদের হামলায় মাওরাউন নাহর থেকে ভূমধ্য সাগর ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এলাকাসমূহ তছনছ হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও ইরাক ও বাগদাদে খলিফার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৮৩]

আবু জাফার আল-মুনতাসির বিল্লাহ (১২২৬-১২৪২ খ্রি) মৃত্যুবরণ করলে তার সুযোগ্য ভাই খাফাজীকে সিংহাসনে না বসিয়ে খলিফার পুত্র আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ আল-মুসতাসিম বিল্লাহ (১২৪২-১২৫৮ খ্রি.)-কে খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল, চঞ্চল ও আমোদপ্রিয়। তার মধ্যে সাহস ও দূরদর্শিতার অভাব ছিল। তার রাজত্বকালে দেশে গোলযোগ, বিশৃংঙ্খলা ও

---

৮২. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* pp. 359-379 and 341

৮৩. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০-৫৩১

বিপর্যয়ের কাহিনীতে পূর্ণ ছিল। হানাফী-হাম্বলী দ্বন্দ্ব, শিয়া-সুন্নি সংঘাত, ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের সাথে নিচুশ্রেণীর লোকদের কলহ খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহ (১২৪২-১২৫৮ খ্রি.)-এর জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। পিতার সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে তিনি তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ করার নির্দেশনা দেওয়ার ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে এক দাঙ্গার সৃষ্টি হলে তিনি তার পুত্র আবু বকর এবং তার সচিবকে 'কার্খ' শহরতলী ধ্বংস করে শিয়াদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করার নির্দেশ দেন।[৮৪]

খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহ (১২৪২-১২৫৮ খ্রি.) রাফিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত শিয়াপন্থী মুহাম্মাদ বিন আলকামীকে উজির নিয়োগ করেছিলেন। উজির আলকামী সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নিয়ে খলিফাকে একেবারে হাতের পুতুল বানিয়ে ফেলেন। প্রতিটি ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য দিয়ে শিয়াদেরকে অগ্রসর করার চেষ্টায় মেতে উঠেন এবং সুকৌশলে আব্বাসীদের নাম-নিশানা মুছে ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকেন। সে গোপনে তাতারদের সাথে মিলিত হয়ে আব্বাসীয় রাজত্বের মূলোৎপাটনের সহায়ক হিসেবে কাজ করতেন। আব্বাসীয়দের গোপন তথ্য সে তাতারদের কাছে পৌঁছে দিতেন এবং তাদের কোনো গুপ্ত সংবাদ বাগদাদে এসে পৌঁছালে তিনি তা গোপন রাখতেন।[৮৫] ফলে খলিফা শিয়াদের দমন করার নির্দেশ দিলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খানের নিকট এ মর্মে পত্র লিখেন "আমি অতি সহজেই যুদ্ধ ও রক্তপাত ছাড়াই বাগদাদ এবং ইরাকে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারি। আপনি অবশ্যই সসৈন্যে এদিকে আক্রমণ করুন।"[৮৬]

উজির আলকামী খলিফার সমীপে উপস্থিত হয়ে রাজস্ব আয়ের স্বল্পতা এবং সামরিক বাহিনীর লোকদের বেতন-ভাতা বেশি হওয়ার অনুযোগ করে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাব পেশ করলে খলিফা তা মেনে নেন। সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়োজিত করার কথা বলে আলকামী সামরিক বাহিনীর অনেক বিভাগকে ছাঁটাই করে হালাকু খানের কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে পত্র লিখেন। বাগদাদ আক্রমণে খলিফাকে প্ররোচিত করার জন্য তিনি আরেকটি পত্র লিখেন হালাকু খানের উজির কট্টরপন্থী শিয়া নাসিরুদ্দীন তুসীর কাছে। হালাকু খান অত্যন্ত প্রসন্ন মনে দূতকে অভয়পত্র লিখে দিলে

---

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২; Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene*, pp. 359-379 and 395-396
৮৫. আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৮
৮৬. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩

আলকামী এ মর্মে আরেকটি পত্র প্রেরণ করেন যে, আমি বাগদাদ সৈন্যশূন্য করেছি এবং যুদ্ধাস্ত্রসমূহ বাইরে সরিয়ে দিয়েছি। এর চাইতে বড় গ্যারান্টি আপনি আর কী চান?[৮৭]

উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হালাকু খান খলিফাকে এক পত্রের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু আব্বাসীয় খলিফা নিস্পৃহ সভাসদের পরামর্শে নিজের ক্ষমতা ও শক্তি এবং হালাকু খানের শক্তির কথা চিন্তা না করেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ জবাব দেন এবং বিশৃঙ্খল জনতা মোঙ্গলদেরকে অপমান করেন। ১০ জানুয়ারি, ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান ক্রোধান্বিত হয়ে প্রায় দু'লাখ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আব্বাসীয়দের রাজধানী বাগদাদের দিকে অগ্রসর হন। এ সংবাদ শুনে খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহ (১২৪২-১২৫৮ খ্রি.) সেনাপতি ফাতহুদ্দীন দাউদকে দশ হাজার আইবেক অশ্বারোহী মুজাহিদসহ মোঙ্গলদের মোকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। ১০ মুহার্‌রম ৬৫৬ হি./১৭ জানুয়ারি, ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে খলিফার সৈন্যবাহিনী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কিছুটা রুখে দাঁড়ানো চেষ্টা করে কিন্তু নিজেদের মতানৈক্যের ফলে ব্যর্থ হয়ে নগরাভ্যান্তরে আশ্রয় নেয়। মোঙ্গলীয়রা এবার বাগদাদ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা নগরের বহির্ভাগের সমস্ত উঁচু স্থানে এবং যেসব দুর্গ ও প্রাসাদ নগরের উচ্চে অবস্থিত ছিল সেগুলোর ওপর নিক্ষেপণ অস্ত্রও স্থাপন করে। প্রস্তরখণ্ড ও অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করে বাগদাদের বহির্দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং অট্টালিকাগুলোতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।[৮৮]

১৫ মুহার্‌রম ৬৫৬ হি./২২ জানুয়ারি, ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান নিজে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করে। চল্লিশ দিন অবরোধ চলার পর উজির মুহাম্মাদ বিন আলকামী খলিফাকে তাতারীদের সাথে সন্ধি করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, আপনার সৈন্যদের অনেকেই তাতারীদের সাথে মিলিত হয়েছে। আমি তাদের সাথে লোক মাধ্যমে আলোচনা করছি। এ কথা বলে বিশ্বাসঘাতক উজির তাদের কাছে গিয়ে তার নিজের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করে খলিফার নিকট ফিরে এসে বলল:[৮৯]

إن الملك قد رغب في أن يزوج ابنته بابنك الأمير أبي بكر، ويبقيك في منصب الخلافة ، كما أبقي صاحب الروم في سلطنته ، ولا يؤثر إلا أن تكون الطاعة له كما كان أجداك مع السلاطين

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩

৮৮. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* pp. 359-379 and 395-396-397

৮৯. আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৬

السلجوقية ، وينصرف عنك بجيوشه ، فيجيب مولانا إلي هذا ، فإن فيه حقن دماء المسلمين ، ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما تريد ، والرأي أن تخرج إليه في جمع من الأعيان ، فأنزل في خيمة.

"বাদশাহ (তাতারদের) স্বীয় কন্যাকে আপনার পুত্র আমির আবু বকরের সাথে বিয়ে দিতে চায় এবং তার ইচ্ছা আপনিই খেলাফতে অধিষ্ঠিত থাকেন। সালজুকদের মত নায়িবে সুলতানের পদ নিয়ে তারা ফিরে যেতে চায়। আমার মতে তাদের সন্তুষ্ট করা ছাড়া মুসলমানদের রক্তপাত এড়ানোর অন্য কোন পথ ও পন্থা নেই। এরপরও আপনার ইখতিয়ার রয়েছে আপনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তবে আমার মতে হালাকু খানের কাছে যাওয়া এখনই উপযুক্ত সময়।"

খলিফা তার ভাই, দুই পুত্র ও সভাসদবর্গসহ প্রায় তিন হাজার লোক নিয়ে মোঙ্গল শিবিরে যান। কেবল খলিফা, তার ভাই ও দুই পুত্র এবং তাদের অনুচরবর্গের তিনজনকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। বর্বর নেতা মিষ্টি-মধুর বাণী ও অতীব বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনার আড়ালে নিজের দুরভিসন্ধি গোপন করে খলিফাকে অনুরোধ করেন যেন নগরীর সশস্ত্র সৈন্যরা অস্ত্র ত্যাগ করে একটি আদম শুমারীর জন্য তোরণদ্বারসমূহে একত্রিত হন। খলিফার আদেশে সৈন্যরা নিরস্ত্র অবস্থায় দলে দলে নগর থেকে বের হয়ে আসলে তাদেরকে দ্রুত বন্দি করা হয়। পরদিন সূর্যোদয়ের সময় হালাকু খান নগরী লুণ্ঠন ও সেখানকার অধিবাসীদের হত্যার আদেশ দেন। তাতারীদের তরবারিগুলো খাপমুক্ত হয়ে ঝলসে উঠে, সৃষ্টি হয় রক্তের সাগর। চল্লিশ দিন ধরে চলে ভয়াবহ লুণ্ঠন, হত্যা ও মানবতার অবমাননা। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণ পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাদের পদদলিত করে হত্যা করা হয়। ছয় সপ্তাহ ব্যাপী প্রায় ষোল লক্ষ লোক হত্যাকাণ্ডের কারণে বাগদাদের রাস্তাগুলোতে রক্তস্রোত বয়ে যায়। বহু মাইল পর্যন্ত তার গতিপথে টাইগ্রিস নদীর পানি লাল রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠে। আব্বাসীয় খলিফাদের অতি যত্নে ও পরিশ্রমে সংগৃহীত শিল্প ও সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ বইগুলোকে আগুনে নিক্ষেপ ও টাইগ্রিস নদীর পানিতে নিমজ্জিত করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধ্বংস করা হয়; নিঃশেষ হয়ে যায় পুরাতন পারস্য সভ্যতার নিদর্শনগুলো। টাইগ্রিস নদীতে যেন একটি বাঁধের সৃষ্টি হল যা নদীর পানিকে ধীরগতিতে বয়ে নিয়ে গেল। যে পানি ইতোপূর্বে মনুষ্য রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল এবার গ্রন্থাদির কালো কালির রঙে তা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো। এভাবে মানবজাতির পাঁচ শতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদ বিলুপ্ত হয় এবং মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা সম্পূর্ণরূপে নির্মুল হয়। ভাগ্যবিড়ম্বিত অসহায় খলিফা আল-মুসতাসিম বিল্লাহ (১২৪২-১২৫৮ খ্রি.) ও তার পুত্রদ্বয়সহ পরিবারের অন্যান্য

সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। আব্বাসীয়দের যারা কূপ অথবা অজ্ঞাত স্থানে লুকিয়ে ছিল কেবল তারাই ধ্বংসের কবল থেকে প্রাণে রক্ষা পায়। জ্ঞানের আবাসস্থল, সংস্কৃতির অধিষ্ঠানক্ষেত্র, আরব দুনিয়ার চক্ষু ও কেন্দ্রভূমি বাগদাদ চিরতরে ধ্বংস হয়।[৯০]

এভাবে প্রাচ্যের ঐশ্বর্যপুরী এবং মুসলিম সভ্যতার ধারক ও বাহক এবং বাগদাদ নগরী কয়েকদিনের মধ্যেই ধ্বংসপুরীতে পরিণত হয়। মানবজাতি এক নিমিষে হারালো দীর্ঘ ৫০৮ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বছরের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার। একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হলো; অবসান ঘটলো আব্বাসীয় খেলাফতের। তিল তিল করে বেড়ে ওঠা মুসলিম স্বর্ণযুগের সভ্যতার যবণিকার ফলে বিশ্বসভ্যতা বহুকাল পিছিয়ে পড়লো।

---

৯০. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৩-৫৩৪; আস-সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৬; Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene,* p. 359-379 and 395-397-398

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগের সামাজিক অবস্থা

মিশর, সিরিয়া, মরক্কো, আরব উপদ্বীপ, ইরাক, পারস্য ও এশিয়া মাইনরের বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গঠিত সমকালীন ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোতে বহু জাতির মিশ্র অধিবাস ছিল। এ জাতিবর্গ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রসহ ইসলামী সাম্রাজ্যে একিভূত হয়ে একটি বৃহৎ ও একক জাতিসত্তা সৃষ্টি করেছিল। তবে এ একক জাতি সত্তার মাঝেও প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য; যার জন্য তারা সুপরিচিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আরবদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল কাব্য প্রতিভা। এ প্রসঙ্গে আহমদ আবু দাউদ (জ. ২০২ হি./৮১৭ খ্রি.) উল্লেখ করেন-[৯১]

ليس أحد من العرب إلا وهو يقدر على قول الشعر، طبعا ركب فيهم، قل أو كثر. অর্থাৎ "এমন কোনো আরবও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে অল্প অথবা বিস্তর কাব্যগুণের অধিকারী নয়। কেননা এটা তাদের স্বভাব জাত।"

জাতিভেদে ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক দর্শন, সংস্কার ও রীতি-নীতি যেমন আলাদা তেমনি প্রত্যেক জাতির সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও রয়েছে স্বতন্ত্র স্বত্তা ও ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। পারস্য সাহিত্যে রয়েছে আরবদের জাতীয় চরিত্র, সামাজিক জীবনধারা ও ইতিহাস ঐতিহ্যের সুগভীর সম্পর্ক্য। ইরাকিরা তাদের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপাদান নিয়েছে শাসকগোষ্ঠীর সংস্পর্শ থেকে। গ্রীক, রোমান, মিশরীয় ও ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিরও রয়েছে আলাদা সত্তা ও স্বতন্ত্র পরিচিতি। আলোচিত এসকল বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র নিয়েই গঠিত হয়েছিল প্রথম আব্বাসীয় যুগের বৃহৎ ইসলামী সাম্রাজ্য। সুবিস্তৃত এ সাম্রাজ্যেও ঘটেছিল বৈচিত্রপূর্ণ 'রক্ত মিশ্রণ' (Blood Mixing)। ইসলামী বিজয়াভিযানের ফলস্বরূপ মিশ্রবিবাহ একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে পরবর্তী প্রজন্মের ধমনীতে প্রবাহিত দু'টি ভিন্ন রক্তধারার সংখ্যাধিক্য ছিল লক্ষ্যণীয়।[৯২]

আব্বাসী যুগে প্রাচীন আরব সমাজের উপজাতি প্রথা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। খলিফাগণ তাদের সিংহাসনে বসানোর উপযোগী উত্তরাধিকারীর জন্য বিদেশী উপাদানের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এ

---

৯১. ড. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এমনকি খলিফাগণ তাঁদের স্ত্রী এবং সন্তানের মাতা নির্বাচন করার সময়ও আরব রক্তকে কোনো মর্যাদাই দেননি। আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে মাত্র তিনজন খলিফা আবুল-আব্বাস, খলিফা আল-মাহদী এবং খলিফা আল-আমীন ছিলেন স্বাধীন আরব রমনীর গর্ভজাত সন্তান। এদের মধ্যে আবার খলিফা আল-আমীন-এর বাবা ও মা দু'জনেই ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের লোক। আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে আল-মানসুর-এর মাতা ছিলেন বার্বার উপজাতীয় ক্রীতদাসী, আল-মামুন-এর মাতা ছিলেন পারস্য দেশীয় ক্রীতদাসী। আল-ওয়াসিক বিল্লাহ (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) এবং আল-মুহতাদী বিল্লাহ (৮৬৯-৮৭০ খ্রি.)-এর মাতা ছিলেন গ্রীক দেশীয় ক্রীতদাসী, আল-মু'তাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)-এর মাতাও ছিলেন ক্রীতদাসী। আল-মুতাওক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)-এর মাতা ছিলেন খারযুমিয়্যাহ নামক ক্রীতদাসী, আল-মুস্তাইন বিল্লাহ (৮৬২-৮৬৬ খ্রি.)-এর মাতা ছিলেন স্লাভজাতীয়, আল-মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ (৯০২-৯০৮ খ্রি.)-এর মাতা ছিলেন হিসফ নামক তুর্কী ক্রীতদাসী এবং আল-মুকতাদির (৯০৮-৯৩২ খ্রি)-এর মাতা ছিলেন তুর্কী ক্রীতদাসী। খলিফা হারুন অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)-এর মাতা ছিলেন খায়জুরান নামক আরেক বিদেশী ক্রীতদাসী। তিনিই হলেন প্রথম মহিলা যিনি আব্বাসীয় সাম্রাজ্য চালানোর ব্যাপারে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[৯৩]

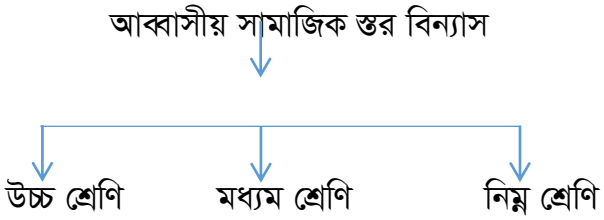
কেবল খলিফাগণই নন; বরং তৎকালীন আরব মুসলিমগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বংশকৌলীন্য ভুলে যান। আরবীয় শাসকদের সঙ্গে প্রজাদের সংমিশ্রণ ঘটানোর পিছনে উপপত্নী প্রথা এবং ক্রীতদাসত্ব সক্রিয় ভূমিকা রাখে। প্রকৃত আরবীয় শক্তি পিছিয়ে পড়লে সামনে চলে আসে অনারব ক্রীতদাসের সন্তানরা। ফলে শাসনকার্যে প্রথমে পারস্যবাসী এবং পরে তুর্কীবাসীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত আব্বাসীয় খেলাফতে অনারব অনুপ্রবেশের মৌল ভিত্তি তৈরি হয়েছিল উমাইয়্যা শাসনামলে। কেননা উমাইয়্যা খলিফাগণ অনারবদের পরিপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা প্রদান করতেন না। ফলে অধিকার বঞ্চিত গোষ্ঠী উমাইয়্যা খেলাফত পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংগত কারণেই আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মূল আরব ভূখণ্ড থেকে পরিচালিত না হয়ে পারস্য

---

৯৩. ড. আহমাদ আমীন, *যুহরুল ইসলাম* (কায়রো: মাতবায়া'তুল লাজনা আত-তালিফু ওয়াত তারজামাহ ওয়ান নাসরু, ১৩৬৫ হি./১৯৪৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৫; Philip K Hitti, *History of the Arabs* (London and Basingstoke: Macmillan Publishers Ltd. 1970), Adi. 10th, p. 332; মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

এবং খোরাসান থেকে পরিচালিত হয়।[৯৪] বাহ্যিকভাবে খেলাফতের নিয়ন্ত্রণভার আব্বাসীয়দের হাতে থাকলেও আন্দোলনের ফসল চলে যায় অনারবদের নিয়ন্ত্রণে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অনারবদের আসীন হওয়া তারই বাস্তবতা প্রমাণ করে। আব্বাসীয় খলিফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে উন্নতি সাধন করলেও অধিকাংশ খলিফা রাজ্য বিজয়সহ প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হননি। এতে আব্বাসীয় খেলাফতের প্রারম্ভেই পারসিকদের এবং পরবর্তীতে খলিফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)-এর সময় ৮৪২ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৫]

দুর্ভাগ্যবশত আরব ঐতিহাসিকরা খলিফাদের জীবনযাপন এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে অত্যুৎসাহী ছিলেন। ফলে সেসময়ের সাধারণ প্রথা, সামাজিক জীবন এবং অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তবে তাঁদের লেখাতেই টুকরো টুকরো মন্তব্য থেকে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এর মূল উৎস কিন্তু তৎকালীন সাহিত্য। সেইসব তথ্যের সঙ্গে বর্তমান কালের রক্ষণশীল মুসলমানদের সার্বিক জীবনযাপনের কথা তুলনা করলে মোটামুটি একটা চিত্র পাওয়া যায়।[৯৬] আব্বাসী যুগের সামাজিক স্তর ছিল নিম্নরুপ-



আব্বাসীয় যুগে উচ্চ শ্রেণিভুক্ত ছিল খলিফা, উজির-ই-আযম, উজির এবং ধনবান ব্যক্তিবর্গ। এ যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠে; যারা সমাজের চালিকাশক্তি ছিল। তবে এ মধ্যবিত্ত শ্রেণি ততটা শক্তিশালী ছিল না। আর সমাজের নিম্ন শ্রেণির মধ্যে ছিল গল্পকার, জ্যোতির্বিদ, জাদুকর, দরবেশ, মুসাফির এবং ভিক্ষুক।[৯৭]

---

৯৪. ড. শাওকি দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবি*, *আল-আসরুল আব্বাসী আস-সানি* (কায়রো: দারুল মা'য়ারিফ, ১৯৭৩ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ০৯

৯৫. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, p. 332; জুরজি যায়দান, *তারিখুত তামাদ্দুনিল ইসলাম* (মিশর: দারুল হিলাল, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ৯৪

৯৬. ibid,p. 333

৯৭. মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস* (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

আব্বাসীয় শাসনামলে জনগণের আর্থিক অবস্থা বিচারে তাদেরকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। অভিজাত শ্রেণি এবং সাধারণ শ্রেণি। অভিজাত শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত ছিলেন স্বয়ং খলিফা, রাজপরিবারের সদস্য এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকতা-কমচারীবৃন্দ। সমাজের অভিজাত শ্রেণি সাধারণত আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। এদের বেশ-ভূষা, সাজ-সজ্জা, আসবাবপত্র, খানা-পিনা ও চলা-ফেরা প্রভৃতিতে উমাইয়্যা শাসনামল থেকে স্বাতন্ত্র্য আভিজাত্য লক্ষণীয়। তাদের আচরণও ছিল নম্র প্রকৃতির। প্রাথমিক আব্বাসীয় যুগে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এবং নিম্নশ্রেণিতে বসবাসরত অমুসলিমদের সিংহভাগ ছিল জরথুস্ত্র এবং অল্পসংখ্যক ছিল খ্রিস্টান ও ইয়াহুদি।[৯৮] জাতির বৃহত্তর অংশই ছিল সাধারণ শ্রেণিভূক্ত। সাধারণ শ্রেণির জনগণ আবার পেশা ও অবস্থানের দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যেমন আলীম, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, কৃষক, দাস-দাসী এবং সাধারণ প্রজা; যাদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না।[৯৯] আব্বাসীয় খেলাফতের আলীম সমাজ আবার দু'শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণির আলীমগণ আমীর-উমারার সাহচর্যে থাকতেন এবং তারা কাজীসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করতেন। তারা সমাজে অর্থনৈতিক দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। তাদের অনেকেই খলিফা ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের অনুরোধে বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থাবলি প্রণয়নে নিজেদের মশগুল রাখতেন। অপর শ্রেণির আলীমগণ রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুদায়িত্বে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত না করে জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি তাদেরকে রাষ্ট্রীয় চাকুরীতে যোগদানের প্রস্তাব দেওয়া হলেও তাঁরা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। দুনিয়াবী সম্মান কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি না ঝুঁকে তারা জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।[১০০]

আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম দিকে নারীসমাজ উমাইয়্যা যুগের নারীদের মতোই স্বাধীনতা ভোগ করত। কিন্তু দশম খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বুইয়াদের আমলে নারী-পুরুষের মেলা-মেশা কঠোরভাবে বন্ধ করা হয়। প্রশাসনে তাদের দাপট ছিল সর্বজনবিদিত। প্রথম যুগে শুধু রাজপরিবারের আল-খায়জুরান, খলিফা আল-মাহদীর কন্যা উলাইয়া, খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী ও খলিফা আল-আমীনের মাতা

---

৯৮. Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt*, p. 89

৯৯. আহমাদ আমীন, *জহরুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, খ. ১ম, পৃ. ১১৪; Philip K Hitti, *History of the Arabs*, p. 334

১০০. আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন জারির আত-তাবারানী, *তাহজিবুল আসার* (মক্কা: আস-সাফা, ১৪০২ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ভূমিকাংশ, পৃ. দাল-জাল

জুবাইদাহ এবং খলিফা আল-মামুনের স্ত্রী বুরান প্রমুখ নারীই যে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন শুধু তা-ই নয়, আরবের অনেক সাধারণ নারীও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং পুরুষদের সাথে কবিতা ও সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করে খ্যাতি অর্জন করেন।[১০১]

খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনামলে আরব নারীরা অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধে যেতেন এবং সৈন্যদের নেতৃত্ব দিতেন। খলিফা মুকতাদির বিল্লাহর মা সর্বোচ্চ আপীল আদালতের সভাপতিত্ব করতেন, দরখাস্তকারীদের আবেদন শুনতেন এবং সভাসদ ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সাথে মতবিনিময় করতেন। সুসভ্য ও পদমর্যাদাসম্পন্ন মহিলাদের গৃহে মিলনোৎসব ও আলোচনা সভার অধিবেশন খলিফা মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহর আমল পর্যন্ত অব্যহত ছিল। খলিফা হারুন-অর-রশিদ ও খলিফা আল-মামুনের আমলে মহিলাগণ পুরুষদের সাথে সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিযোগিতায় নিজস্ব মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন। তারা কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং তাদের সৌন্দর্য ও গুণাবলি দ্বারা সভা সমিতির প্রাণসঞ্চার করতেন। সম্রাজ্ঞী জুবাইদা প্রতিভাবান রমণী ও গুণসম্পন্না কবি ছিলেন। তিনি প্রায়ই খলিফা হারুন-অর-রশিদকে কবিতার ছন্দে চিঠি লিখতেন। তাঁর পুত্র আল-আমীনের মৃত্যুর পর তিনি আল-মামুনকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে উচ্চস্তরের প্রতিভা ও অনুভূতি প্রতিভাত হয়। সেসময়ে উচ্চস্তরের অধিকাংশ নারী ও পুরুষ উভয়েই সঙ্গীত চর্চা করতেন। ধর্মপ্রাণ শাহজাদী উলাইয়াহ ছিলেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের অন্যতম। তাঁর ভাই ইব্রাহীমও ছিলেন সমান প্রতিভাধর। খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) স্বয়ং গীতিকার ও গায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। শাহজাদী ও অভিজাত শ্রেণির মহিলাগণ প্রায়ই স্বান্ধ্যকালীন বিশেষ আসর বসাতেন। শতাধিক সঙ্গীতকারের সম্মিলিত কণ্ঠে এ সঙ্গীত পরিবেশিত হতো এবং একজন পরিচালক ষষ্ঠির সাহায্যে তাল বাজাতেন।[১০২]

আব্বাসীয় সমাজের গঠনপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সমাজের সর্বোচ্চস্তরে ছিলেন খলিফা, তাঁর পরিবারবর্গ, রাজকর্মচারী, হাশেমী বংশের লোক এবং সর্বনিম্নস্তরে ছিল দাস-দাসী। ভৃত্যরা সাধারণত অমুসলিম সম্প্রদায় থেকে এবং যুদ্ধের সময় বন্দিদের মধ্য থেকে সংগৃহীত হতো। এদের মধ্যে নিগ্রো, তুর্কী, এবং শ্বেতবর্ণের ভৃত্য ছিল। শ্বেতবর্ণের ভৃত্যদের মধ্যে গ্রীক, স্লাভ, আর্মেনীয়

---

১০১. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, p. 333; মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৯ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৮৯

১০২. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracene*, p. 457

এবং বার্বারই ছিল প্রধান। আব্বাসীয় সমাজের এক শ্রেণির মানুষ পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল ক্রীতদাস ব্যবসাকে। তারা ক্রীতদাস আমদানী করত তুর্কিস্তান, মধ্য আফ্রিকা, ইরান, স্পেন, ফ্রান্স এবং গ্রীসের বিস্তৃত ভূখণ্ড থেকে। এসব দাস-দাসীরা বাজার হয়ে খলিফা, উজির ও বিত্তবানদের ঘরে স্থান লাভে সক্ষম হতো। 'গিলমান' নামে কথিত সুশ্রী ভৃত্যরা প্রভুদের আনন্দ বিনোদনের জন্য আকর্ষণীয় পোশাক ও সুগন্ধি ব্যবহার করত। দাসীদের অনেকেই গায়িকা ও উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করত। অনেক দাসী খলিফার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদে তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। এমনকি খলিফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) তাঁর 'জাদুল-খাল' নামক এক দাসীর অনুরোধে তার স্বামীকে পারস্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।[১০৩] খলিফা হারুন-অর-রশীদের দরবারে ১,০০,০০০ দিনারে ক্রয়কৃত 'তাউয়াদুদ' নামে একজন বিদুষী দাসী ছিলেন যিনি আইনশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, সঙ্গীতবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাসশাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেই পারদর্শী ছিলেন।[১০৪]

আব্বাসীয় সমাজে পোশাক ও আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও পারসিক রীতি অনুপ্রবেশ করে। খলিফাগণ উন্নত ও আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান করতেন। বিশেষত তাঁরা জানুর নিচ পর্যন্ত জুব্বা পরিধান করতেন, মণি-মুক্তা খচিত কোমরবন্ধ কোমরে বেধে কাঁধের ওপর মূল্যবান চাদর জড়িয়ে এবং চোখা মাথা বিশিষ্ট টুপি পরিধান করে থাকতেন। খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) পারসিকদের রীতি অনুযায়ী এ টুপি পরিধান করার প্রথা চালু করেন। দেহরক্ষীরা কারুকার্য খচিত পোশাক পরে খোলা তরবারি হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় খলিফার প্রহরায় নিয়োজিত থাকতো। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও যুবরাজগণ সিংহাসনের ডানে-বামে সারিবদ্ধ অবস্থায় থাকতেন। খলিফা পর্দার অন্তরালে থাকতেন পর্দা উত্তোলিত হলে নির্দিষ্ট ব্যক্তিগণ খলিফাকে অভিবাদন প্রদান করে আসন গ্রহণ করতেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ বংশ ও পদমর্যাদানুযায়ী সিংহাসনের উভয় পাশে দু'সারিতে উপবিষ্ট থাকতেন। ।[১০৫]

উমাইয়্যা আমলের ন্যায় ভ্রমণ, অশ্বারোহণ বা সামরিক কুচকাওয়াজের সময় লোকেরা গৃহাভ্যন্তরে পরিহিত পোশাক থেকে ভিন্ন ধরণের পোশাক পরিধান করত। রাতের পোশাককে বলা হতো 'কুমাশুন

---

১০৩. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

১০৪. মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

১০৫. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, p. 333; ড. মফিজুল্লাহ কবীর, *ইসলাম ও খিলাফাত* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৩২৪-৩২৫

নাওম'। লুঙ্গি, শার্ট, ফতুয়া ও একটি লম্বা জ্যাকেট যা ফিতা বা কোমরবন্ধ দ্বারা কোমরের সাথে বাধা থাকত, সেইসঙ্গে কাঁধের ওপর থাকত 'রিদা' নামক চাদর-যা জনসাধারণের সচরাচর ব্যবহারের পোশাক ছিল। পুরুষরা বুট ও জুতা উভয়ই ব্যবহার করত, তবে বিশেষভাবে সৈন্যদের মধ্যে বুট জুতার প্রচলন ছিল বেশি। কখনো কখনো একই সঙ্গে এক জোড়ার ওপর আরেক জোড়া জুতা পরা হতো।[১০৬]

উমাইয়্যাদের সময় থেকেই নারীদের পোশাকে বেশ কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। নারিরা পশমী পোশাক এবং চামড়ার মোজা ও জুতা ব্যবহার করতেন। উচ্চ শ্রেণির বা ধনাঢ্য মহিলাগণ মস্তকাবরণী হিসেবে মণি-মুক্তা খচিত গম্বুজাকার শিরস্ত্রাণ পরিধান করতেন। এ শিরস্ত্রাণের নিম্নভাগে মণি, হীরা ও স্বর্ণ বসানো একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকার মালা থাকত। প্রাচীন অক্ষর খোদিত এক ধরণের মাদুলী টুপির বহির বেষ্টনী থেকে ঝুলানো অবস্থায় প্রায়ই পরিধান করা হতো। মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীগণ সাধারণত মুক্তা ও পান্না খচিত ফিতার ন্যায় এক ধরণের চ্যাপ্টা স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা মস্তক সজ্জিত করত। এসময় কৃত্রিম সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপায়ও অজানা ছিল না। গণ্ডদেশ ও ওষ্ঠ রঞ্জিত করার কৌশল প্রত্যক্ষভাবে পারসিকদের নিকট হতে গৃহীত হয়েছিল; কারণ তাদের মধ্যে এ প্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়, তবে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গণ্ডদেশ ও ওষ্ঠে কৃত্রিম ফোঁটা দেওয়ার পদ্ধতি আরবদের মধ্যে বরাবরই প্রচলিত ছিল। সুন্দরী হিসেবে বিবেচিত হতে হলে আরর কুমারীকে দীর্ঘাকৃতি, ক্ষীণকায়া, সুঠাম, সুশ্রী এবং বৃহৎ, টানা ও কালো চক্ষুবিশিষ্ট হতে হতো।[১০৭]

খলিফা হারুন-অর-রশিদের সৎবোন উলাইয়া মেয়েদের মাথায় পরার এক বিশেষ টুপির প্রচলন করেন, যা দেখতে কিছুটা গম্বুজের মতো ছিল। এছাড়া মেয়েরা খালখাল (নুপুর) এবং আসাবির (ব্রেসলেট) পরতেন। বাজুবন্ধ এবং মল ছিল নারীর সাধারণ অলঙ্কার। অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত লোকদের পোশাক খলিফার অনুকরণে তৈরি হতো; তবে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ও আইনবিদরা পাগড়ী পরিধান করে তার ওপর নবী (স.)-এর অনুকরণে 'তায়লাসান' নামক একটি রুমাল ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ পুরুষই পশমের

---

১০৬. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens,* p. 453-454

১০৭. Philip K Hitti, *History of the Arabs,* p. 334; মফিজুল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ১০৭

তৈরী কালো রঙের 'কালানসুয়া' নামক চূড়াওলা টুপি পরতেন। খলিফা হারুন-অর-রশিদের আমলের প্রধান কাজী ইউসুফের নির্দেশে ধর্মপ্রচারকগণ কালো পাগড়ি পরিধান করতেন।[১০৮]

আব্বাসী যুগে যে আসবাব-পত্রের প্রচলন খুব বেশি ছিল তা হল সোফা বা নীরান। যেকোন ঘরের তিন দিকে তিনটা সোফা থাকত। পূর্বতন রাজবংশের আমলে একধরণের আরামদায়ক চেয়ার ব্যবহার করা হতো যার বসার আসনগুলো ছিল উঁচু। সুসজ্জিত সোফার সামনে ছোট টেবিল রেখে তার ওপর পিতল বা রূপার তৈরী বড় বড় গোল ট্রেতে খাবার দেওয়া হতো। টেবিলগুলো সাধারণত আবলুস কাঠ ও কচ্ছপের খোলোস দ্বারা তৈরি হতো। এছাড়া মেঝের ওপর পাতানো চারকোণা গদীর প্রচলন ছিল বেশ জনপ্রিয়। চীনামাটি ও রূপার তৈরী বাসনপত্রও প্রচলিত ছিল। অভিজাত পরিবারসমূহে 'জানজাল' নামে দুই দাঁত বিশিষ্ট একপ্রকার কাটাচামচ ব্যবহারের প্রচলন ছিল। অবস্থাপন্ন লোকদের গৃহে আচ্ছাদিত কাঁচের পাত্রে সাধারণ পানীয় হিসেবে চিনি মিশ্রিত মিষ্টি পানিতে বিভিন্ন ফুলের নির্যাস দ্বারা সুগন্ধ করে শরবত পরিবেশিত হতো।[১০৯] খেজুর বা কিসমিস দ্বারা প্রস্তুত নাবিজ এবং মধু ও পানি মিশ্রিত পানীয়র খুব প্রচলন দেখা যেত। পারসিকদের থেকে আমদানীকৃত নানারকম সুস্বাদু খাবার তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল। ফালুদা নামক মূল্যবান মিষ্টি, বালাম, রুটি ও আস্ত মুরগি ভাঁজা প্রভৃতি খাবার আব্বাসীয় সমাজে প্রচলিত ছিল।[১১০]

বিভিন্ন স্থানে প্রায়ই পানোৎসব, যাকে বলা হতো দ্রাক্ষা-কন্যা (the daughter of the vine) এবং গানের আসরের আয়োজন হতো। এসব আসরে আপ্যায়নকারী ও অতিথিগণ উজ্জ্বল রঙের দামি পোশাক পরিধান করে এবং দাড়িতে গোলাপ-জলের সুগন্ধি ব্যবহার করে আসতেন। সুগন্ধিদ্রব্য পুড়িয়ে কক্ষগুলো সুবাসিত করা হতো। খলিফা আল-মানসুরের আমলে কুফায় এমন এক আসরের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এগুলো ছিল আধুনিক রেঁস্তোরার থেকেও বেশি উন্নত।[১১১]

আব্বাসীয় আমলে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা জন্য হাম্মামখানা বা স্নানাগার এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, শুধু প্রয়োজনবোধেই নয়, এটি আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

---

১০৮. মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫; Philip K Hitti, ibid, pp. 333-335

১০৯. Philip K Hitti, ibid, pp. 335; *Syed Ameer Ali, A Short History of Saracens,* p. 457-458

১১০. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens,* p. 458

১১১. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, p. 338

স্নানাগারগুলোর মধ্যবর্তী কামরার চারপাশের অংশ বিভিন্ন দেয়াল দ্বারা বিভক্ত ছিল। মধ্যবর্তী কামরার উপরিভাগে গম্বুজের নিচে ফাঁক থাকায় বাহির থেকে আলো আসতে পারত। খলিফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ-এর আমলে শুধু বাগদাদেই প্রায় ২৭ হাজার গণস্নানাগার ছিল, পরে তা বেড়ে ৬০ হাজারে দাঁড়ায়। আল-ইয়াকুবীর (মৃ. ৮৯৭ খ্রি.) তথ্যানুযায়ী বাগদান প্রতিষ্ঠার পরে পরেই এরকম গণস্নানাগারের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। আফ্রিকার পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৮ খ্রি.) ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ সফরে আসেন। তিনি বাগদাদে এমন ১৩টি বাড়ির প্রতিটির পশ্চিম দিকে দুটি বা তিনটি করে আধুনিক স্নানাগার দেখেছিলেন। প্রতিটি স্নানাগারে ছিল গরম ও ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা। অধিকাংশ স্নানাগারে একাধিক ঘর ছিল; যেগুলোর মেঝে মোজাইক এবং দেয়াল ছিল মার্বেল পাথরের। স্নানাগারের অন্তস্তলে গম্বুজ বিশিষ্ট একটি বড় ঘর ছিল এবং গম্বুজের মাথায় ছিল চকচকে এমন কিছু পদার্থ যাতে বাইরের আলো ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।[১১২]

আব্বাসীয় যুগে ক্রীড়া-সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রচলন ছিল। এসময় কিছু ঘরোয়া খেলা ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। ধনুর্বিদ্যা এবং পরবর্তীকালে হাত বন্দুকের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ, পোলো (চৌকান), হকি (সুলাজান) বর্শা নিক্ষেপ (জারিন), ঘোড়দৌড়, কুস্তি এবং পদব্রজে ও অশ্বারোহণে অসি সঞ্চালন ছিল বাহিরের খেলাধুলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রাজধানী ও অন্যান্য বড় শহরে সাময়িকভাবে পদাতিক ও অশ্বারোহী বীরব্রতীর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ সংঘটিত হতো। এ যুদ্ধে পরস্পরকে দ্বন্দ্বে আহ্বান জানানো হতো।[১১৩] এছাড়াও প্রাচীনকাল থেকে রাজা-বাদশাহদের মধ্যে যে শিকারযাত্রা প্রচলিত ছিল আব্বাসীয় খলিফাদের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। খলিফা এবং যুবরাজদের বিনোদনের প্রিয় মাধ্যম ছিল এ শিকারযাত্রা। খলিফা আল-আমীন (৮০৯-৮১৩ খ্রি.) সিংহ এবং আল-মু'তাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) চিতা বাঘ শিকার করতে ভালবাসতেন। ছোট হরিণ, খরগোশ, তিতির পাখি, বুনো রাজহঁংসী, পাতিহাঁস ও পাখি শিকার করতে বাজপাখিকে কাজে লাগানো হতো। বড় ধরণের শিকার করতে বাজপাখির পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকেও সহযোগীর ভূমিকায় রাখা হতো।[১১৪]

---

১১২. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০-২৯১

১১৩. *Syed Ameer Ali, Syed Ameer Ali, A Short History of Saracens,* p. 458

১১৪. Philip K Hitti, *History of the Arabs,* pp. 340-341

আব্বাসীয় যুগের সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ছিল সামাজিক পূণর্মিলন ও আলোচনা সভা। উচ্চপদস্থ লোকেদের গৃহে প্রায়ই এ ধরণের সামাজিক পূণর্মিলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এ সভায় বিভিন্ন প্রতিভা ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরস্পর মিলিত হয়ে আলোচনায় যোগ দিতেন। কিন্তু খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর সময় থেকে সাহিত্য সমিতি গড়ে ওঠতে থাকে। এসকল সমিতিতে পণ্ডিত ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে দার্শনিক বিষয়সমূহ আলোচনা করতেন-যা বাগদাদের ধ্বংসকাল পর্যন্ত সগৌরবে বহাল ছিল। তৎকালীন সমাজে পুস্তক বিক্রেতারাও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন এবং সাধারণভাবে তাঁদের দোকানগুলো ছাত্র ও বিদ্বান ব্যক্তিদের নিয়মিত গমনাগমনস্থলে পরিণত হতো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগের প্রশাসনিক অবস্থা

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রাথমিক রূপরেখা প্রণীত হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে তা বিকশিত হয়ে উমাইয়্যা যুগে এ শাসনব্যবস্থা উন্নতি লাভ করে। কালের বিবর্তনে এবং যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনে এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। এ সময়ে মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রতিটি শাখায় ব্যাপক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১১ জামাদিউস-সানি, ১৩২ হি./২৫ জানুয়ারি, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জাব নদীর বাম তীরবর্তী কুশাক নামক পল্লীতে এক ঐতিহাসিক যুদ্ধে উমাইয়্যা বংশের সর্বশেষ খলিফা মারওয়ান (৬২৩-৬৮৩ খ্রি.)-এর শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে উমাইয়্যা যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আব্বাসীয় খেলাফতের সূচনা হয়। আব্বাসীয় খলিফাগণ খেলাফতকে অসাধারণ প্রাণশক্তি দান করেছিলেন। সকল প্রজার মধ্যে জাতীয় ঐক্যের মূলনীতি গৃহীত হওয়ায় প্রাথমিক যুগের আব্বাসীয় খলিফাগণ এমন একটি সাম্রাজ্যসৌধ নির্মাণ করতে সমর্থ হন, যা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পাঁচ শতাব্দীরও অধিক সময় স্থায়ী হয়েছিল। দীর্ঘ এ শাসনামলে খলিফাগণ কেবল পার্থিব রাষ্ট্রনায়কই ছিলেন না; বরং তারা একটি ধর্ম ও প্রজাতন্ত্রের ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন। তারা উমাইয়্যাদের শাসনব্যবস্থায় শুধু সংশোধনই করেননি বরং এতে অনেক মৌলিক নীতিরও সংযোজন-বিয়োজন ঘটান।

আব্বাসীয়গণ মূলত ক্ষমতায় আসেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড দল যথা শিয়া, খারিজী, রক্ষণশীল ধর্মপন্থী, পারস্যবাসী এবং অন্যদের ক্ষোভকে ব্যবহার করে। প্রত্যেক দলের নিকট তারা নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, ফলে প্রত্যেক দল স্ব স্ব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।[১১৫] তাছাড়া উমাইয়্যাদের ধর্মবিমুখতা জনসাধারণের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা থেকে শিক্ষা লাভ করে আব্বাসীয় খলিফাগণ খেলাফতকে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলেন এবং মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। আব্বসীয় খলিফাদের মধ্যে খলিফা হারুন-অর-রশীদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) ও খলিফা আল-মামুন (৮১৩-

১১৫. Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt,* p. 79

৮৩৩ খ্রি.)-এর অবদান ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। অন্য খলিফাগণ তাঁদের ন্যায় তেমন বিখ্যাত না হলেও তারা সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

উমাইয়্যা যুগের ন্যায় শাসনরত খলিফা তাঁর জীবদ্দশাতেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন। খলিফাগণ নিজ পুত্র বা তাঁর ভাইদেরকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করতেন। যেমন-আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস-আস-সাফফা (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.) তাঁর ভাই আবু জাফর-আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)-কে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। আবার খলিফা হারুন-অর-রশীদ তাঁর দুই পুত্র আল-আমিন ও আল-মামুনকে পর পর উত্তরাধিকারী খলিফা হিসেবে মনোনীত করে যান।[১১৬] খলিফা মনোনীত সম্পন্ন হলে কাজী, সেনাপতি, সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের অধস্তন কর্মচারীসহ সাম্রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তাদেরকে আমন্ত্রণ করা হতো পরবর্তী উত্তরাধিকারীর প্রতি আনুগত্যের বাইয়াত নেওয়ার জন্য। শপথ গ্রহণকারী ব্যক্তি যুবরাজের হাতে হাত রেখে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করতেন। সাম্রাজ্যের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অভিজাতবর্গ ব্যক্তিগতভাবে মনোনীত উত্তরাধিকারীর কাছে শপথ গ্রহণ করতেন।[১১৭]

আব্বাসীয় শাসন আধুনিক যুগের সুসভ্য শাসন পদ্ধতির মতই সুনির্দিষ্ট নিয়মেই পরিচালিত হতো। সেসময় প্রশাসন মূলত নিম্নোক্ত তিন শ্রেণির ব্যক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হতো।[১১৮]

২. الخليفة (খলিফা)

আব্বাসীয় আমলে সাম্রাজ্যের শাসন বিভাগ উজির বা মন্ত্রীর ওপর, বিচার বিভাগ কাজীর ওপর এবং সামরিক বিভাগ সেনাপতির ওপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন স্বয়ং খলিফা। প্রথমদিকের খলিফাগণ শাসন-ব্যাপারে প্রাচীন পারস্য রাজদরবারের নীতি অনুসরণ করতেন। তবে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের শেষের দিকে ধর্মকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে তারা এমন কিছু কাজ করেন যা তাদের প্রকৃত ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্য ছিল না। অষ্টম খলিফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)-এর শাসনামল থেকেই খলিফাগণ তাদের নামের সাথে 'আল্লাহ' শব্দটি যুক্ত করে সম্মানসূচক

---

১১৬. ড. হাস্‌সাইন ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলামী* (বৈরুত: দারুল জিল/কায়রো: মাকতাবুতুন নাহদা আল-মিসরিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), ২য় খণ্ড, ১৪তম সংস্করণ, পৃ. ২০৮-২০৯

১১৭. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens*, p. 403

১১৮. মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস* (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৬ খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১২৬

উপাধি গ্রহণ শুরু করেন।[১১৯] এসময় খলিফা ছিলেন সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সেনাবাহিনী পরিচালনা, সামরিক নীতি-নির্ধারণ, সামরিক ও বেসামরিক সব পদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ, তাদের কার্যাবলির তত্ত্বাবধান, বদলি, পদোন্নতি ও পদচ্যুতি সম্পূর্ণ খলিফার হাতে ছিল। বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে ও বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনেও খলিফা বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন।

২. الوزارة (উজির)

খলিফার পরেই ছিল উজিরের (মন্ত্রী) স্থান। পূর্বে পারসিকদের মধ্যে এ পদের ব্যবহার থাকলেও মুসলমানদের মধ্যে আব্বাসীয়রাই প্রথম তা সৃষ্টি করেন। সেসময় উজিরকে বলা হতো খলিফার ডান হাত (ساعد الخليفة الأيمن)। আব্বাসীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস-আস-সাফফা (৭৫০-৭৫৪ খ্রি.) কর্তৃক নিয়োগকৃত আবু সালামা-আল-খাল্লাল (মৃ. ৭৫০ খ্রি.) আব্বাসীয় খলিফাদের প্রথম উজির। উজির খলিফার নির্দেশ পালন করার পাশাপাশি খলিফাকে পরামর্শ দিতেন এবং যাবতীয় কাজের সাহায্যকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। খলিফার সঙ্গে জনগণের সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব না হলে উজিরের কাছেই তাদের অভাব-অভিযোগ পেশ করত।[১২০] অধিকাংশ খলিফা আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকায় শাসনকার্য প্রকৃতপক্ষে উজির পরিচালনা করতেন। খলিফার সম্মতি নিয়ে উজির প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও কাজী নিযুক্ত করতেন। উজিরের নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হত এবং মন্ত্রী পরিষদের অধীনে অনেকগুলো মন্ত্রণালয় পরিচালিত হতো।[১২১]

আব্বাসীয় শাসনামলে উজিরগণ অনেক সময়ই বিকল্প খলিফা হিসেবেও কাজ করতেন। ক্রমশই তারা বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হন। খলিফা আল-নাসির (১১৮০-১২২৫) তাঁর উজিরকে কূটনৈতিক কাজে নিয়োগ করে রাজতন্ত্রের স্বর্গীয় অধিকারতত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দেন। তিনি তার উজির সম্পর্কে ঘোষণা করেন: "মুহাম্মাদ বিন-বার্জ আল-কুম্মী আমাদের দখলে থাকা সমস্ত ভূখণ্ড এবং বসবাসকারী প্রজাদের প্রতিনিধি। তাই তাকে মান্য করার অর্থই আমাদের মান্য করা। তাকে মান্য করার অর্থ আল্লাহকে মান্য করা। আর যারা আল্লাহকে মান্য করে জান্নাতে যেতে আগ্রহী তাদের ভালমন্দ সবকিছু স্বয়ং আল্লাহ-ই দেখবেন। আর যে আমাদের উজিরকে অমান্য করবে সে আমাদেরকে অমান্য করবে। সুতরাং যে

---

১১৯. ড. হাসান ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬; Philip K Hitti, *History of the Arabs*, (London, Macmillan & Co.Ltd, 1961.), p. 317

১২০. ড. হাসান ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

১২১. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪

আমাদের অমান্য করবে প্রকারান্তরে সে আল্লাহকেও অমান্য করবে। আর যারা আল্লাহকে অমান্য করবে তাদের জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মরতে হবে।"[১২২]

৩. الحاجب (হাজিব)

আব্বাসী যুগে খলিফাদের একজন করে সহকারী থাকত যাদেরকে বলা হতো 'হাজিব'। উজিরের কার্যাবলি হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে হাজিব পদের সৃষ্টি হয়। খলিফাদের ওপর এদের অসামান্য প্রভাব ছিল। খলিফা ও উজিরের পরেই ছিল হাজিবের স্থান। তিনি ছিলেন খলিফার রাজপরিবারের গৃহধ্যক্ষ। এ হাজিবের দায়িত্ব ছিল খলিফার উপস্থিতিতে দূত এবং সম্মানীয় অতিথিদের রাজসভায় পরিচয় করে দেওয়া। হাজিব খলিফা ও জনগণের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতেন এবং বিদেশী দূতবর্গকে দরবারে আমন্ত্রণ ও পরিচয় করিয়ে দিতেন। খলিফাকে যদিও নিরংকুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী বলেই মনে করা হতো, এতদ্বসত্ত্বেও শাসন পরিচালনার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবিহীন ক্ষমতার অধিকারী ও পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না। খলিফার মসনদে আরোহণের সময় যখন তার হাতে বাইয়াত করা হতো, তখন কুরআন-সুন্নাহর শর্ত তার জন্যে অবশ্যই যুক্ত থাকতো।[১২৩] আব্বাসীয়দের শাসনযন্ত্র বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ শাসন পদ্ধতির সমকক্ষ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলি প্রধানত ছিল নিম্নরূপ:

(১) দিওয়ানুল জুনদ (সামরিক বিভাগ) (২) দিওয়ানুল-খারাজ (ভূমিরাজস্ব বিভাগ) (৩) দিওয়ানুর-রসাইল (পত্র বিনিময় বিভাগ) (৪) দিওয়ানুল-খ'তাম (রেজিস্ট্রি বিভাগ) (৫) দিওয়ানুল-বারিদ (ডাক বিভাগ) (৬) দিওয়ানুল-আযিম্মা (হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ) (৭) দিওয়ানুন-নাযর ফিল মাযালিম (অভিযোগ তদন্ত বিভাগ) (৮) দিওয়ানুন-নাফাকাত (রাজকীয় পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত বিভাগ) (৯) দিওয়ানুস-সাওয়াফী (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান বিভাগ) (১০) দিওয়ানুদ-দিয়া (খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ) (১১) দিওয়ানুল-মাওয়ালী ওয়াল গিলমান (আশ্রিত ও ক্রীতদাসদের নিরাপত্তা বিভাগ) (১২) দিওয়ানুল-আনহার (সেচ বিভাগ) (১৩) দিওয়ানুত-তাওকী (অনুরোধ বিভাগ) (১৪) দিওয়ানুশ-শুরতা (পুলিশ বিভাগ) (১৫) দিওয়ানুল-হিসবাহ (সহযোগী পুলিশ বিভাগ) ও (১৬) দিওয়ানুল কাজা বা বিচার বিভাগ।

---

১২২. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, pp. 318-319
১২৩. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৭

১. দিওয়ানুল জুনদ (সামরিক বিভাগ)

আব্বাসীয় যুগে সেনাবাহিনী দুই শ্রেণির সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিল মুর্তাজিকা বা নিয়মিত বেতনপ্রাপ্ত বাহিনী এবং মুতাতাওবিয়া বা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, যারা কর্তব্যবোধে যোগদান করত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন যারা কেবল রসদ পেত। এ সেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হত মূলত বেদুইন, কৃষক এবং শহুরে লোকদের থেকে। গৃহে অনুপস্থিত থাকাকালীন তাদের স্ত্রী ও শিশুরা বিভিন্ন জিনিসপত্র ও নির্দিষ্টহারে ভাতা পেত।[১২৪] সাধারণত ১০,০০০ লোক নিয়ে একটি বাহিনী গঠিত হতো এবং একজন আমীর বা সৈন্যাধ্যক্ষ তার নেতৃত্ব দিতেন। ১০,০০০ লোকের স্থলবাহিনীর নেতা ছিলেন কায়িদ; অন্যদিকে ১০০ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ককে বলা হতো নকীব (সেঞ্চুরিয়ন) এবং প্রতি ১০ জনের ওপর ছিল একজন আরিফ (ডেকুরিয়ন)।[১২৫]

বিদেশী সৈন্য দ্বারা গঠিত একটি বিশেষ বাহিনী রাজকীয় দেহরক্ষীর কাজ করত। তারা উচ্চতর বেতন পেত এবং চমকপ্রদ ইউনিফর্ম পরিধান করত। রাজকীয় দেহরক্ষীদল ব্যতীত আরো একদল সৈন্যবাহিনী ছিল তারা বাহ্যত কিছুটা নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। তাদেরকে বলা হতো আল-মানুয়াত বা গার্হস্থ্য বাহিনী। এ যুগে খলিফার ব্যক্তিগত রক্ষীদেরকে আল গিলমানুল হুজারিয়া বা খাস কামরার ভৃত্য বলা হতো। তারা খলিফার বালক ভৃত্যের কাজ করত, কিন্তু বয়োপ্রাপ্ত হলে দেহরক্ষীর কাজ করত। এসব অল্পবয়স্করা দরবারে শিক্ষালাভ করত এবং যত্নের সাথে সামরিক কুচকাওয়াজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হতো।[১২৬]

আব্বাসীয় শাসনামলে যুদ্ধক্ষেত্রে নৌবাহিনীর যথার্থ ব্যবহার ছিল সর্বজনবিদিত।[১২৭] সিরিয়া ও মিশর বিজয়ের সাথে সাথে এক বিস্তীর্ণ উপকূল অঞ্চল আরবদের অধিকারে চলে আসে। সামুদ্রিক বন্দর রক্ষা ও শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য নৌবাহিনী সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।[১২৮]

প্রথম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খেলাফত তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। ওই সৈন্যবাহিনী কেবল সিরিয়া, পারস্য ও মধ্য এশিয়ার বিদ্রোহই দমন করেনি, বরং রোমানদের

---

১২৪. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, pp. 326-327
১২৫. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens*, p. 431
১২৬. ibid, pp. 431-432
১২৭. আব্দুল ওয়াহিদ সিন্ধী, *সোনালী যুগের মুসলিম নৌশক্তি* (ঢাকা: ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৭১
১২৮. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens*, p. 442

বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করতেও সক্ষম হয়েছিল। অনেক রোমান ঐতিহাসিক ও লেখকের রচনায় আরবদের যুদ্ধকৌশলের অনেক প্রশংসার আলোচনা পাওয়া যায়। খলিফা আল-মুতাওয়াকিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) কর্তৃক সামরিক বিভাগে বৈদেশিক বাহিনী নিয়োগের ফলে আব্বাসীয় বংশের পতন শুরু হয়। খলিফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ (৯০৮-৯৩২ খ্রি.)-এর প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক সৈন্যদের বেতন দেওয়ার প্রথা উদ্ভাবন করেছিলেন। বুয়াইয়াদের শাসনামলে সৈন্যরা বেতনের পরিবর্তে জমি লাভ করত। এতে যে সামন্ততান্ত্রিক সামরিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সেলজুকদের আমলে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।[১২৯]

২. দিওয়ানুল-খারাজ (ভূমিরাজস্ব বিভাগ)

উমাইয়্যা শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত ভূমিরাজস্ব এ বিভাগটি আব্বাসীয়দের সময়েও অব্যাহত ছিল। এতে শুধু সংগৃহীত করের হিসাব রাখা হতো না; বরং ব্যয়ের হিসাবও রাখা হতো। এভাবে এটি Central Finance Board বা কেন্দ্রীয় অর্থ বিভাগে পরিণত হয়। এ বিভাগের কাজ ছিল রাজস্ব নীতি-নির্ধারণ, রাজস্বের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা, কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় বহন, উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ যোগান দেওয়া ইত্যাদি।[১৩০] এ বিভাগের প্রধানকে সাহিবুল খারাজ বলা হতো। আব্বাসীয়দের রাজস্ব আয়ের উৎসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল যাকাত, জিজিয়া[১৩১], খারাজ ইত্যাদি। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে সাহায্য করতেন কোষাধ্যক্ষ, সচিব এবং পরিদর্শক।

রাষ্ট্রের আয়ের উৎসের মধ্যে অন্যতম ছিল যাকাত। প্রতিটি সামর্থবান মুসলমানকেই এটি যথাযথোভাবে আদায় করতে হতো। চাষযোগ্য জমি, পশুপালন কেন্দ্র, সোনা, রূপা, বাণিজ্যিক গুদাম এবং অন্য যেসব সম্পত্তি স্বাভাবিকভাবে বা বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধির সম্ভাবনাযুক্ত ছিল-তাতেও করারোপ করা হতো।

---

১২৯. ibid, p. 442; Philip K Hitti, *History of the Arabs*, pp. 328-329

১৩০. Husaini, Dr. S.A.Q, *Arab Administration* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-i Delhi, 1976), Reprint, pp. 161-162

১৩১. জিযয়া (الجزية) শব্দটি আরবী জাযা (الجزاء) থেকে নির্গত। এর অর্থ: বিনিময়। যেমন ঈমানের জাযা বা বিনিময় হল জান্নাত। ইসলামী রাষ্ট্রের (دار الإسلام) যেসব অমুসলিম নাগরিক রাষ্ট্রীয় আনুগত্য স্বীকার করে সেখানে বসবাস করতে চায়; ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ দায়িত্বের বিনিময়ে তাদের থেকে যে বিনিময় গ্রহণ করা হয়, তাকে জিযয়া বলা হয়। এ হিসেবে একে নিরাপত্তা করও বলা যায়। এর পেছনে যুক্তি হল-ইসলামী রাষ্ট্রের সকল মুসলিম নাগরিকের ওপর দেশ রক্ষার প্রয়োজনে জিহাদে অংশগ্রহণ করা ও বহিঃশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করা নীতিগতভাবে আবশ্যক। কিন্তু অমুসলিম নাগরিকদের ওপর তা আবশ্যক নয়। তাই জিযয়াকে নিরাপত্তার পাশাপাশি জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি লাভের বিনিময়ও বলা যায়। সুত্র: মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম, *ইসলামী অর্থনীতির সহজ পাঠ* (ঢাকা: আলোকধারা প্রকাশন, ১৪৪৪ হি./২০২৩ খ্রি.), পৃ. ৫১১

সেসময় মুসলমানদের কোনো মাথাপিছু কর দিতে হতো না। জমি, পশুপালনকেন্দ্র, বা এ ধরণের সব কিছুর কর নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল সরকারি কর সংগ্রাহকদের। মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশে রপ্তানি পণ্যের ওপরও করারোপ করা হতো। এসবের মধ্যে ভূমি করই ছিল সবচেয়ে বেশি। সরকারি আয়ের মূল উৎস অমুসলিমদের ওপর আরোপ করা হয়েছিল। সেখানে সরকারি রাজস্বকে ফায়[১৩২] হিসেবে বর্ণনা করা হতো এবং তা খরচ করা হত সৈন্যদের বেতন দিতে, মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তা, সড়ক নির্মাণ এবং মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণ সাধনে।[১৩৩]

৩. দিওয়ানুর-রসাইল (পত্র বিনিময় বিভাগ)

আব্বাসীয় শাসনামলে এ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন একজন সভাপতি বা প্রধান সচিব। সমাজের উচ্চ শ্রেণির মেধাবী, চিঠিপত্র লেখায় পারদর্শী এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণকেই দিওয়ানুর-রসাইল বা পত্র বিনিময় বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করা হতো। সরকারি চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, রাজকীয় আদেশ নির্দেশ ও জনগণের অভিযোগ এ বিভাগে লিখিত হতো এবং পরে খলিফা বা উজিরের অনুমোদনের পর যথারীতি সীলমোহর যুক্ত হয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হতো। জনসাধারণের অভিযোগ শুনার পর রাজকীয় সিদ্ধান্ত একটি অনুলিপি অভিযোগকারীকে দেওয়া হতো এবং মূলটি রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণাগারে রাখা হতো।[১৩৪]

৪. দিওয়ানুল-খাতাম (রেজিস্ট্রি বিভাগ)

আব্বাসীয় প্রাথমিক যুগে এ বিভাগ চালু থাকলেও পরবর্তীকালে ও বিভাগকে 'দিওয়ানুত তাওকী'-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। সরকারি পত্রাদি ও আদেশ-নির্দেশের অনুলিপি এ বিভাগে সংরক্ষিত হতো এবং মূল কপি সীলমোহর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিভাগের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।[১৩৫]

---

১৩২. ফায় বা ইবনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ ও ইবনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ যদি মুসলমানদের হস্তগত হয়, তবে এসব সম্পদকে ফায় বলা হবে। এসব সম্পদ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না। কেননা এসব সম্পদ ইবনাযুদ্ধেই হাসিল হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে : وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْ جَعْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ و لكنَّ اللهَ يُسلّط رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ অর্থাৎ আল্লাহ ইয়াহুদীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যে ফায় দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করো নি; আল্লাহ্ তো যার ওপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (সূরা হাশর ৫৯ : ৬)। দ্র.: *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬

১৩৩. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, p. 320

১৩৪. *Arab Administration*, ibid, p.162

১৩৫. মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৫. দিওয়ানুল-বারিদ (ডাক বিভাগ)

ডাক বিভাগ আব্বাসীয় খেলাফতের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। উমাইয়্যা খলিফা মুয়াবিয়া (৬৬১-৬৮০ খ্রি.) এ বিভাগের প্রবর্তন করেন এবং আবদুল মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) সাম্রাজ্যব্যাপী এর বিস্তৃতি সাধন করেন। আব্বাসীয় খলিফা হারুন-অর-রশিদ তাঁর বার্মাকীয় উপদেষ্টা ইয়াহিয়া বিন খালিদের (মৃ. ৬৬১-৬৮০ খ্রি.) সাহায্যে এ বিভাগকে একটি সুসংগঠিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করেন।[১৩৬] প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে একটি করে ডাকঘর ছিল। পারস্যে অশ্ব এবং আরব ও সিরিয়ায় উট ছিল ডাক সরবরাহের প্রধান মাধ্যম। কখনো কখনো শিক্ষিত কবুতরগুলোকে পত্রবাহক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সরকারি কাজের সুবিধার জন্য এ বিভাগের প্রতিষ্ঠা হলেও অর্থের বিনিময়ে জনসাধারণও এর সাহায্য গ্রহণ করতে পারত। বাগদাদের ডাক বিভাগের প্রধান কেন্দ্রে সাম্রাজ্যের সকল পথবৃত্তান্ত সংবলিত গ্রন্থ ছিল। এ গ্রন্থ পরবর্তী ভৌগোলিক গবেষণার জন্যও এক মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়।[১৩৭]

ডাকব্যবস্থা এবং বিভিন্ন ডাকঘর পরিচালনা করা ছাড়া ডাকবিভাগের প্রধানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন। তিনি ছিলেন এক সুচারু গুপ্তচর ব্যবস্থারও প্রধান। কার্যত এ গুপ্তচর বিভাগের অধীনেই ডাকবিভাগ চলত। তাই ডাকবিভাগের প্রধানকে বলা হতো সহিবুল-বারীদ ওয়াল-আখবার বা ডাক এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে গোয়েন্দা বিভাগের তদারকি করার পাশাপাশি ডাক-কর্তারও দায়িত্ব পালন করতেন। প্রাদেশিক ডাকপ্রধানরা তাঁর কাছে অথবা সরাসরি খলিফার কাছে কাজের হিসাব দিতেন। খলিফা আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) বণিক, হকার, পর্যটকদের গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করতেন। খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) এবং অন্য খলিফাগণও এ নিয়োগনীতি অনুসরণ করেন। খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর সময়ে গোয়েন্দাবাহিনীতে শুধু বাগদাদেরই ১৭০০ বৃদ্ধা ও বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। বিশেষত যেসব রোমান সাম্রাজ্য আব্বাসীয়-রাজ্যের দখলে এসেছিল সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবসায়ী, পর্যটক এবং চিকিৎসকদের গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করা হতো।[১৩৮]

---

১৩৬. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, pp. 322-323
১৩৭. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬
১৩৮. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, p. 325

উপরিউক্ত ৫টি বিভাগই উমাইয়্যা আমলেও ছিল এবং আব্বাসীয় আমলেও এগুলো বহাল থাকে। আব্বাসীয়রা পরবর্তীতে নিম্নোক্ত বিভাগগুলো সংযোজন করে।

৬. দিওয়ানুল-আযিম্মা (হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ)

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অধীনে একটি হিসাব নিরীক্ষণ বিভাগ ছিল। এটি খলিফা আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.)-এর আমলে শুরু হয়।[১৩৯] কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক লেনদেন সম্বন্ধীয় প্রশাসনিক বিভাগসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ করা এ বিভাগের দায়িত্ব ছিল।

৭. দিওয়ানুন-নাযর ফিল মাযালিম (অভিযোগ তদন্ত বিভাগ)

দিওয়ানুন-নাযর ফিল মাযালিম বা অভিযোগ তদন্ত বিভাগ ছিল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ফৌজদারি আপিল আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার-দুর্নীতিসহ প্রভৃতি বিষয়ের তদন্ত ও প্রতিকার করা এ বিভাগের দায়িত্ব ছিল। প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দপ্তরের কাজে কোনো ভুল-ত্রুটি হলে এখানে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যেত। উমাইয়্যা খলিফা আব্দুল-মালিক (৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) প্রথম খলিফা যিনি নিজে এ ধরণের সমস্ত আপিল এবং প্রজাদের অভিযোগ শুনতেন এবং বিচার করতেন। আব্বাসীয় আমলে খলিফা হারুন-অর-রশিদ এ রীতির প্রথম প্রচলন করেন। পরবর্তীতে খলিফা আল-মামুন, খলিফা আল-মাহদী, খলিফা আল-হাদীসহ আরো অনেকেই এ দপ্তর বজায় রাখেন। তাঁরা জনসম্মুখে মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতেন এবং সমাধান করতেন। আল-মুহতাদী (৮৬৯-৮৭০ খ্রি.) আব্বাসীয়দের শেষ খলিফা-যিনি এ প্রথা চালু রেখেছিলেন। পরবর্তীতে সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজার (১১৩০-১১৫৪ খ্রি.) মুসলিম শাসনের অনুকরণে সিসিলিতে এ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।[১৪০]

৮. দিওয়ানুন-নাফাকাত (রাজকীয় পারিবারিক ব্যয় সংক্রান্ত বিভাগ)

আব্বাসী যুগে শাহী মহলের খরচপত্র, পারিতোষিক, ভাতা ও দান-দক্ষিণার রেজিস্টার এ দফতরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।[১৪১]

---

১৩৯. ibid, p. 321
১৪০. ibid, pp. 321-322
১৪১. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

৯. দিওয়ানুস-সাওয়াফী (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তত্ত্বাবধান বিভাগ)

বিজিত রাজা বা অভিজাতবর্গের পরিত্যক্ত সম্পত্তি, যুদ্ধে নিহত শত্রুদের জমি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে গণ্য হতো। এসব সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, রাজস্ব আদায়, হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি এ বিভাগের দায়িত্ব ছিল।[১৪২]

১০. দিওয়ানুদ-দিয়া (খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ)

ইরাক প্রদেশে অবস্থিত খলিফার জায়গির বলে গণ্য এলাকাসমূহের এবং খলিফার নিজস্ব জমিজামার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এগুলোকে শস্য-শ্যামল রাখার উদ্দেশ্যে এ দফতরটি নিয়োজিত ছিল।[১৪৩]

১১. দিওয়ানুল-মাওয়ালি ওয়াল গিলমান (আশ্রিত ও ক্রীতদাসদের নিরাপত্তা বিভাগ)

এ বিভাগে খলিফার মৈত্রী যুক্তিকারী ব্যক্তি ও ক্রীতদাসদের একটি তালিকাবহি রাখা হতো-যা থেকে তাদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হতো।[১৪৪]

১২. দিওয়ানুল-আনহার (সেচ বিভাগ)

খাল মেরামত ও সংরক্ষণ করা এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ও সম্প্রসারণ এ দফতরের কাজ ছিল। নতুন খাল খননের ব্যাপারে কৃষি-খামারের মালিকরা ছাড়াও আমীর-উমারা এবং সমাজসেবীদের স্বাধীনতা ছিল। কোনো এলাকার কৃষক বা অধিবাসীরা যদি নতুন খাল খনন করতে চাইত তাহলে তার অর্ধেক খরচ সরকার বহন করতো। পানি বণ্টনের ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রামের লোকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে এ দফতরের লোকজন গিয়ে সে বিরোধের নিষ্পত্তি করে দিতেন। নতুবা সাধারণভাবে এসব ব্যাপারে কোনোরূপ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ করা হতো না। কৃষকরা নিজেরাই আপোসে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করে নিত। নতুন খাল খননে সরকারের শুধু এতটুকু সুবিধা হতো যে, রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আদায় অনেকটা সহজ হয়ে যেত। কেননা তাতে কৃষকদের উৎপাদন ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেত। ফলে রাজস্ব প্রদানে কেউ দ্বিধা বা গড়িমসি করতো না।[১৪৫]

---

১৪২. মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

১৪৩. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

১৪৪. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens,* p. 414

১৪৫. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫০

১৩. দিওয়ানুত-তাওকী (সুপারিশ বিভাগ)

উমাইয়্যা আমলে রাষ্ট্রের সীলমোহর দফতর নামে অভিহিত এ বিভাগটি আব্বাসী যুগে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত স্মারকলিপির উত্তর প্রস্তুত করা হতো; রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাক্ষর ও সীলমহরযুক্ত করা হতো এবং পাঠানোর পূর্বে সেগুলোতে সাধারণত খলিফার স্মারক চিহ্ন কিংবা কুরআনের একটি শ্লোক লিখে দেওয়া হতো।[১৪৬] খলিফার স্বাক্ষর বা সীলমহরে যেসব নির্দেশাদি জারি হতো তা সংরক্ষিত থাকতো। এ বিভাগটিও কাতিবের তত্ত্বাবধানে থাকতো।[১৪৭]

১৪. দিওয়ানুশ-শুরতা (পুলিশ বিভাগ)

দিওয়ানুশ-শুরতাহ বা পুলিশ বিভাগের শীর্ষে ছিলেন সহিবুশ-শুরতাহ; যিনি ছিলেন পুলিশকর্তা এবং রাজকীয় দেহরক্ষী। প্রত্যেক বড় শহরে নিজস্ব পুলিশ দপ্তর ছিল। শহরের পুলিশ বাহিনীর কর্তাকে বলা হতো মুহতাসিব; যিনি নৈতিকতা ও শহরের বাজারগুলোর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও কাজ করতেন।[১৪৮]

আব্বাসীয় যুগে পুলিশ বাহিনীতে চারটি বিশেষ শাখায় বিভক্ত ছিল।

১. الشرطة (আশ-শুরতাহ) বা সাধারণ পুলিশ বাহিনী-এর প্রধান বাহিনীকে বলা হতো صاحب الشرطة (সহিবুশ-শুরতাহ)।

২. المعونة (আল-মাউনাহ) বা সামরিক পুলিশ-এর প্রধানের উপাধি ছিল صاحب المعونة (সহিবুল মাউনাহ)।

৩. الحرس (আল-হারাস) বা দেহরক্ষী বাহিনী-এ বাহিনীর প্রধান صاحب الحرس (সহিবুল হারাস) নামে অভিহিত ছিলেন।

৪. الأحداث (আল-আহদাস) বা বিশেষ পুলিশ বাহিনী-এ বাহিনীর প্রধানের উপাধি ছিল صاحب الأحداث (সহিবুল আহদাস)।

পুলিশ বিভাগের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সহিবুশ-শুরতাহ এবং তারই তত্ত্বাবধানে পুলিশ প্রশাসন দায়িত্বপালন করতেন। সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদান এবং প্রদেশে কোনো প্রকার বিদ্রোহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলে তা দমন করত মাউনা বা সামরিক পুলিশ বাহিনী। অপরাধীদের অনুসন্ধান করে

---

১৪৬. Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens,* pp. 416-417

১৪৭. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৯

১৪৮. Philip K Hitti, *History of the Arabs* (Macmillan & Co.Ltd, London, 1961), p. 322

গ্রেফতার করে আইনের শাসনে আনার দায়িত্ব ছিল 'হারাস' বা প্রহরী পুলিশ বাহিনীর ওপর। তাছাড়া রাজকীয় অনুষ্ঠানে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় এবং সীমান্তের ফাঁড়ি পাহারার কাজেও তাদের নিয়োজিত করা হতো। খলিফার দেহরক্ষী বাহিনী হিসেবে 'হারাসের' বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশেষ পুলিশ বাহিনী 'আহদাস' বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকত। রাজস্ব আদায়ে সহায়তা, হজ্জ মওসুমে মক্কার রাজপথে নিরাপত্তা বিধান, হজ্জযাত্রীদের নিকট হতে যাকাত আদায় প্রভৃতি কর্তব্য পালন করত 'আহদাস'। সেসময়ে সাহিবুশ-শুরতার পদমর্যাদা ছিল বর্তমান মন্ত্রীর সমতুল্য।[১৪৯]

১৫. দিওয়ানুল-হিসবাহ (সহযোগী পুলিশ বিভাগ)

এটি ছিল পুলিশ বিভাগের মতই এক ধরণের আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকারী বিভাগ। জনসাধারণের বিভিন্ন অপরাধমূলক তৎপরতা দমনে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে শুধু পুলিশ বাহিনী যথেষ্ট ছিল না। তাই খলিফা আল-মাহদী এ বিভাগ স্থাপন করেন।

১৬. দিওয়ানুল কাজা (বিচার বিভাগ)

প্রাদেশিক কাজী প্রদেশের বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। প্রাদেশিক কাজী, খলিফা অথবা কেন্দ্রের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। শহর কাজীগণ প্রাদেশিক কাজীর অধীনে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। তাছাড়া এতিম ও নাবালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়াক্ফ সম্পত্তি তত্ত্বাবধান, উইল বাস্তবায়ন, অভিভাবকহীন মেয়েদের বিবাহ প্রদান ইত্যাদি কাজীদের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রদেশে সহিবুল মাজালিম ফৌজদারি বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। আমীর নিজে বা তার কোনো প্রতিনিধি মাজালিম আদালতে সভাপতিত্ব করতেন। ক্ষমতার অপব্যবহার, অন্যায়ভাবে সম্পত্তি দখল ইত্যাদির বিচার এ আদালতের আওতাধীন ছিল।[১৫০]

---

১৪৯. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আরব জাতীর ইতিহাস* (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউজ, ২০০৬), ১ম প্রকাশ, পৃ. ৬২৩

১৫০. মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

অপরাধের প্রকৃতি ও শাস্তির বিধান : আব্বাসীয় আমলে ইসলামী আইনানুসারে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন ধরণের শাস্তির বিধান ছিল। সেসময়ে অপরাধ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যেমন: আল্লাহ বিরোধী অপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ ও রাষ্ট্র বিরোধী অপরাধ। নিম্নে আব্বাসীয় আমলে অপরাধের শাস্তির বিধানের একটি চিত্র দেওয়া হলো-[১৫১]

অপরাধ	শাস্তি
ধর্মত্যাগ	মৃত্যুদণ্ড
মদপান	৮০ বেত্রাঘাত
চুরি	ডান হাত কর্তন
প্রকাশ্যে ডাকাতি	ডান হাত ও বাম পা কর্তন
বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার	পাথর নিক্ষেপে হত্যা
অ-বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার	১০০ বেত্রাঘাত

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা: বাইজেন্টাইন এবং পারস্য সাম্রাজ্যের অনুকরণে উমাইয়্যা সাম্রাজ্যের বিভক্তিকরণনীতি আব্বাসীয়দের আমলে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়নি। আব্বাসী আমলে প্রদেশগুলোর সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। তবে এযুগে প্রদেশগুলোর তালিকা খলিফাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল। খলিফা হারুন-অর-রশিদ ও খলিফা আল-মামুনের খেলাফতকালে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য ৩৬টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। অবশ্য অধ্যাপক ফিলিপ কে. হিট্টি প্রাথমিক আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনামলের নিম্নোক্ত ২৪টি প্রধান প্রদেশের কথা উল্লেখ করেন।[১৫২]

(১) লিবিয়ান মরুভূমিসহ পশ্চিম আফ্রিকা (২) সিসিলি (৩) সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন (এ দুটি প্রদেশ কিছুকাল বিচ্ছিন্নও ছিল) (৪) হেজাজ এবং ইয়ামামা (মধ্য আরব), (৫) ইয়ামান বা দক্ষিণ আরব (৬) বাহরাইন এবং ওমান-এর রাজধানী যথাক্রমে বসরা এবং ইরাক (৭) সাওয়াদ বা ইরাক (নিম্ন মেসোপটেমিয়্যা (৮) আল-জাজিরা (৯) আজারবাইজান (১০) আল-জিবাল (১১) খুজিস্তান, (১২) ফারিস, (১৩) কেরমান, (১৪) মুকরান, (১৫) সিজিস্তান বা সিস্তান, (১৬) কুহিস্তান, (১৭) কুমিস,

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩
১৫২. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, pp. 330-331

(১৮) তাবারিস্তান, (১৯) জুরজান (২০), আর্মেনিয়া, (২১) খোরাসান (২২) খাওয়ারিজম, (২৩) আস-সুগদ (প্রাচীন সগদিয়ানা) এবং (২৪) সমরকন্দ।

প্রদেশগুলোর এ তালিকা থেকেই মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বাগদাদ থেকে সকল চেষ্টা সত্ত্বেও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এত বড় সাম্রাজ্যের দৃঢ় বন্ধনকে পরবর্তীকালে অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়নি। প্রদেশে ওয়ালির কর্তৃত্বই প্রায় সার্বভৌম ছিল এবং প্রাদেশিক শাসকের পদ লাভের ব্যাপারে উত্তরাধিকার নীতির প্রবণতাও দেখা দিয়েছিল। খলিফার সম্মতিক্রমে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হতেন। প্রধানমন্ত্রীর পতনের সঙ্গে তারাও পদচ্যুত হতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তার ক্ষমতা নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি, খলিফার দূর্বলতা এবং কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে প্রদেশের দূরত্বের তারতম্যের ওপর নির্ভর করত। প্রাদেশিক আয় দিয়ে সে প্রদেশের প্রয়োজন মিটিয়ে ওয়ালি উদ্বৃত্ত অর্থ খলিফার কাছে প্রেরণ করতেন। বিচার-ব্যবস্থা প্রাদেশিক কাজী কর্তৃকই সম্পাদিত হতো। অবশ্য তার সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক প্রতিনিধি ছিল।[১৫৩]

১৫৩. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা

আব্বাসী যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সাম্রাজ্যের শক্তি ও স্থিতির অন্যতম ভিত্তি। বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, সমৃদ্ধ কৃষিভূমি, ব্যস্ত বাণিজ্যপথ ও কারুশিল্পের বিকাশ-সব মিলিয়ে এসময় এক গতিশীল অর্থনৈতিক জাগরণের সাক্ষ্য বহন করে। রাজধানী বাগদাদ পরিণত হয়েছিল মুদ্রা উৎপাদন ও শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে; যেখানে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের পণ্য, সংস্কৃতি ও চিন্তার মিলন ঘটত। তবে যুগের অন্তিম পর্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাদেশিক বিদ্রোহ ও প্রশাসনিক দুর্বলতা অর্থনীতিতে কিছুটা টানাপোড়েন সৃষ্টি করে। তবুও এ যুগের দীর্ঘ সময়জুড়ে অর্থনীতি ছিল শক্তিশালী, সংগঠিত ও বৈশ্বিক প্রভাবসম্পন্ন-যা ইসলামী সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

আব্বাসীয় যুগের রাজস্ব ব্যবস্থা

আব্বাসী যুগে রাজস্ব আয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের ভালো অবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কারণে খলিফা হারুন অর-রশিদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) রাজত্বকালে রাজ্যের আয় ছিল প্রতি বছর ২ কোটি ৭২ লক্ষ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) এবং ৪ কোটি ৫০ লক্ষ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এবং খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) ব্যয় ছিল প্রতিদিন ৬ হাজার দিনার অর্থাৎ বাৎসরিক ২১ লক্ষ ৯০ হাজার দিনার। প্রতি বছর খলিফা হারুন অর-রশিদের কাছে প্রায় ৫ লক্ষ দিরহাম এবং ১০ হাজার দিনার আসত।[১৫৪] এ যুগে **পূর্বের** বৈষম্যমূলক রাজস্বনীতির অবসান হয় ফলে আরব ও অনারব মুসলমানের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হয়। ঐতিহাসিক পি.কে হিট্রির মতে, আব্বাসীয় শাসনামলে রাজস্ব আদায়ের যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের রাজত্বের প্রথম যুগে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি এমন শিখরে পৌঁছায় যে, খলিফাগণ আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসবহুল জীবনযাপন পারতে পারতেন। অবশ্য আব্বাসীয় খেলাফতের শেষের দিকে রাজকোষের ঘাটতি পূরণের জন্য প্রজাদের ওপর অনেক উৎপীড়নমূলক করও ধার্য করা হয়েছিল।

---

১৫৪. ড. হাসান ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

রাজস্ব আয়ের উৎসসমূহ

আব্বাসীয় খেলাফতে রাজস্ব আয়ের উৎসসমূহ ছিল-

১. যাকাত ২. খারাজ ৩. জিজিয়া ৪ গনিমত ও ফাই ৫. উশর ৬. মুসাদেরীন ৭. উপঢৌকন ও অন্যান্য উৎস।

১. যাকাতঃ

যাকাত (الزكاة) শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ইত্যাদি। যাকাত বলতে ধনীদের সম্পদের সেই নির্ধারিত অংশকে বোঝায়, যা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট খাতে প্রদান করতে হয়। পারিভাষিক অর্থে, সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) বা সাড়ে সাত তোলা সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) বা এর সমমূল্যের টাকা কিংবা ব্যবসায়িক পণ্য এক বছর পর্যন্ত কারো মালিকানায় থাকলে এবং তা তার ঋণ এবং প্রয়োজনীয় আসবাব সামগ্রীর অতিরিক্ত হলে এর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বের করে দেওয়াকে যাকাত বলে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সম্পদশালীদের সম্পদ থেকে নির্ধারিত ৮টি খাতে যাকাত বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত যাকাত হচ্ছে সম্পদশালীদের সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত সেই ফরয অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা অর্জন, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর রহমত লাভের আশায় নির্ধারিত খাতে বণ্টনের জন্য দেওয়া হয়।[১৫৫]

উমাইয়্যা যুগের ন্যায় আব্বাসী যুগেও মুসলমানদের নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার ওপর যাকাত ধার্য করা হতো। যাকাত যেহেতু একটি ধর্মীয় ইবাদত সেহেতু পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুসারেই তা আদায় করা হতো।[১৫৬]

২. জিযয়া

ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব অমুসলিম রাগরিক রাষ্ট্রীয় আনুগত্য স্বীকার করে সেখানে বসবাস করতে চায় ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ দায়িত্বের বিনিময়ে তাদের থেকে যে কর গ্রহণ করা হয় তাকে 'জিযয়া' বলে। অমুসলিম জিম্মি প্রজাদের ওপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১৫৫. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা. ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি.), ৯ম সংস্করণ, পৃ. ৩১৯ এবং ৫০৫

১৫৬. মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

ওয়া সাল্লামের যুগ থেকেই এ কর ধার্য করা হতো। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে উমাইয়্যা আমলে মাওয়ালীদের ওপরও অমুসলিমদের মতো এ কর ধার্য করা হয়। কিন্তু আব্বাসীয় আমলে মাওয়ালীগণ 'জিযয়া' প্রদান করা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করে। ইসলামের ধর্মীয় বিধান অনুসারেই কেবল জিম্মি প্রজাদের কাছ থেকে তা আদায় করা হতো। গরিব, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, শিশু, পুরোহিতসহ কতিপয় শ্রেণির অমুসলিম এ কর প্রদান থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিল। এটি অমুসলিমদের ওপর ধার্যকৃত সামরিক কর হিসেবে বিবেচিত হতো। কোনো অমুসলিম সামরিক কাজে যোগদান করলে তাকে তা প্রদান করা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হতো। এ সময়ে ধনীদের বার্ষিক ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তের ২৪ দিরহাম এবং নিম্নবিত্ত ও শ্রমিকদের ওপর ১২ দিরহাম হারে 'জিযয়া' ধার্য করা হতো। তবে কর প্রদানে অক্ষম অমুসলিমদের আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হতো।[১৫৭]

৩. গনিমত

কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে জিহাদ করে ইসলামী রাষ্ট্রের মুজাহিদগণ শত্রুপক্ষের অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন, ধন-সম্পদ, ভূ-সম্পত্তি, সমুদ্রতল থেকে প্রাপ্ত মণিমুক্তা, আসবাবপত্র, গবাদিপশু ও যুদ্ধবন্দীসহ যা কিছু লাভ করে, পরিভাষায় তাকে গনিমতের মাল বলা হয়। পবিত্র কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে[১৫৮]-

واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.

(আরো যেনে রাখো যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসুলের, রাসুলের স্বজনদের, ইয়াতিমদের, মিসকিনদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ঈমান রাখো আল্লাহে এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম, যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং উমাইয়্যা আমলের মতো আব্বাসীয় আমলেও গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো।[১৫৯]

---

১৫৭. মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম, *ইসলামী অর্থনীতির সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, ৫১১-৫১৩; মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

১৫৮. সুরা আনফাল, আয়াত: ৪১

৪. উশর (ফসলের যাকাত)

'উশর' শব্দের আভিধানিক অর্থ একদশমাংশ। সাধারণভাবে ফল-ফসলের যাকাতকে 'উশর' বলা হয়। সেচব্যবস্থার উপর নির্ভর করে প্রদত্ত যাকাতের পরিমাণ 'উশর' অর্থাৎ একদশমাংশ অথবা 'নিসফু উশর' বা একদশমাংশের অর্ধেক। নির্ধারিত এ হার অনুসারেই আব্বাসী যুগে 'উশর' ধার্য করা হতো।[১৬০]

৫. খারাজ (ভূমি রাজস্ব)

রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভূমির ভোগ-ব্যবহারের বিনিময়ে অমুসলিম জনগণ সরকারকে যে কর প্রদান করে, সেটিই মূলত ভূমি রাজস্ব বা ভূমিকর হিসেবে পরিচিত। ইসলামী পরিভাষায় তা খারাজ (الخراج) নামে পরিচিত। খারাজ (الخراج) শব্দের শাব্দিক অর্থ কোনোকিছু থেকে কিছু প্রকাশ হওয়া। যেমন জমি থেকে ফসল হওয়া। এটি মূলত অমুসলিমদের ভূমি; যা মুসলিমগণ জিহাদের মাধ্যমে অথবা সন্ধির মাধ্যমে হস্তগত করেছে। এসব জমি বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি যদি মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন না করে দেন; বরং তাতে অমুসলিমদের মালিকানা বহাল রাখা হয়, তবেই এ থেকে কর নেয়া হয়। হযরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে বিভিন্ন দেশ ও জনপদ মুসলমান কর্তৃক বিজিত হওয়ার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। যেমন বিখ্যাত সাহাবী সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাতে ইরাক বিজিত হওয়ার পর বিজিত ভূমি মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন না করে বরং এতে খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর (রা.) 'খারাজে মুয়াযযাফ' আরোপ করলে সাহাবীগণ তা মেনে নেন। মূলত এখান থেকেই খারাজের বিধান সূচিত হয়। আব্বাসী শাসনামল পর্যন্ত এ ভূমি থেকে 'খারাজে মুয়ায্যাফ' আদায় করা হতো অর্থাৎ সরাসরি চাষাবাদযোগ্য জমির ওপর করারোপ করা হতো। অবশেষে আব্বাসী খলিফা আবু জাফর আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) শাসনামলে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। ফলে উৎপন্ন ফসল দিয়ে খারাজ আদায় করা সম্ভব হতো না। কারণ খারাজ আদায় করা হলে ফসলের চেয়ে খারাজ বেশি হয়ে যায়। তখন খলিফা মুয়াযযাফের পরিবর্তে মুকাসামা চালু করেন। ফলে জমিতে ফসল যা হবে তার দুই ভাগের এক ভাগ বা তিন ভাগের এক ভাগ করারোপ করা হয়।[১৬১]

---

১৫৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত* (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৪৭

১৬০. মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম, *ইসলামী অর্থনীতির সহজ পাঠ*, প্রাগুক্ত, ৫১৯-৫২১

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭-৫১৯

আব্বাসীয় শাসনামলের রাষ্ট্রীয় আয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এ উৎসটি সৌর বছরের হিসাব অনুযায়ী নির্ধারিত ও আদায় করা হতো। পারস্যের 'নওরোজ' খারাজ আদায়ের দিন হিসেবে ধার্য ছিল। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে রৌপ্য মুদ্রা (দিরহাম) এবং পশ্চিমাঞ্চলে স্বর্ণমুদ্রা (দীনার)-এর মাধ্যমে খারাজ আদায় করা হতো।

৬. মুসাদেরীন (বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি)

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত লা-ওয়ারিশ সম্পত্তি এবং দুর্নীতিবাজ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের পদচ্যুতির পর তাদের বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি 'মুসাদেরীন' নামে পরিচিত হতো।[১৬২]

৭. উপঢৌকন ও অন্যান্য উৎস

উমাইয়্যাদের ন্যায় আব্বাসীয়গণও পারস্যের সাসানীয়দের অনুকরণে নওরোজ ও মিহিরজান উৎসবের সময় উপঢৌকন আদায় করতেন। এটা রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে গণ্য করা হতো। খলিফাদের পক্ষ থেকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণও উপঢৌকন আদায় করতেন। চারণভূমি, জনসাধারণের ব্যবহৃত রাস্তাঘাট, খোলা জায়গায় নির্মিত দোকানপাট, যানবাহন, বিলাসদ্রব্য, কল-কারখানা, টাকশাল এবং আমদানি দ্রব্যের ওপর সাম্রাজ্যের সর্বত্র কর ধার্য করা হতো। বিদেশি শক্তির কাছ থেকে সন্ধিমূলে প্রাপ্ত এবং রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন ভূ-সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় আব্বাসীয় খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৬৩]

রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ

আব্বাসীয় শাসনামলে ইরাকের নিম্নাঞ্চল 'আস-সাওয়াদ' থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ এবং 'খোরাসান' থেকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার দিরহাম। সমগ্র প্রদেশ থেকে নগদ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটি ১৯ লক্ষ ২৯ হাজার। খলিফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)-এর রাজত্বকালে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ 'আস-সাওয়াদ' থেকে নগদ ও মালামালসহ ১ কোটি ৫০ লক্ষ ২০ হাজার দিরহাম, 'খোরাসান' থেকে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ এবং মিশর থেকে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯০ হাজার। খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহের সময়ে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ২৯ কোটি

---

১৬২. মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

৯২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৩ শত ৪০ দিরহাম। খলিফা আল-মানসুরের মৃত্যুর আগে রাজকোষে ৬ লক্ষ দিরহাম মজুদ ছিল। আর খলিফা হারুন-অর-রশীদের মৃত্যুর সময় রাষ্ট্রীয় সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১০ কোটি দিরহাম।[১৬৪]

চাষাবাদ

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী কৃষিপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার ফলে এ আমলে দেশে চাষাবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত 'আস-সাওয়াদ' ছিল পলিসমৃদ্ধ সমভূমি অঞ্চল যেখানে প্রচুর চাষাবাদ হতো। তাছাড়া নীতিগতভাবে বিজিত রাজ্যগুলোর সমস্ত জমির মালিক হতো মুসলিম সম্প্রদায়। বিজিত রাষ্ট্র থেকেও রাজস্ব আদায় করা হতো। আব্বাসী যুগে কার্যত নিম্নোক্ত ছয় প্রকার জমির মালিকানা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল-[১৬৫]

১. খলিফার ব্যক্তিগত জমি: যেসব জমি খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হতো, সেসব জমির ওপর যাকাত ও উশর ব্যতীত রাষ্ট্রকে অন্য কোনো কর প্রদান করতে হতো না।

২. সামরিক বাহিনীর জমি: যেসব জমি সৈন্যদের সামরিক কাজের জন্য দেওয়া হয়। এগুলো হতে রাষ্ট্র কর লাভ করত।

৩. পতিত জমি: খলিফার অধিনস্থ পতিত জমি, যেগুলো খলিফা ইচ্ছামতো দান বা বণ্টন করতে পারতেন।

৪. হস্তান্তরিত জমি: যেসব জমির মূল মালিককে অপসারণ করে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল। এ ধরণের জমির মালিকগণ কেবল যাকাত প্রদান করত; জমির বিপরীতে অন্য কোনো কর প্রদান করতে হতো না।

৫. পুন:হস্তান্তরিত জমি: যেসব জমির পূর্বতন মালিক পুনরায় ফিরে এসেছিল অথবা যাদের উচ্ছেদ করা হয়নি, ইসলাম গ্রহণ করার পরও তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ভূমিকর প্রদান করতে হতো।

৬. বিশেষ চুক্তিভিত্তিক জমি: যেসব জমির মালিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ চুক্তি বিদ্যমান ছিল, তারা নির্ধারিত পরিমাণ কর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদান করত।

---

১৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

১৬৫. Yahya Armajani, *Middle East Past and Present,* p. 84

প্রাথমিক আব্বাসীয় খলিফাগণ কৃষিকাজকে উৎসাহিত করার ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। এজন্য তাঁরা সক্রিয়ভাবে খাল ও জলাশয় খনন এবং সেতু নির্মাণ করেছিলেন। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী জমিগুলো আব্বাসীয় রাজ্যের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি ছিল। খাল ও ড্রেনের সংযোগ জমিগুলোকে অত্যন্ত উর্বর করে তুলেছিল। ফলে সেখানে অসংখ্য খামার এবং বাগান গড়ে উঠেছিল। গাছপালা, ফসল এবং সবুজের প্রাচুর্য্যের কারণে এগুলো 'আরদুস সাওয়াদ' (সাওয়াদের ভূমি) নামে পরিচিত ছিল। আস-সাওয়াদের দুই দিকে সীমানা ছিল: 'মসুল' থেকে 'আবাদান' পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এবং আল-কাদিসিয়ার 'আল-আদাইব' থেকে পশ্চিমে 'হুলাওয়ান' পর্যন্ত বিস্তৃত।[১৬৬] খলিফাদের নজরদারির ফলে এসব কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল যথেষ্ট উন্নত হয়ে উঠে। ইউফ্রেটিস নদী থেকে পুরানো খালের সংস্কার এবং নতুন খাল খনন করে উন্নত সেচব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এসময় প্রথম যে বড় খালটি খনন করা হয়েছিল তার নাম দেওয়া হয় 'নাহর ইসা'। খলিফা আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) এক আত্মীয় এ খালটি খনন করেছিলেন। খনন করে খালটির সাহায্যে বাগদাদের দিকে ট্রাইগ্রিসের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম দিকে আল-আনবারকে সংযুক্ত করা হয়। এরপর দ্বিতীয় যে বৃহৎ খালটি খনন করা হয় সেটির নাম ছিল 'নাহর সারসার'। এ খালটিকে 'আল-মাদাইন' হয়ে টাইগ্রিসে প্রবেশ করানো হয়। তৃতীয় খালটির নাম ছিল 'নাহর আল-মালিক'। এটি আল-মাদাইনের নিম্নমুখে টাইগ্রিস পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস ছাড়াও 'নাহর কুথা' এবং 'বৃহৎ সারা' নদীদ্বয় সেচকাজের মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে এ দু'টি নদী থেকেও একাধিক খাল খনন হয়।[১৬৭]

শিল্প-বাণিজ্য

প্রাথমিক আব্বাসীয় খলিফাগণ শিল্প-বাণিজ্যের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। তাঁরা ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহারে মনোনিবেশ করেছিলেন। পারস্য এবং খোরাসানের খনি থেকে তাঁরা রূপা, তামা, সীসা এবং লোহা উত্তোলন করতেন। বৈরুতের লোহার খনিগুলো ধাতব শিল্পের বিকাশকে সহজতর করেছিল। আব্বাসীয়রা 'তাবরিজ' থেকে মৃৎশিল্প এবং মার্বেল, উত্তর পারস্য থেকে লবণ এবং সালফার এবং 'জর্জিয়া' থেকে বিটুমিন এবং তেল উত্তোলন করতেন। খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহের (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) শাসনামলে 'বসরা' নগরী সাবান ও কাঁচ শিল্পের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠে। তিনি

---

১৬৬. মাহবুবুর রহমান, *মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯
১৬৭. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, p. 349

বাগদাদ, সামারা এবং অন্যান্য শহরে এ পণ্যগুলোর নতুন কারখানা স্থাপন করেন। তিনি মিশর থেকে দক্ষ কারিগর এনে কয়েকটি শহরে কাগজ কলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা দীর্ঘদিন ধরে কাগজ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ছিল। আব্বাসীয়রা পারস্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে সূচিকর্মের জন্য কর্মশালাও প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিমরা রেশম, সাটিন, ব্রোকেড এবং কার্পেট উৎপাদনে পারদর্শী ছিল। সিল্কশিল্প সেসময়ে বিশ্ব বাজারে অত্যন্ত সমাদৃত ছিল। দামেস্ক রেশম কাপড়ের জন্য পরিচিত ছিল, যা এখনও 'দামাস্ক' নামে পরিচিত এবং খোরাসানের শহরগুলো কার্পেট, পর্দা এবং বিভিন্ন ধরণের পশমী বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১৬৮]

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল অগনিত কুটির শিল্প। পশ্চিম এশিয়ায় কম্বল, সিল্ক, সুতো, উলবস্ত্র, সাটিন বস্ত্র, সোফা নির্মাণ শিল্প, কুশন আচ্ছাদন এবং পর্দা তৈরির কারখানা গড়ে উঠে। পাশাপাশি এ অঞ্চলেই আসবাবপত্র এবং রান্নার বাসনপত্রের কারখানা ছিল। পারস্য এবং ইরাকে মুসলমানগণ বহু তাঁতকল স্থাপন করে কার্পেট এবং কাপড় তৈরিতে শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। খলিফা আল-মুস্তাইন বিল্লাহের (৮৬২-৮৬৬ খ্রি.) মা একবার নিজের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন পাখির স্বর্ণখচিত নকশা দিয়ে একটি কম্বল তৈরি করেন; যার মূল্য ছিল প্রায় ১৩ কোটি দিরহাম।[১৬৯]

পৃথিবীর প্রথম কাঁচ শিল্প গড়ে উঠে মিশরে। মিশরের কাঁচ স্বচ্ছতায় এবং সূক্ষ্মতায় ছিল প্রবাদপ্রতিম। সিরিয়ার কাঁচ শিল্পও নানা ধরণের কাঁচ তৈরিতে বিখ্যাত হয়ে উঠে। ফলে ইউরোপের গির্জাগুলোতে সাজসজ্জার জন্য সিরিয়া থেকে কাঁচ আমদানি করা হতো। বিভিন্ন মসজিদ এবং প্রাসাদে সিরিয়ার কারুকার্য খোদিত নানা রঙের কাঁচের ব্যবহার দেখা যেত। তাছাড়া সেসময়ে দামেস্ক ছিল উন্নতমানের মোজাইক তৈরির কেন্দ্র। প্রাচীন এ শিল্প দামেস্কে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত টিকে ছিল।[১৭০]

এছাড়া অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময় চীন থেকে সমরকন্দ হয়ে কাগজনির্মাণ শিল্প আরবদেশে প্রবেশ করে। সমরকন্দে তৈরি কাগজ সেসময়ে অতুলনীয় বলে বিবেচিত হতো। ৭০৪ খ্রিস্টাব্দে আরবগণ সমরকন্দ দখল করার ফলে কাগজশিল্পও তাদের দখলে আসে। ওই শতকের বিদায় মুহূর্তে বাগদাদে প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ৯০০ খ্রিস্টাব্দে মিশরে, ১১০০ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোয় এবং ১১৫০

---

১৬৮. ড. হাসান ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪
১৬৯. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, p. 345
১৭০. ibid, p. 346

খ্রিস্টাব্দে স্পেনে কাগজকল স্থাপিত হয়। এসব কাগজকলে সাদা, রঙ্গিন এবং নানারকম কাগজ তৈরি হতো।[১৭১]

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের মূল্যবান ধাতু সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল খোরাসান । এখানেই স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান পাথর এবং অভ্র সরবরাহ করে পণ্যশিল্পের প্রসার ঘটিয়েছিল। সেসময়ে বাহরাইন থেকে মুক্তা, লেবানন থেকে লোহা, তিবরিজ থেকে মার্বেল পাথর ও চিনামাটি এবং ইস্পাহান থেকে পাওয়া যেত নীলাভ সাদা রঙের এক প্রকার মূল্যবান পাথর। এছাড়াও জর্জিয়া বিটুমিন এবং সিরিয়া-প্যালেস্টাইনে মার্বেল পাথর এবং গন্ধকের প্রাচুর্য ছিল।[১৭২]

আব্বাসী যুগে বাগদাদ, বসরা, সিরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে বেশ তৎপরতার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বাগদাদের বন্দরে চীনা জাহাজগুলোর আনাগোনা ছিল অতি সাধারণ দৃশ্য। এক প্রান্ত হতে আরেক প্রান্তে উৎপদিত দ্রব্য বণ্টনের জন্য সাম্রাজ্যের চারদিকে প্রশস্ত রাস্তাঘাট ছিল। কাফেলার মাধ্যমে চাউল, কাপড়, পশম, মুক্তা, কাঁচ, ধাতবদ্রব্য, ফল, সুগন্ধী, মার্বেল, কার্পেট, টেবিল, কুশান, রান্নার পাত্র, ট্রে-গামলা, ঔষধ এবং অন্যান্য অসংখ্য দ্রব্যাদি বহন করে শহরে আনা হতো। একমাত্র দক্ষিণ ইউরোপ ব্যতীত বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল অতি লাভজনক। চীনে মুসলমানগণ একটি ব্যবসায়ী কলোনী স্থাপন করে সেখান হতে চীনাপাত্র ও পশমি কাপড় আমদানি করত। ভারতবর্ষ হতে তারা মসলা ও রং আমদানি করত। রাশিয়ার সাথে তারা উলের ব্যবসা করত এবং আফ্রিকার সাথে হাতির দাতের ব্যবসা করত। রাশিয়া ও জার্মানিতে আব্বাসীয় মুদ্রা আবিষ্কার একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসার সাক্ষ্য বহন করে। এমন একটি লাভজনক বাণিজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নানাবিধ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করতে হয়। বাহরাইনের মুক্তা, ইয়েমেনের ইস্পাত-তরবারী, কাশানের টালি এবং ইরানের কম্বল ছিল বিশ্ব বিখ্যাত। তবে সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ছিল সামগ্রীকভাবে কৃষিভিত্তিক। প্রথমদিকের আব্বাসীয় খলিফাগণ এবং বিশেষত বারমাকীয়গণ ইরাক, খোরাসান এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে বাধ, খাল, পানি সরবরাহের কূপসমূহ নির্মাণ করেন। চাষযোগ্য জমিগুলো উর্বর হওয়ার কারণে তারা অধিক পরিমাণে গম, চাউল,

---

১৭১. ibid, p. 347
১৭২. ibid, pp. 348-349

খেজুর, সুতা, ফল, সুপারি, কমলা, তরমুজ ও তরি-তরকারি উৎপন্ন করে রপ্তানী করত। উপরন্তু সাম্রাজ্যের অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হিসেবে ক্রীতদাস প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল।[১৭৩]

ব্যয়ের খাতসমূহ

উপরোক্ত উৎসগুলো থেকে সংগৃহীত অর্থ রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যয় করা হতো। বিচারক, গভর্নর, সৈনিক, শ্রমিক, কোষাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য কর্মচারীদের বেতনও এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হতো। পাশাপাশি খাল ও নদী খনন, গতিপথ মেরামত এবং মুশরিক বন্দীদের খাদ্য, পানীয়, পোশাক এবং মৃত ব্যক্তিদের দাফন, সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়, পণ্ডিত ও লেখকদের উপহারসহ বিভিন্ন অনুদানের খরচও এ অর্থ থেকে পরিশোধ করা হতো।[১৭৪] এছাড়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়-খাতের দু'টি ছিল রাজপ্রাসাদ পরিচালনা এবং রাজকীয় দেহরক্ষীর জন্য খরচ।

আব্বাসী যুগের প্রথম দিকে রাষ্ট্রীয় সম্পদের বৃদ্ধির কারণ হিসেবে বলা হয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খলিফাদের আগ্রহ, সম্পদ বৃদ্ধিতে তাদের কর্মতৎপরতা, কৃষি, বাণিজ্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়ে তাদের মনোযোগ, ঠিক যেমন আধুনিক যুগের রাষ্ট্র প্রধানরা করেন।[১৭৫] যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্থিতি নির্ভর করে মূলত সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের ওপর। আব্বাসীয় শাসনামলে এ তিনটি বিভাগই ছিল যথেষ্ট সুসংগঠিত ও সমৃদ্ধ। এসময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য আটলান্টিক মহাসাগর হতে সুদূর সিন্ধু পর্যন্ত এবং কাস্পিয়ান সাগর হতে নীলনদ পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল। এ বিশাল সাম্রাজ্যের শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামোর বাস্তবস্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল অনিন্দ্যসুন্দর বাগদাদ নগরী। ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ নগরীটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই গোটা পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

---

১৭৩. Yahya Armajani, *Middle East Past and Present,* pp. 85-86; Philip K Hitti, *History of the Arabs,* p. 350-352

১৭৪. ড. হাসান ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

পাচীন বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতিতে রোমানদের অবদান ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের পতনের পর বিশ্ব ইতিহাসে কোথাও আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটতে দেখিনি। চীন এবং ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু কিছু শাখায় যেমন নীতিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসাশাস্ত্র কিছুটা অগ্রগতি হলেও কুসংস্কার এবং অবাস্তব বিশ্বাসের ফলে এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে মুসলিম সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল আরবে। ইসলাম আরবদের মধ্যে যে উন্নত মানসিক চেতনার সৃষ্টি করে মূলত তা ছিল ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ফল। আর ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল জ্ঞানার্জন। হযরত মুহাম্মদ (স.) মসজিদকে শিক্ষার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছিলেন। যা পরবর্তী সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করে ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া। মুসলিম সমাজে উমাইয়্যা আমলেও এ ধারা অব্যাহত থাকে। তবে আব্বাসী আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় মুসলমানরা আরও বেশি সুযোগ পায়। এসময়ে ছাত্রদের সুপ্ত কর্মদক্ষতাকে জাগিয়ে তোলা হয় ও তাদের অন্তর্নিহিত প্রতিভাকে কাজে লাগানো হয়। যাতে তারা নৈতিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম হয়।[১৭৬] উমাইয়্যা যুগ ছিল রাজ্য জয়ের যুগ এবং আব্বাসীয় যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। এসময়ে মুসলমানরা কৃষ্টি, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের দ্বারা বিশ্ব সভ্যতার শিখরে আরোহণ করেন। মূলত আব্বাসীয় খলিফাদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন, সেজন্য এ যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অবিহিত করা হয়।

আব্বাসী খেলাফতের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত কাঠামোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না, তবে জ্ঞান চর্চার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গন ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান ভিত্তি ছিল মক্তব। এসময়ে মক্তবগুলোতে কুরআন মাজিদ শিক্ষার পাশাপাশি আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, ছন্দ ও দৈনন্দিন ধর্মীয় ব্যবহারিক বিষয়সমূহের মৌলিক পাঠদান করা হতো। একই সাথে আরবী হস্তলিপি, হিসাব বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ ও কবিতা

---

১৭৬. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফাত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

শেখানো হতো।[১৭৭] এ যুগে শিক্ষার দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি ছিল মসজিদ কেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতি-যা জ্ঞানচর্চার সর্ববৃহৎ ক্ষেত্র ছিল। সেসময়ে মসজিদ শুধু উপাসনালয় ছিল না, নামায আদায় ও বিচারকার্য পরিচালনার পাশাপাশি সেখানে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডও সম্পন্ন হতো। এখানে ধর্মীয় শিক্ষাসহ বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দারস-তাদরিসের মজলিস চালু ছিল। মিশর, বসরার ও মক্কা ও মদীনার প্রভৃতি মসজিদ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকাই পালন করত।[১৭৮] এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিস্তারের সাথে সাথে হালকায়ে দারস (حلقات الدروس)-এর সংখ্যা ও বৈচিত্র বৃদ্ধি পায়। এসব হালকাগুলোতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা আবৃত্তি করা হতো।[১৭৯]

আব্বাসীয় আমলে জ্ঞান চর্চার তৃতীয় মাধ্যম ছিল বিতর্কসভা (مجالس المناظرة)। মসজিদে খলিফা এবং অন্যান্য অভিজাত ব্যক্তির প্রাসাদগুলোতে খলিফা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আলীম-ওলামার মধ্যে বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হতো। বিভিন্ন উপলক্ষে ফিকহ, ব্যাকরণ, ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বিতর্কসভার আয়োজন করা হতো। জ্ঞানমনস্কতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কারণেই সে যুগে এ ধরণের বিতর্কসভার প্রবল আকর্ষণ ছিল। অবশ্য খলিফাদের নৈকট্য লাভ, অর্থ ও যশ প্রাপ্তিও ছিল বিতর্কসভা অনুষ্ঠানের বড় আকর্ষণ। খলিফা ও আমীর-ওমারা জ্ঞান চর্চায় প্রত্যক্ষ অংশ নিতেন, মতামত প্রদান করতেন এবং পক্ষে-বিপক্ষে সমর্থন যোগাতেন, ফলে উভয় পক্ষের বিতার্কিকগণ যশ ও জয়লাভের আশায় ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। আব্বাসী খলিফাদের মধ্যে আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) বিতর্কসভার প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। তাঁর উদ্যোগে বহু বিতর্কসভা অনুষ্ঠিত হতো। তিনি নিজেও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ফকিহ, মুতাকাল্লিম, ভাষাবিদ, সাহিত্যবিশারদ ও অন্যান্য বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতদের ডেকে তাঁর দরবারে সভাসদের মর্যাদায় ভূষিত করতেন এবং তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন।[১৮০] এ ধরণের মজলিস ও বিতর্কসভা জ্ঞানগত সমৃদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। কেননা এর মাধ্যমে

---

১৭৭. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফাত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮

১৭৮ . আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১৭৯ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

আলীম-ওলামা, চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত রাখতেন। তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের সামগ্রীক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান আহরণে আরো বেশি উদ্যোগী হতেন, যাতেকরে বিতর্কসভার দূরদর্শী ও নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের ভাবমূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন।[১৮১]

আব্বাসীয় শাসনামলে জ্ঞান চর্চার চতুর্থ ক্ষেত্র ছিল সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারসমূহ। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য গ্রন্থাগার বিদ্যমান ছিল। সুরিয়ানীদের অন্তত পঞ্চাশটি বিদ্যালয় ছিল, যেগুলোতে সুরিয়ানী ও গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হতো। তন্মধ্যে রাহা, কিন্নাসিরীর ও নাসীবীন-এর বিদ্যালয়গুলো প্রসিদ্ধ ছিল যেগুলোর সাথে একটি করে গ্রন্থাগারও থাকতো।[১৮২] আল-ফিহরস্ত গ্রন্থের প্রণেতা ইবনে নাদিম বলেন, 'আবু মা'শার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'اختلاف المزيجات'-এ লিখেছেন: জ্ঞান ভাণ্ডার সংরক্ষণ করা, কালের ছোবল থেকে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সব ধরণের বিপদাপদ থেকে সেগুলোকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে পারস্য সম্রাটদের উদ্যোগ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। তাঁরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান ও আন্তরিক ছিলেন। উপরন্তু পচন ও বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রন্থগুলোর অনুলিপি তৈরি করা হতো খুনদুক গাছের ডালে; যা 'তুস' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে ভারতীয় ও চৈনিকরা মূলত তাঁদেরও অনুসরণ করেছে।[১৮৩] উমাইয়্যা আমলে এসকল গ্রন্থের পরিমাণ এতটা ছিল না, যা কোনো বড় গ্রন্থাগারের রূপ নিতে পারে। কিন্তু আব্বাসীদের অভ্যুদয়ের পর মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদকরণ কর্মক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু হলে কাগজ শিল্পও প্রসার লাভ করে। সেই সুবাদে জ্ঞানপিপাসু উলামা ও সাহিত্যিকগণ এমন একটি সুন্দর সুযোগ পায়, যেখান থেকে তাঁরা তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। তখন থেকেই প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থাগার গড়ে ওঠতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে যুগের যেসমস্ত গ্রন্থাগারের তালিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে 'বাইতুল হিকমাহ' বা 'খাজানাতুল হিকমাহ' সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার ছিল।[১৮৪]

আব্বাসীয় যুগের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ইত্যাদি স্তর-বিন্যাসের অস্তিত্ব ছিল না। সেসময়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা একটা একক সত্তায় আবদ্ধ ছিল, যা শুরু হতো মক্তব কিংবা গৃহ শিক্ষকের

---

১৮১. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
১৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
১৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

হাতে এবং শেষ হতো মসজিদের হালকায়। যদিও বিভিন্ন প্রতিকূল কারণে অনেকের শিক্ষা অর্ধপথে কিংবা চতুর্থাংশ পথে এসে থেমে যেতো এবং স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীই শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হতো। একদল মক্তবে লেখাপড়া শিখে, পবিত্র কুরআনের সহজসাধ্য কিছু অংশ মুখস্থ করে এবং সেই সাথে দীনের বিভিন্ন জরুরী মাসায়েল আয়ত্ত করে শিক্ষা জীবনের ইতি টানতো। অতঃপর জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবসা কিংবা অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত হতো। আরেকদল বিভিন্ন শায়খের সঙ্গ ধরে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করতো। এমনকি তারা এক শহর থেকে অন্য শহরে গিয়েও জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করতো। এভাবে একসময় তারা জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা অর্জন করতো এবং নিজেরাই বিভিন্ন হালকাতে শিক্ষা দেওয়া শুরু করতো। যদিও তারা নির্দিষ্ট কোনো পাঠ্যসূচি অনুসরণ করতেন না কিন্তু প্রত্যেক শায়েখের ছিল স্বতন্ত্র শিক্ষাদান পদ্ধতি।[১৮৫]

বর্তমান সময়ে যেমন শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে সবাইকে সনদ প্রদান করা হয়, সেযুগে এ ধরণের পরীক্ষার প্রচলন ছিল না। যেসকল ছাত্র উচ্চস্তরের পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী পড়াশুনার পর সাফল্য অর্জন করতো শুধু তাদেরকে 'ইজাজা' বা সদন দেওয়া হতো। কোনো শিক্ষার্থী ইলম শিক্ষা দানের মত আত্মবিশ্বাস অর্জন করলে স্বতন্ত্র মজলিসে বসে যেতো এবং আলীম-উলামার সাথে আলোচনা ও বিতর্কে অংশ নিতো। এভাবে তার যোগ্যতা কিংবা অযোগ্যতা সম্পর্কে তৎকালীণ বিদ্বান সমাজ একটা বাস্তব ধারণা লাভ করতেন।[১৮৬]

পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা বিভিন্ন ভাষায় মানুষের জ্ঞানের যেসব দিক সংরক্ষিত ছিল, আরবরা তাই প্রথমদিকে অনুবাদের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন। এ অনুবাদের পাশাপাশি এসেছে তাদের মৌলিক জ্ঞানচর্চার কাল। চিকিৎসা এবং দর্শনশাস্ত্রের চেয়ে রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোলশাস্ত্র এবং গণিতশাস্ত্রেই তাদের অবদান অধিকতর মূল্যবান। আইন, ধর্মতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বেও তারা মৌলিক চিন্তা এবং গবেষণার ছাপ রেখে গেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের এ অনুবাদ এবং মৌখিক গবেষণা সিরিয়া, স্পেন ও সিসিলীয়দের মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করে মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপকে আলোকিত করেছিল।[১৮৭]

---

১৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

১৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮; Philip K Hitti, *History of the Arabs*, p. 410

১৮৭. মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান চর্চার অন্যতম আরেকটি মাধ্যম ছিল জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের দেশ থেকে দেশান্তরে পরিভ্রমণ। সেসময়ে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের সন্ধানে দূর-দূরান্তের কষ্টকর ভ্রমণের প্রতি মানুষের গভীর অনুরাগ ছিল। এভাবে ভাষা বিশারদগণ ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বেদুঈন পল্লী সফর করতেন। হাদীস বিশারদগণ হাদীস সংগ্রহ ও লেখার উদ্দেশ্য বিভিন্ন শহরে গমন করতেন। সাহিত্য প্রেমিকরা প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের কাছ থেকে সাহিত্যের দুর্লভ সম্পদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছুটে যেতেন। দর্শনশাস্ত্রের অনুরাগীরা গ্রীক গ্রন্থরাজি অনুবাদের জন্য কন্সটানটিনোপল ও অন্যান্য শহর সফর করতেন।[১৮৮]

খলিফা আল-মুতাওক্কিল বিল্লাহের (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) সময় পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি, বরং এ ধারার প্রচলন হয় পরবর্তী যুগে। ঐতিহাসিক জাহাবির (১২৭৪-১৩৪৮ খ্রি.) মতে সেলজুকীদের পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী নিজামুল মুলক্ (১০১৮-১০৯২ খ্রি.) প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। তিনি বাগদাদ, বলখ, নিশাপুর, হিরাত, ইস্পাহান, বসরা, মার্ভ, তাবারিস্তান ও মুসল শহরে একটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তবে ও আস-সুয়ুতীসহ (১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.) প্রমুখ ঐতিহাসিকদেরর মতে নিজামুল মুলকের জন্মের পূর্বে নিশাপুরে 'المدرسة البيهقية' (মাদ্রাসাতুল বায়হাকিয়্যাহ) নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। সুলতান মাহমুদের (৯৭১-১০৩০ খ্রি.) ভাই আল-আমির নসর বিন সুবুক্তগীন (৯৪০-৯৯৭ খ্রি.) নিশাপুরে 'المدرسة السعدية' (মাদ্রাসাতুস সায়াদিয়্যাহ) নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন।[১৮৯] ঐতিহাসিক আল-মাকরিযীর (১৩৬৪-১৪৪২ খ্রি.) মতে, খলিফা আল-মু'তাজিদ বিল্লাহ (৮৯২-৯০২ খ্রি.) বাগদাদের শাম্মাসিয়াতে (الشماسية) তার নির্মিতব্য প্রাসাদের সন্নিকটে তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক ও যাবতীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে পরবর্তীতে এর প্রতিটি বিভাগের জন্য বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করা হয় এবং সেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দনীয় বিভাগে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়।[১৯০]

---

১৮৮. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
১৮৯. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম* (কায়রো: মাকতাবাতুল উসরা, ১৯৯৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯
১৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

আব্বাসী যুগে খলিফা ও রাজন্যবর্গের দূরদর্শী পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানচর্চার এক সুবিশাল পরিমণ্ডল গড়ে উঠে। বিশেষত 'বাইতুল হিকমাহ'-এর মতো বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁরা সাম্রাজ্যব্যাপী ইসলামী শিক্ষার বিস্তারকে ত্বরান্বিত করেন। এর ফলে মুসলিম মানসলোকে সূচিত হয় এক নব-জাগরণ, গবেষণা ও সৃজনশীলতার এক স্বর্ণালী অধ্যায়। এ যুগে ইসলামী শিক্ষার নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ ছিল উল্লেখযোগ্য-

علم التفسير (তাফসিরশাস্ত্র)

মহান আল্লাহ মানবজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, পারিবারিকসহ সকল সমস্যা সমাধানের জন্যই পবিত্র আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আল-কুরআন এমন এক আসমানী বাণী যা অজানাকে জানার এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল তথ্যের এক বিপুল সমাহার। পবিত্র আল-কুরআন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। কেননা এতে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৭৫৬টি আয়াত এবং পরোক্ষভাবে অগণিত আয়াত বিজ্ঞান চর্চা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। এ মহাগ্রন্থে এমন অনেক শব্দ ও বাক্য রয়েছে যেগুলোর শাব্দিক অর্থ ও বাক্যের বিণ্যাসগত অর্থ সাধারণভাবে বোধগম্য নয় বরং এগুলো প্রকৃত অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের জন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। পবিত্র আল-কুরআনের এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিষয়কেই তাফসির বলা হয়।

তাফসির (تفسير) আরবী শব্দ, এটি একবচন; বহুবচনে তাফারসীর (تفاسير)। তাফসীর (تفسير) শব্দটি باب تفعيل-এর مصدر বা ক্রিয়ামূল। শব্দটি ফাসরূণ ' فسر ' কৃদন্তপদ থেকে নিস্পন্ন।[১৯১] এর আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ, ভাষ্য, তাৎপর্য, ব্যাখ্যা, তাফসির: পবিত্র কুরআনের ভাষ্য।[১৯২]

পবিত্র কুরআন মাজিদে কেবল একটি স্থানে তাফসীর (تفسير) শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন: আল্লাহর বাণী[১৯৩] ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

অর্থাৎ "তারা আপনার নিকট এমন কোনো সমস্যা উপস্থিত করে না, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি।"

---

১৯১. ইয়াকুব আল-ফিরুজাবাদী, *আল-ক্বমুসুল মুহিত* (বৈরুত: দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, ১৪১৩ হি./১৯৯০ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০

১৯২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭ খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২৫১।

১৯৩. সুরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৩৩

কারো কারো মতে, তাফসির (تفسير) শব্দটি সাফরুন (سفر) শব্দের পরিবর্তিত রূপ যার অর্থ উদ্ভাসিত হওয়া, প্রকাশ হওয়া, সুস্পষ্ট হওয়া, ঘোমটা খোলা, অনাবৃত করা, উদঘাটন করা। আরবী অভিধানে ফাসরুন (فسر) এবং সাফরুন (سفر) শব্দদ্বয় সমার্থক অর্থ দেয়।[১৯৪] যেমন: পবিত্র কুরআনে এসেছে-

والليل اذ ادبر. و الصبح اذآ اسفر. انها لاحد الكبر.

অর্থাৎ "শপথ রাতের, যখন তার অবসান ঘটে। শপথ প্রভাতকালের, যখন তা হয় আলোকোজ্জ্বল- নিশ্চয় এ জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম।"[১৯৫]

তাফসির (تفسير) হল এমন এক বিজ্ঞান, যাতে পবিত্র আল-কুরআনের শব্দাবলির প্রকাশভঙ্গি, গঠন প্রকৃতি, এর প্রকৃত ও ভাবার্থ, শব্দ ও বাক্যের যথার্থ বিন্যাস এবং মর্মার্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।[১৯৬]

পবিত্র আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে তাফসির (تفسير) সাহিত্যের সূচনা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পবিত্র কুরআন মাজিদের সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম মুফাসসির। পবিত্র আল-কুরআনকে জনসমুক্ষে তুলে ধরাই ছিল তার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। যেমন পবিত্র আল-কুরআনে এসেছে-

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم ولعلهم يتفكرونْ.

অর্থাৎ "(প্রেরণ করেছিলাম) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলিসহ এবং আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে ওরা চিন্তা করে।"[১৯৭]

পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হলেও আরবদের প্রত্যেকেই এর অর্থ ও বাক্য বিন্যাসের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হতো না। এজন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন হতো। এ মহাগ্রন্থটি বিভিন্ন উপলক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়া'লা নানাপ্রকার কর্তব্য ও নির্দেশ দিয়ে পরম্পরায় অবতীর্ণ

---

১৯৪. আল-রাগিব আল-ইসবাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফি গ'রিবিল কুরআন* (মিশর: মুসতাফা আল-বাবি আল-হালাবি, তা.বি), পৃ. ৩৮৭

১৯৫. সুরা আল-মুদাস্সির, আয়াত: ৩৩-৩৫

১৯৬. আবু হায়্যান আনদালুসি, *আল-বাহারুল মুহিত* (কায়রো: কাতবায়া'তুস সায়াসাহ, ১৩২৮ হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪

১৯৭. সুরা নাহল, আয়াত: ৪৪

করেছেন। এর মধ্যে অনেক নির্দেশ পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে ও অনেকগুলো পরে এবং এ পরবর্তীগুলো অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নির্দেশকে রহিত করেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব বিষয় তাদের জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতেন। তিনি সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিশদ করতেন, রহিতকারী ও রহিতকৃত বিষয়াদির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতেন এবং সাহাবীদেরকে তা বুঝিয়ে দিতেন। তাঁরা বুঝতে পারতেন এবং বিভিন্ন আয়াত অবতরণের কারণ ও এর যথার্থ উদ্দেশ্য তাঁর কাছ থেকে বর্ণনার মাধ্যমে জেনে নিতে সমর্থ হতেন।[১৯৮]

পবিত্র কুরআনের তাফসিরকে বিভিন্ন বিবেচনায় একাধিকভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগ হল বর্ণিত বিষয়াদি সম্বলিত তাফসির; যা পূর্বসূরিদের কাছ থেকে বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদের সমষ্টিমাত্র। এসব তাফসিরে মূলত কুরআনের রহিতকারী ও রহিতকৃত বিষয়াদি, অবতরণের কারণ ও বিভিন্ন আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং এসব বিষয় সম্পর্কীয় জ্ঞান একমাত্র সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে বর্ণনার মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। তাফসিরের দ্বিতীয় ভাগটি হল মূলত ভাষা সম্পর্কীয়। এতে শব্দার্থ, ইরাব (স্বরচিহ্ন), অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে যথানিয়মে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[১৯৯]

হযরত জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআনের যে আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি কেবল সেগুলোর ব্যাখ্যা করতেন। পরবর্তীতে সাহাবীরা বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা ও তাফসির করতে শুরু করেন। উমাইয়্যা যুগে তাফসিরের ক্ষেত্রে আলী বিন আবু তালিব (রা.), আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.), উবাই বিন কা'ব প্রমুখ সাহাবিগণ বিশেষ অবদান রেখেছেন। পরবর্তীতে তাবেয়ীগণ সাহাবিদের বর্ণিত যাবতীয় ব্যাখ্যা ও তাফসির শুধু সংরক্ষণ করেননি বরং তাদের অনেকেই কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের তাফসির এবং তা অবতরণের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করেন।[২০০]

আব্বাসীয় যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় তাফসির সাহিত্যের ব্যাপকতা লাভ করে। এসময়ের মুফাসসিরগণ তাফসিরকে হাদীসশাস্ত্র থেকে পৃথক করে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞানের রূপদান করার

---

১৯৮. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমাহ* (মিশর: মাইদানি আল-আজহারুল মুনির, তা.বি), পৃ. ৩০৬-৩০৭

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭-৩০৯

২০০. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

প্রক্রিয়া শুরু করেন। ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি আয়াতের সাথে তার ব্যাখ্যা ও তাফসির লিপিবদ্ধ করার আধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাবনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

আব্বাসীয় যুগে তাফসিরশাস্ত্রে যারা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুহাম্মাদ বিন জারীর আত-তাবারী (মৃ. ৩১০ হি./৯২৩ খ্রি.), তাঁর রচিত বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ 'জামি'উল বায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন' (جامع البيان في تفسير القرآن), আস-সমরকন্দী (৯৪৪-৯৮৩ খ্রি.)-এর বাহরুল উলুম (بحر العلوم), আহমাদ বিন ইবরাহিম আস-সা'লাবী (মৃ. ১০৩৫ খ্রি.) রচিত 'আল-কাশফু ওয়াল বায়ানু ফি তাফসিরিল কুরআন' (الكشف والبيان في تفسير القرآن), মাহমূদ বিন উমার আয-যামাখশারী (১০৭৫-১১৪৪ খ্রি.) কর্তৃক প্রণিত তাফসির গ্রন্থ 'আল-কাশশাফ আন হাক্বাইকিত তানযিল ওয়া উয়ুনিল আকাবিল ফি উজুহিত তাবিল' (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التاويل), ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযীর (১১৪৯-১২০৯ খ্রি.)-এর তাফসির গ্রন্থ 'মাফাতিহুল গয়ইব' (مفاتيح الغيب), কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বায়যাবী (মৃ. ১২৮২ খ্রি.) প্রণীত তাফসির গ্রন্থ 'আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তাবিল' (انوارالنتزيل وأسرارالتاويل)। আব্বাসীয় শাসনামলে প্রণীত প্রসিদ্ধ এ তাফসির গ্রন্থগুলো তাফসির সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছে।[২০১]

এসময়ে ভাষা বিষয়ক শাস্ত্রগুলো বিন্যস্ত হওয়ার ফলে তাফসির বিষয়ক বিভিন্ন মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় যা এ শাস্ত্রকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ব্যাকরণবিদগণ পবিত্র আল-কুরআনকে তাদের নিয়ম-কানুন তৈরি ও প্রয়োগের অন্যতম ক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করেন এবং আয়াতগুলোর ব্যাকরণিক বিশ্লেষণ করা শুরু করেন, যা তাফসিরের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়।[২০২]

علم الحديث (হাদীসশাস্ত্র)

মহান আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করে তাদের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির নিমিত্তে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল পথনির্দেশনা দিয়েছেন। আর এ পথনির্দেশার প্রধান উৎস দু'টি; পবিত্র আল-কুরআন ও হাদীস। কুরআন মাজিদ ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূলনীতি আর হাদীস তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। আল্লাহ্ তা'লার পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব যেমন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও বাস্তব

---

২০১. ড. মুহাম্মাদ হুসাইন আজ-জাহাবি ও অন্যান্য, *মু'জামু তাফসিরিল কুরআনিল কারিম* (রাবাত: আইসেসকো: মানশুরাতুল মানজুমাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২০৮-২১৩

২০২. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬

অনুসরণ ছাড়া সম্ভব নয়, তদ্রুপ হাদীস বাদ দিয়ে দৈনন্দীন জীবনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাও সম্ভব নয়। এ কারণে ইসলামী শরিয়তে আল-কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় সাহাবিগণ তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এ মহারত্ন হাদীস আহরণ ও সংরক্ষণে মশগুল থাকতেন। অনেকেই তাদের সমস্ত জীবনপর্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাঁরা আল-কুরআনের বাণীকে মুখস্থ ও লিখে সংরক্ষণ করার পাশাপাশি মুহাম্মদ (সা.) থেকে প্রাপ্ত হাদীস মুখস্থ করতেন এবং বিভিন্নভাবে সেগুলো লিখে রাখতেন। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে আল-কুরআন ও হাদীসের সংমিশ্রণের আশংকায় সাহাবিদের হাদীস লিখে রাখতে নিষেধ করেন।[২০৩] হাদীসে এসেছে-[২০৪]- لا تكتبوا عني ، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه.

"তোমরা আমার থেকে কিছু লিখনা। আর যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে আল-কুরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখেছে সে যেন তা মুছে দেয়।"

তবে পরবর্তীসময়ে মহানবী (স.) হাদীস লিখে রাখার অনুমতি প্রদান করলে সাহাবিগণ তা অতি যত্নসহকারে লিখে রাখতেন, যা তাঁর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগেও অব্যহত ছিল। মূলত উমাইয়্যা আমলে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং আব্বাসীয় আমলে এসে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ যুগের পূর্বকালে প্রধানতম বিষয় ছিল হাদীস সংকলন। সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে এবং পরবর্তীতে সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে হাদীস সংকলনের বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের পক্ষেই সকলে একমত হয়। ওমর বিন আবদুল আজিজ (৬৮২-৭২০ খ্রি.) এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযমকে এ মর্মে ফরমান লিখেন:[২০৫]

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته فاكتبه ، فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء.

অর্থাৎ "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও কর্ম অনুসন্ধান পূর্বক সেগুলো লিপিবদ্ধ করো-কেননা আমার আশংকা হয় যে, আলীমদের অন্তর্ধানের সাথে সাথে ইল্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

---

২০৩. ড. সুবহি সালিহ, *উলুমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালায়িন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২০
২০৪. ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২২
২০৫. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

এছাড়াও উমারাহ বিনতে আবদুর রহমান আনসারী এবং কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকরের কাছে যা আছে তা সংগ্রহ করে লিখিত আকারে তার কাছে পাঠানোর জন্য আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযমকে তিনি নির্দেশ দেন।[২০৬]

আব্বাসীয় যুগের অভ্যুদয়ের পর দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে অন্যান্য শাস্ত্রেও ন্যায় হাদীস সংকনের কাজও শুরু হয়। যেমন মক্কায় রোম বংশোদ্ভূত ইবনে জুরাইজ (মৃ. ১৫০ হি.), মদীনায় মুহাম্মদ বিন ইসহাক (মৃ. ১১৫ হি.) ও মালিক বিন আনাস (মৃ. ১৭৯ হি.), বসরায় রাবি বিন সাবিহ (মৃ. ১৬০ হি.), সাইদ বিন আবু আরুবাহ (মৃ. ১৫৬ হি.) ও হাম্মাদ বিন সালামাহ (মৃ. ১৭৬ হি.), কুফায় সুফিয়ান সাওরি (মৃ. ১৬১ হি.), সিরিয়ায় আওযায়ী (মৃ. ১৫৬ হি.), ইয়ামানে মা'মার (মৃ. ১৫৩ হি.), খোরাসানে ইবনুল মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.) ও মিশরে লায়িস বিন সা'দ (মৃ. ১৭৫ হি.) হাদীস সংকলনের কাজ করেন।[২০৭] আব্বাসী যুগের তৃতীয় শতকে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা ও তাদের বিশ্বস্ততা প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁরা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সনদের দুর্বলতা ও বিশুদ্ধতা নির্ধারণ এবং বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত যাচাই করে পক্ষে বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। তাই এ যুগটি হাদীস শাস্ত্রের স্বর্ণ যুগের মর্যাদা পেয়েছে। এ যুগের প্রখ্যাত হাদীস সংকলনগুলো হলো-

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল (মৃ. ২৫৬ হি./৮৭০ খ্রি.) সহিহুল বুখারী (صحيح البخاري), ইবনে হাজ্জাজ (মৃ. ২৬১ হি./৮৭৫ খ্রি.) আস-সহিহ লি-মুসলিম (الصحيح لمسلم), মুহাম্মদ বিন ইসা (মৃ. ২৭৯ হি./৮৯২ খ্রি.) সংকলিত জামিউত-তিরমিযী (جامع الترمذى), ইমাম আহমাদ বিন আলী (মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫ খ্রি.) সংকলিত সুনানে নাসায়ী (سنن النسائي), আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস (মৃ. ২৭৫ হি./৮৮৯ খ্রি.) সংকলিত সুনানে আবী দাউদ (سنن ابى داؤد), মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ (মৃ. ২৭৩ হি./৮৮৭ খ্রি.) সংকলিত সুনানে ইবনে মাযাহ (سنن ابن ماجه) ও আহমদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি./৮৫৫ খ্রি.) সংকলিত মুসনাদে আহমদ (مسند أحمد)। এগুলো হাদীসশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ

২০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
২০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

সংকলনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।[২০৮] এগুলো ছাড়া আব্বাসী যুগে আরো অনেক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়।

علم الفقة (আইনশাস্ত্র)

মুসলিম আইনশাস্ত্র মূলত পবিত্র আল-কুরআন এবং হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের এ আইনশাস্ত্রকে 'ফিকহ' বলা হয়। এতে ধর্মীয় এবং সামাজিক সব ধরণের বিধি-নিষেধই স্থানলাভ করেছে। এটি পবিত্র আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামি শরিয়তের বিধি-বিধান নির্ধারণের ব্যাপারে সূক্ষ্মদৃষ্টি ও গভীর জ্ঞান প্রসূত বিধানগুলোর সমষ্টি।

ফিকাহ্ হল বান্দাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট অবশ্য পালনীয়, নিষিদ্ধ, অনুমোদনযোগ্য, অপছন্দনীয়, বৈধ ইত্যাদি বিধানসমূহের সঠিক জ্ঞান লাভ করা। এগুলো কুরআন, হাদীস এবং ধর্মপ্রবর্তক প্রচলিত বিভিন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। বস্তুত অনুরূপ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধি-নিষেধকেই ফিকহ্ বলা হয়।[২০৯]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা আল-কুরআন মুখস্থ করেছিলেন এবং এর রহিতকারী ও রহিতকৃত, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক ও অন্যান্য সব নির্দেশাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেন তাঁরাই ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রদানের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। এগুলো তাঁরা স্বয়ং নবী (স.) অথবা তাঁর কাছে থেকে শ্রবণকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এসব কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে তখন 'ফকিহ্' ও 'আলীম' বলে ডাকা হতো।[২১০]

আব্বাসীয় শাসনামলেই ব্যাপকভাবে আইন ও বিচারশাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়। এর মধ্য দিয়ে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে একটি স্বনির্ভর বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠে। আল-কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে এ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের মর্মবাণী ও অনুশাসন ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আল-কুরআনে উদ্ধৃত ও হাদিসে বিশদভাবে বিশ্লেষিত মহান আল্লাহর বিধান ফিকহের মাধ্যমে জনগণের নিকট সহজেই তুলে ধরা হয়েছিল।[২১১]

---

২০৮. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০; আল-হাকিম আন-নিশাপুরী, *মা'য়ারিফাতু উলুমিল হাদীস* (কায়রো: মাতবায়াতু দারিল কুতুব, ১৯৩৭ খ্রি.), পৃ. ০৩

২০৯. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমাহ*, পৃ. ৩১২

২১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩

২১১. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফাত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

এ যুগের প্রথম দুই শতাব্দীকাল সময়কে عصر الاجتهاد (ইজতিহাদের যুগ) বলা হয়। এসময় গবেষণা প্রক্রিয়ায় ফিকহশাস্ত্র বিকশিত হয়। এ যুগে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চারটি মাজহাবের সৃষ্টি হয়। যাদের বিশ্লেষণে আইনশাস্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। প্রসিদ্ধ চারটি মাজহাবের মধ্যে একটি হল হানাফী মাজহাব। এ মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু হানীফা (৫০-১৫০ হি.)[২১২] এবং তাঁর নামানুসারে পরিচিত হয় হানাফী মাজহাব। তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন আইনশাস্ত্র অধ্যায়নে। আইন বিশ্লেষণে তিনি যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন তা সব মহলে স্বীকৃতির দাবি রাখে। এ মাজহাবকে আরো প্রণালিলব্ধ ও সংহত করেন আবু হানীফা-এর দুই বিশিষ্ট শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হি.)[২১৩] এবং মুহাম্মদ বিন হাসান আল-সায়বানী[২১৪] (মৃ. ৮০৫ খ্রি.)।[২১৫]

আব্বাসী শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম আরেকটি মাজহাব হল 'মালেকি মাজহাব'। এ মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম মালেক[২১৬] (৯৭-১৭৯ খ্রি.)। তিনি তার সমসাময়িক কালের হাদীসশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। আইনতত্ত্বে তার প্রধান গ্রন্থ 'আল-মুয়াত্তা'। এ গ্রন্থটি প্রকাশের পর থেকেই মালেকী মাজহাবের বিকাশ হয়। ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফার (৫০-১৫০ হি.) মতাদর্শে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে তিনি ব্যক্তিগত অভিমতের চেয়ে হাদীসের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়া মদীনায় প্রচলিত রীতি-নীতিগুলোকেও তিনি আইনের উপকরণ হিসেবে

---

২১২. ইমাম আবু হানীফা: তাঁর প্রকৃত নাম নুমান ইবন সাবিত ইবন যুতাই, উপনাম আবু হানীফা, পিতার নাম সাবিত-যিনি বনী তায়মুল্লাহ গোত্রের শাখা 'রাযীয়া'-এর জনৈক ব্যক্তির দাস ছিলেন। তিনি কুফায় ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'হানাফী মাযহাব' প্রবর্তন করেন, যার বৈশিষ্ট্য ছিল-কিয়াসকে উপলক্ষ করে আকল ও বুদ্ধির বহুল ব্যবহার। যুগশ্রেষ্ঠ এ ফিকহবিদ ১৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৭৭

২১৩. ইমাম আবু ইউসুফ: আরব বংশোদ্ভূত আবু ইউসুফ ১১৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার দাদা হলেন আনসারী সাহাবী সাআদ ইবন হাবতাহ। তিনি ইমাম হানীফা-এর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি খলিফা আল-মাহদী, আল-হাদি ও হারুন-অর-রশিদ-এর আমলে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। দ্র. *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

২১৪. মুহাম্মাদ বিন হাসান সায়বানী ইরাকের ওয়াসিয়াত-এ ১৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং কুফায় প্রতিপালিত হন। তিনি অল্প সময় ইমাম আবু হানীফার সংস্পর্শ লাভ করেন। ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর পর ইমাম আবু ইউসুফ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্য, ব্যকরণ, ভাষা, কবিতা, আল-কুরআন, হাদীস ও ফিকহ-এর মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। দ্র. *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

২১৫. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফাত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

২১৬. ইমাম মালিক: পুরো নাম মালিক ইবন আনাস আসবাহী মাদানী। তিনি ৯৩/৯৭ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। ফিকহশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরে 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটি সম্পাদনার কাজে ব্যয় করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি হাদীস ও ফিকহ উভয়ের যুগপাত অভিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

গ্রহণ করেন। তবে তিনি এগুলোর সমর্থনের প্রয়োজন মনে করতেন প্রামাণিক হাদীস দ্বারা। তিনি সহিহ হাদীস পরীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং সন্দেহমূলক হাদীস বর্জন করেন। [২১৭]

এ সময়ের প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় মাজহাবটি হল শাফী মাজহাব। এ মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ-শাফী (১৫০-২০৪ হি.)। তিনি মাত্র ৭ বছর বয়সে কুরআন মাজিদ এবং দশ বছর বয়সে ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটি মুখস্থ করেন। এছাড়া বিশ বছর বয়সে তিনি মদিনার ইমাম মালেকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি হানাফী পণ্ডিত মুহাম্মদ বিন হাসানের উদ্দেশ্যে ইরাক গমন করে এ অঞ্চলের ফিকহ ও আইনশাস্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। এছাড়া তিনি হানাফী মাজহাবের প্রখ্যাত মুহাম্মদ ইবনে সায়বানীর নিকট থেকেও হানাফী মাজহাবের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। ফলে তার নিকট হেজাজ ও ইরাক উভয় স্থানের ফিকাহ তথা মুসলিম আইনশাস্ত্রের সম্মিলন ঘটে।[২১৮]

আব্বাসীয় যুগে প্রতিষ্ঠিত চতুর্থ মাজহাবটি হল 'হাম্বলী মাজহাব'। নবম শতকে আব্বাসীয় খলিফা আল মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহের (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) রাজত্বকালে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, হাদীসের সুপণ্ডিত ও রক্ষণশীল আহমদ বিন হাম্বল (১৬০-২৪১ হি.) সুপ্রসিদ্ধ এ মাজহাবটি প্রতিষ্ঠা করেন। হাদীসের সর্বাত্মক ও সঠিক অনুসরণই তার প্রবর্তিত মাজহাবের মূলনীতি ছিল।[২১৯]

উল্লেখিত প্রসিদ্ধ চার মাজহাব ছাড়াও যারা মাজহাব প্রতিষ্ঠা করেন তাদের মধ্যে ইমাম আবু সুলাইমান দাউদ যাহিরী (মৃ. ২৭০ হি.), ইসহাক বিন রাহাওয়াহ (মৃ. ২৩৭ হি.), সুফিয়ান বিন উয়াইয়না (মৃ. ৩১০ হি.) এবং লাইস বিন সা'দ প্রমূখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে তাদের মাজহাবসমূহ কালের পরিক্রমায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

علم القاموس (অভিধানশাস্ত্র)

আব্বাসী যুগে আরবী ভাষা বিষয়ক ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব এবং এ তিনটির আধার অভিধানশাস্ত্রের মাধ্যমেই আরব মুসলমাদের ভাষা গবেষণা শুরু হয়। ফলে এ যুগে অভিধান রচনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং শাস্ত্রের অনেকগ্রন্থ রচিত হয়। সর্বপ্রথম অভিধান শাস্ত্র রচনা করেন খলিল বিন

---

২১৭. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফাত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১
২১৮. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯
২১৯. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফাত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

আহমাদ আল-ফারাহেদী (মৃ. ১৮০হি.)। তিনি আরবী বর্ণমালার উচ্চারণস্থল ক্রমানুসারে নিম্নরূপ তাঁর অভিধান বিন্যাস করেছেন:

ع-ح-ه-خ-غ- ق- ك-ج- ش- ض- ص- س- ز- ط - د - ث- ظ - ذ- ل - ن - ف - ب - م - و - ا - ى

অভিধান গ্রন্থটি প্রথম অধ্যায় 'আইন' (ع) ছিল বিধায় তার নামকরণ করা হয় 'কিতাবুল-আইন' (كتاب العين)।[২২০]

আব্বাসী যুগে অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আরবী শব্দমালা সংগ্রহ করে বর্ণনাক্রমিক সাজিয়ে অভিধানগ্রন্থে রূপ দেন। এ যুগে সম্পাদিত অন্যান্য অভিধানশাস্ত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

	অভিধান	**সংকলক/সম্পাদক**
১	তাহযীবুল লুগাহ	আবূ মনুসূর মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-আযহারী (মৃ. ৩৭০ হি./৯৪১ খ্রি.)
২	আল-বারিউ ও আল-আমালী	আবু আলী আল-কালী (মৃ. ৩৪৬ হি.)
৩	আল-জাম্হারাহ	ইবনে দুরাঈদ (মৃ. ৩২১ হি.)
৪	তাজুল লুগাহ ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যাহ ('সিহাহ' নামে পরিচিত)	আবু নাসর ইসমাঈল বিন হাম্মাদ আল-জাওহারী (মৃ.৩৯৩ হি.)
৫	আল্-মুজমাল	আহমাদ বিন ফারিস আর-রাযী (মৃ. ১০০৫ খ্রি.)
৬	আল্-খসায়িস	ইবনে জিন্নী (মৃ. ৩৯২ হি.)
৭	আল-মুহ্কাম ওয়াল-মুখস্সাস	ইবনে সীদাহ (মৃ. ৪৫৮ হি./১০৬৬ খ্রি.)
৮	কিতাবুল-মাকসুর ওয়াল-মামদুদ	আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-ওল্লাদ (মৃ. ৯৪৩ খ্রি.)
৯	আজ-জাম্রহ্	আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন মীকাল (মৃ. ৯২০ খ্রি.)
১০	আসাসুল বালাগাহ	মাহমুদ বিন উমার আয-যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.)
১১	তাক-মিলাতুস সিহাহ ও তাকমিলাতুল আব্বাব	আস-সাগানী (মৃ. ৬৫০ খ্রি.)
১২	আল-আজনাসুল-লুগাহ	আবু মনসুর আস-সালাবী (মৃ. ৪২৯ হি.)

২২০. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬-২৬৭

১৩	আল-নিহায়া	ইবনুল-আসীর (মৃ. ৬৭৭ হি.)
১৫	খলকুল-ইনসা	আবু ইসহাক আল-যুজাজ (মৃ. ৩১১ হি.)
১৬	কিতাবুয-যাহির	ইবনে আল-আম্বারী (মৃ. ৫৭৭ হি.)
১৭	আল-আমালী	আবুল কাসেম আল-যুজাজী (মৃ. ৩৯৯ হি.)
১৮	আল-মুজাম	আবু আমর আল হারাভী (মৃ. ২৫৫ হি)
১৮	কিতাবুল-আশরাত	আল মুতাররায় আল-বাওয়ারদী (মৃ. ৩৪৫ হি.)
১৯	কিতাবুল বারি ফিল লুগাহ	আবু আলী ইসমাঈল বিন কাসিম আল-কালী (২৮৮-৩৫৬ হি./৯০১-৯৬৭ খ্রি.)
২০	আল-জামিয়	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন জাফর আল কাজ্জাফ (মৃ. ৪১২ হি.)
২১	কিতাবুল আইন	খলিল বিন আহমাদ আল-ফারাহিদী (৭১২-৭৯১ খ্রি.)
২২	জামহারাতুল লুগাহ	ইবনে দুরায়দ আল-আযাদী (২২৩-৩২১ হি.)
২৩	কিতাবুল জীম	আবু আমর আশ-শায়বানী (৭১৯-৮২১ খ্রি.)
২৪	আল মুহকাম ওয়াল মুহীতিল আযীম	আবুল হাসান আলী বিন ইসমাঈল (মৃ. ৪৫৮ হি.)
২৫	লিসানুল আরব	মুহাম্মাদ বিন মানযুর (১২৩২-১৩১১ খ্রি.)

علم التاريخ (ইতিহাস)

জ্ঞানের উন্মেষ ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান (তাফসির, হাদীস ও ফিক্‌হ) কিংবা ভাষা বিষয়ক (ব্যকরণ, ভাষা ও সাহিত্য) অথবা অন্য যেকোনো বিষয় জ্ঞানার্জন সবগুলোরই অভিপ্রকাশ ছিল অভিন্ন এবং সবগুলোই ছিল অভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সবক'টি জ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়েছিল মৌখিকভাবে। মুখ থেকে মুখে প্রজন্ম পরম্পরায় তা চলে এসেছে। প্রথম দিকে সংকলন বা গ্রন্থবদ্ধ করণের প্রয়াস ছিল না দু'একটি ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সংকলন ও গ্রন্থনার ধারা সম্প্রসারিত হতে লাগলে তাফসির, ইতিহাস, সাহিত্য, ফিক্‌হ, আইন প্রভৃত বিষয়গুলো কয়েকটি বিন্দুতে কিন্দ্রীভূত হতে লাগলো। সর্বোপরি আব্বাসী আমলে

জ্ঞান চর্চা পূর্ণোদ্যমে শুরু হলে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইতিহাসের বিষয়গুলো আরো সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল রূপ ধারণ করে।[২২১]

আব্বাসীয় শাসনামলে মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (মৃ. ১৫০ হি.), মুহাম্মাদ আল-ওয়াকিদী (মৃ. ২০৭ হি.), মুহাম্মাদ বিন হিশাম (মৃ. ২০০ হি.), মুহাম্মাদ বিন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.), মুহাম্মাদ বিন জারীর আত-তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.), আবু জা'ফর আল-বালাযুরী (মৃ. ২৭৯ হি.), ইবনে কুতায়বা (মৃ. ২৭৬ হি.), আবুল হাসান আলী আল-মাসউদী (মৃ. ৩৪৫ হি.) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসশাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।[২২২]

---

২২১. আহমাদ আমীন, দুহাল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১-৩৬৩

২২২. আব্দুল আজিজ আদ-দাওরী, *ইলমুত তারিখ* (বৈরুত: আল-কুলিকিয়া, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ১০০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগের পতনের কারণ

আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকাল যেন এক অন্তহীন পরীক্ষার ইতিহা। একটি সংকটের অবসান ঘটতেই আরেকটি সংকোট মাথাচাড়া দিয়ে ওঠত। কখনও আলাউইদের উচ্ছেদ, কখনও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কখনও বা রাষ্ট্রগঠনে সহায়তাকারী পারস্যীয় শক্তির বিরুদ্ধ অবস্থান-রাষ্ট্র যেন সর্বদাই অস্থিরতার প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল। বিদ্রোহের এ অবিরাম ঢেউ আব্বাসীয় ক্ষমতার ভিতকে ক্রমাগত আঘাত দিতে থাকে। তবে সবসময় শক্তির ভাষায় উত্তর আসেনি। বলপ্রয়োগের পাশাপাশি আব্বাসীয় দরবারে আরেক অস্ত্রও ছিল-ষড়যন্ত্র, গোপন কৌশল ও রাজনৈতিক ধূর্ততা। কখনও কখনও মনে হয়, এ রাষ্ট্র ছিল কেবল তরবারির নয়, চাতুর্য ও বিশ্বাসঘাতকতারও এক মঞ্চ; যেখানে কঠোরতার চেয়ে কৌশলের প্রভাবই অধিকতর ছিল।

নিপীড়ন ও নির্যাতন আলাউইদের সংগ্রামী মনোবলকে স্তব্ধ করতে পারেনি। বরং তারা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে। পশ্চিমাঞ্চলে আলাউই শক্তির উত্থান, শিয়া ফাতেমীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠা-এসবই আব্বাসীয় দুর্বলতার সুযোগে বিকশিত এক নতুন শক্তির নিদর্শন বহন করে। কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী প্রদেশগুলো ক্রমে হয়ে উঠে বিকল্প ক্ষমতার আশ্রয়স্থল। এ যুগের আরেকটি উজ্জ্বল কিন্তু বেদনাদায়ক বৈশিষ্ট্য ছিল মতভেদের তীব্রতা। সুন্নি ও শিয়াদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, আইনবিদদের পারস্পরিক বিরোধ-সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিভক্ত করে তোলে নানা সম্প্রদায়ের রেখায়। ঐক্যের পরিবর্তে বিভাজনই যেন সময়ের প্রধান সুর হয়ে উঠে। বাগদাদ নামমাত্র খলিফাদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বাস্তব ক্ষমতা প্রায়ই তুর্কী সামরিক শক্তির হাতে ন্যস্ত ছিল। তারা দুর্বল বা অনভিজ্ঞ খলিফাদের বেছে নিত, যাতে প্রকৃত শাসনক্ষমতা নিজেদের দখলে রাখা যায়। কখনও খলিফা তাদের কর্তৃত্ব মেনে নিতেন, কখনও প্রতিবাদ করতেন-ফলত শাস্তি, অপসারণ কিংবা অপমান ছিল নিয়তির অনিবার্য পরিণতি।[২২৩]

রাষ্ট্র পরিচালনায় আব্বাসীয়রা মাওয়ালী ও পারস্যীয় উপাদানের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠে। সাসানীয় প্রশাসনিক ধারা গ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন শাসনরীতি গড়ে ওঠলেও আরব উপাদানের উপেক্ষা

---

২২৩. আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *তারিখে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, ১৩৯

এক অন্তর্লীন ক্ষোভের জন্ম দেয়। খলিফা আল-আমিন (৮০৯-৮১৩ খ্রি.) ও আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) সংঘাত যেন কেবল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নয়, বরং আরব-পারস্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতীকী প্রতিফলন হিসেবেও প্রতিভাত হয়। এসময়ে বিদ্রোহ ছিল নিত্যসঙ্গী; যা রাষ্ট্রের শক্তি ও স্থিতিশীলতাকে ক্ষয় করে। রক্তপাত, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক অস্থিরতা আব্বাসীয় কাঠামোকে ভেতর থেকে দুর্বল করে তোলে।[২২৪] খেলাফতের দুর্বলতার আরেকটি সুস্পষ্ট কারণ ছিল-খলিফাদের ক্রমশ পুতুলে পরিণত হওয়া। প্রদেশগুলো কেন্দ্রের শৈথিল্যের সুযোগে স্বাধীনতার পথে এগোতে থাকে; প্রদেশগুলো নিজেদের শাসনব্যবস্থা দৃঢ় করে। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে জনগণের সঙ্গে খলিফাদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। কারাবরণ, নির্যাতন, বরখাস্ত-এসবের ফলে খেলাফতের প্রতি মানুষের হৃদয়ে যে মর্যাদা ও পবিত্রতার অনুভব ছিল, তা ক্রমে ম্লান হয়ে যায়। শাসক ও প্রজার সম্পর্ক বিশ্বাসের পরিবর্তে ভয়ের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়।[২২৫] ক্ষমতা রক্ষার আতঙ্কে খলিফাগণ একের পর এক নতুন শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়; কখনো তুর্কী কখনো দায়লামীয় আবার কখনো সেলজুক। কিন্তু প্রতিটি জোটই শেষ পর্যন্ত খেলাফতের সার্বভৌমত্বকে আরও সংকুচিত করেছে। আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে খেলাফত বারবার নতুন আধিপত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে পূর্ব দিক থেকে মঙ্গোল হুমকি ক্রমে ঘনিয়ে আসে। কিছু খলিফা ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, কেউ বিলাসে নিমগ্ন থাকেন, আবার কেউ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। তবু শেষ পর্যন্ত পরাজয় এড়ানো যায়নি। কারণ সমস্যার মূল কেবল ব্যক্তিগত দুর্বলতা নয়-বরং খেলাফত ব্যবস্থার অন্তর্গত কাঠামোগত ভঙ্গুরতা।[২২৬]

আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ছিল বহুমাত্রিক ও জটিল। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, সামরিক শক্তির স্বায়ত্তশাসন, সামাজিক-ধর্মীয় বিভাজন, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং বৈদেশিক আক্রমণের সমন্বিত প্রভাব রাষ্ট্রের অবক্ষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এ পতন মধ্যযুগীয় ইসলামী রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মোড় নির্দেশ করে, যা পরবর্তী আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ও নতুন রাজনৈতিক বিন্যাসের পথ প্রশস্ত করে।

---

২২৪. মুহাম্মাদ মাহির হামাদা, *আল-অসায়িকুস সিয়াসাতিল ইদারাতিল আয়িদাহ লিল আসরিল আব্বাসীয়্যাতিল মুতাতাবিয়্যাহ* (বৈরুত: মুয়াসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৪৪

২২৫. হাসান আহমাদ মাহমুদ এবং আহমাদ ইব্রাহিম আশ-শারিফ, *আল-আলামুল ইসলামী ফিল আসরিল আব্বাসী* (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৭৭ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩০৭

২২৬. ১৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ : অনুবাদের পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অনুবাদের প্রকারভেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রাক ইসলামী ও ইসলামী যুগে ক্রমবিকাশ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উমাইয়্যা যুগে ক্রমবিকাশ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আব্বাসী যুগে ক্রমবিকাশ

আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আরবী অনুবাদ সাহিত্যের সূচনা মানবসভ্যতার পারস্পরিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ধারাবাহিক ফল। পৃথিবীর যেকোনো ভাষার সাহিত্যই সেই ভাষাভাষী মানুষের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও জ্ঞানকে ধারণ করে। যখন এক ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার অন্য ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই অনুবাদের জন্ম হয়। প্রথম যুগে অনুবাদ ছিল মূলত মৌখিক। বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক যোগাযোগ, বাণিজ্যিক লেনদেন এবং রাজনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে এক ভাষার বক্তব্য অন্য ভাষায় তাৎক্ষণিকভাবে রূপান্তর করা হতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের পরিসর বিস্তৃত হয় এবং মৌখিক অনুবাদ আর যথেষ্ট থাকে না। তখন ধীরে ধীরে অনুবাদ লিখিত রূপ লাভ করে এবং তা একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারায় পরিণত হয়।

প্রাচীনকালে মানুষ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করত। এর ফলে এক দেশের সংস্কৃতি, জ্ঞান ও সাহিত্য অন্য দেশের সমাজে প্রবেশ করত। উদাহরণস্বরূপ, আরবরা যখন সিন্ধু অঞ্চল জয় করে, তখন তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এর ফলে বহু ভারতীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের মতো বিভিন্ন শাস্ত্রে ভারতীয় জ্ঞানের প্রভাব আরবী সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। অনুরূপভাবে গ্রীক, সুরিয়ানী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষার অসংখ্য সাহিত্যকর্মও আরবীতে অনূদিত হয়। অনুবাদের মাধ্যমেই আব্বাসীয় পণ্ডিতগণ পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর জ্ঞানকে আত্মস্থ করে; যা পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অনুবাদের পরিচয়

অনুবাদ হলো ভাষান্তর বা কোনো রচনাকর্মের অন্য ভাষায় প্রদত্ত বিবরণ। আরবীতে অনুবাদ শব্দের প্রতিশব্দ তরজমা (ترجمة)। শব্দটি একবচন, বহুবচন হলো تراجم; অর্থ অনুবাদ, ভাষান্তর, ব্যাখ্যা, বৃত্তান্ত, জীবনী ইত্যাদি।[২২৭] ترجمة শব্দটির فعل হলো ترجم, যার মূল অক্ষর (ر-ج- م) এবং শব্দটি বাবে فعلل থেকে بعثر এর ওজনে এসেছে।[২২৮] 'আল-মাওরিদ' অভিধানে ترجمة এর فعل হিসেবে يبرز ও يفسر , يؤول , يودى শব্দগুলো সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।[২২৯]

ترجمة শব্দটির ব্যবহার ও অর্থে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন 'আল-মাওরিদ' অভিধানে ترجمة শব্দটি نقل ও أرخ শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন; نقل من لغة إلى لغة أخرى বা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা, أرخ حياة إنسان বা কোনো ব্যক্তির জীবনী লেখা।[২৩০]

Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে Translation শব্দটির ব্যবহার বিশেষ্য (noun) হিসেবে ৪টি অর্থে এবং ক্রিয়া (verb) হিসেবে ৩টি অর্থে দেখা যায়। যেমন[২৩১]

১. বিশেষ্য (noun) হিসেবে

1. to express the meaning of speech or writing in a different language.
2. to be changed from one language to another.
3. to change something or to be changed into a different form.
4. to understand something in a particular way or give something a particular meaning.

---

২২৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭ খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২২৩; আবু তাহের মেসবাহ, আল-মানার (ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরি, ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯১; মো. আবুল কালাম সরকার, *বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫ খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ১১৪

২২৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৪; আবু তাহের মেসবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

২২৯ মুনির বা'লাবাক্কী ও ড. রমযী মুনির বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ আল-হাদীস*, ইংরেজি-আরবী (বৈরুত: দারুল ইলম লিল্ মালায়িন), পৃ. ৬০৩

২৩০. ড. রুহি আল-বা'ল্লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ*, পৃ. ৩০৭

২৩১. Oxford Advanced Learner's Dictionary (USA: Oxford University Press, 2002-2003), 6th Adi., p. 1382

২. ক্রিয়া (verb) হিসেবে

1. the process of changing something that is written or spoken into anothe language.
2. a text or work that has been changed from one language to another.
3. the process of changing something into a different form.

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এর মতে অনুবাদ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল translation, interpretation, traduction, এবং যিনি অনুবাদ করেন তাকে বলা হয় অনুবাদক বা translator; one who speaks or narrates a thing repetedly; an imitator, a traducer, a scandal-manger।[২৩২]

মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ আল-ফারকানির মতে ترجمة শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২৩৩]

১. تبليغ الكلام لمن لم يبلغه অর্থাৎ কোনো কথা বা বাণীকে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া, যার নিকট তা পৌঁছায়নি।

২. تفسير الكلام بلغته التي جاء بها অর্থাৎ কোনো কথা বা বাণীকে স্বভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।

৩. تفسير الكلام بلغة غير لغته অর্থাৎ কোনো কথা বা বাণীকে অন্য ভাষায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।

৪. نقل الكلام من لغة إلي أخري অর্থাৎ এক ভাষার কথা বা বাণীকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা।

দাওরু হারাকাতিত তারজামাতি ওয়ান নাক্‌লু ফিল হায়াতিল ইলমিয়াতি ইবানাল আসরিল আব্বাসিল আওয়াল গ্রন্থে ترجمة শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৩৪] যেমন-

১. الإيضاح والتفسير. অর্থাৎ স্পষ্টীকরণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।

২. ذكر سيرة شخص وأخلاقه ونسبه. অর্থাৎ একজন ব্যক্তির জীবনী, চরিত্র ও বংশ উল্লেখ করা।

৩. النقل من لغة إلى أخرى. অর্থাৎ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করা।

---

২৩২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ (বাংলা-ইংরেজি) অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ৩৪

২৩৩. মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ আল ফারকানি, *মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইসলামীয়্যাহ, ১৯৮৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১১ ও ১৯

২৩৪. মুহাম্মাদ হাসনাইন, *দাওরু হারাকাতিত তারজামাতি ওয়ান নাক্‌লু ফিল হায়াতিল ইলমিয়াতি ইবানাল আসরিল আব্বাসিল আওয়াল* (আলজেরিয়া: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা মন্ত্রনালয়, ২০১৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩-১৪

অনুবাদ সম্পর্কে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ ও অভিধানবেত্তাগণ নিজেদের মত করে সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন সাদি জিয়াদ হুসাইন এর মতে[২৩৫]

الترجمة (وتسمى أيضا النقل) عملية لتحويل نص أصلي مكتوب (ويسمى النص المصدر) من اللغة المصدر إلى نص مكتوب (النص الهدف) في اللغة الهد.

অর্থাৎ "অনুবাদ (স্থানান্তর নামেও নামকরণ করা হয়) হলো একটি মূল লিখিত (উৎস পাঠ্য নামে নামকরণ করা হয়) পাঠ্যকে উৎস ভাষা থেকে একটি লিখিত পাঠ্যে (লক্ষ্য পাঠ্য) লক্ষ্য ভাষায় রূপান্তর করার একটি প্রক্রিয়া।"

ইবনে উসমান শাহারজাদ অনুবাদের সংজ্ঞায় বলেন [২৩৬]

الترجمة هي نقل الألفاظ والمعنى و الأساليب من لغة الى أخرى مع المحافظة على التكافؤ.

অর্থাৎ এক ভাষা হতে অন্য ভাষাতে শব্দ, অর্থ এবং পদ্ধতির স্থানান্তর এবং অর্থের সমতা বজায় রাখা।

কামাল বাশার-এর মতে অনুবাদ হলো[২৩৭]

إن الترجمة تعني نقل معاني الكلمات أو العبارات والنصوص الأجنبية والتعبير عنها بكلمات وعبارات مقابلة لها في اللغة المنقول إليها.

অর্থাৎ " বিদেশী শব্দ, বাক্যাংশ, ও পাঠের অর্থ স্থানান্তরিত করা এবং উদ্দিষ্ট ভাষায় তাদের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য শব্দ ও বাক্যাংশে প্রকাশ করা।"

ড. মাহশিদ মাশিরির[২৩৮] মতে, "অনুবাদ হলো কোনো বিষয়ের তাৎপর্য-ভাবার্থসমূহ এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় উপস্থাপন করা। কোনো বিষয়বস্তু তার উৎস বা মূল ভাষা হতে লক্ষ্যস্থিত ভাষায় বর্ণনা করা। এক ভাষার পাঠ অনুবাদকের লক্ষ্যস্থিত ভাষায় প্রতিধ্বনিত করা।"[২৩৯]

---

২৩৫. সাদি জিয়াদ হুসাইন, *আত্-তারজামাতু মুয়াওবিকাতুহা ওয়া আসাসুহা*, পৃ. ৬

২৩৬. ইবন উসমান শাহারজাদ, *মাদ্‌খাল হাউলু ইলমুল তারজামাহ* (আলজেরিয়া: আবি বকর বেলকাইদ ইউনিভার্সিটি, তা.বি), পৃ. ০৯

২৩৭. কামাল বাশার, *দিরাসাতুন ফি ইলমিল লুগাহ* (কায়রো: দারুল গরিব, তা.বি), পৃ. ৩১০

২৩৮. ড. মাহশিদ মাশিরি (مهشيد مشيرى) একজন পারসিয়ান নারী ভাষাবিজ্ঞানী ও ঔপন্যাসিক। তিনি ২১ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের রাজধানী তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফার্সি ভাষায় রচিত 'Persian Phono-Orthographic Dictionary'-এর লেখক। এছাড়া তার ভাষা বিষয়ক রচনাকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, Persian Dictionary

আব্দুল আলীম আস-সায়্যিদ আল-মানসী এবং আবদুল্লাহ আব্দুর-রাজ্জাক-এর মতে[২৪০]

الترجمة تعني نقل الأفكار والأقوال من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح النص المنقول.

অর্থাৎ "অনুবাদ হলো অনুদিত পাঠ্যের চেতনাকে সংরক্ষণ করে এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় ভাব ও বাণী স্থানান্তর করা।"

অনুবাদের সংজ্ঞায় ড. জামাল আবদে নাসির বলেন[২৪১]

نقل كلمة من لغة إلى أخرى شريطة أن يكون المعنى المقصود والمستدل عليه- المحسوس منه مفهوما على الأقل أو موجودا، كأن ينقل أحد'seat' والمجرد- الإنكليزية إلى "مقعد" العربية.

অর্থাৎ "অনুবাদ হলো কোনো শব্দকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় স্থানান্তর করা, তবে শর্ত হলো তা যেনো মূল শব্দের চেয়ে সহজবোধ্য শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং অভিপ্রেত এবং অনুমানকৃত অর্থ বাস্তব এবং বিমূর্ত উভয়ই অন্তত বোঝা যায়। যেমন কেউ আরবীতে 'مقعد' তথা 'আসন' এর স্থলে ইংরেজি "seat" শব্দ ব্যবহার করে।"

ড. আযুদ্দীন মুহাম্মদ নাজিব বলেন, الترجمة هى نقل الكلام من لغة الي لغة اخري.

অর্থাৎ "অনুবাদ হলো, এক ভাষার কথা বা বাণীকে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত করা।"[২৪২]

'সংবাদ শিরোনামের ত্রি-ভাষিক অনুবাদ'-এর গ্রন্থাকার অনুবাদের সংজ্ঞায় বলেন[২৪৩]

الترجمة تعني نقل الأفكار والمفاهيم من اللغة الأصلية (لغة المصدر) إلى اللغة الأخرى (لغة الهدف) مع الالتزام بنقل مفهوم الكلمات بطريقة صحيحة لتتشابه مع معانيها الأصلية مع مراعة

(alphabetical & analogical), An Unabridged Persian Dictionary, Persian General Dictionary, Concise Persian Dictionary, Collegiate Persian Dictionary এবং উপন্যাসগুলোর মধ্যে বিখ্যাত হলো Yad-e Jaran (The Memories of Childhood).

২৩৯. মো. আবুল কালাম সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

২৪০. ড. জামাল আবদে নাসির ও ড. আব্দুল ওয়াহাব আল্লুব, কিতাবু ফান্নুত তারজামাহ (কায়রো: দারুস সাকাফাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৩০

২৪১. ড. জামাল আবদে নাসির, *আত-তারজামাতু ওয়াত তা'রিব*, *মাজাল্লাতুল ফায়সাল আস-সাকাফাতুশ শাহ্‌রিয়্যাহ* (রিয়াদ: জমাদিউল উলা, ১৪১৭হি./সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৬ খ্রি.), সংখ্যা ২৩৯, পৃ. ২

২৪২. ড. আযুদ্দীন মুহাম্মদ নাজিব, *আসুসুত তারজামাহ* (কায়রো: মাকতাবাতু ইবনে সিনা, ২০০৫ খ্রি.), সং. ৫ম, পৃ. ০৭

২৪৩. ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী, *সংবাদ শিরোনামের ত্রি-ভাষিক অনুবাদ* (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০২৩ খ্রি.), প্রথম প্রকাশ, পৃ. ২৫

التسلسل المنطقي، وقواعد اللغة العربية: النحوية والصرفية والصوتية والدلالية والبلاغية والمصطلحات والتقابلات وما إلى ذلك ومع الحفاظ على روح النص المنقول.

অর্থাৎ "অনুবাদ মানে মূল ভাষা (উৎস ভাষা) থেকে অন্য ভাষায় (উদ্দিষ্ট ভাষায়) ভাবকে এমন ভাবে স্থানান্তর করা, যাতে শব্দের ভাবার্থ বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হয় এবং এ ভাব মূল অর্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। এতে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা, আরবী ভাষার ব্যাকরণ তথা নাহু-সরফ, ধ্বনি, শব্দার্থ, অলংকারশাস্ত্র, পরিভাষা এবং বিপরীত শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। পাশাপাশি মূল বক্তব্যের চেতনা সংরক্ষণ করা হয়।"

E. Breus-এর মতে[২৪৪] "Translation is a process of interlingual communication. Not only two languages interact in the translation process, but also two cultures."

অর্থাৎ "অনুবাদ হলো আন্ত:ভাষিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম; যা কেবল দু'টি ভাষার অনুবাদ প্রক্রিয়ার মাঝে যোগসূত্র তৈরী করে না বরং দু'টি সংস্কৃতির মাঝেও সেতুবন্ধন রচনা করে।"

T. Kazakova-এর মতে, "Translation is a kind of transformation of a source language text into a target language text."

অর্থাৎ "অনুবাদ হলো উৎস ভাষা থেকে লক্ষ্য ভাষার পাঠ্যের মধ্যে এক ধরণের রূপান্তর।"

মাহমুদ হামদী জাকজুক অনুবাদের সংজ্ঞায় বলেন-[২৪৫]

إن الترجمة هي نقل العلوم والمعارف من لغة إلى أخرى سواء كان النقل بطرق مباشرة عن طريق لغة وسيطة، وقد استعملت كلمة النقل في كتب القدامى على سبيل التبادل أو تعارف أو الترادف مع كلمة الترجمة.

অর্থাৎ "অনুবাদ হলো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের রূপান্তর, এ রূপান্তরটি সরাসরি একটি মধ্যবর্তী ভাষার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে শব্দটি বিনিময়, পরিচিতি অথবা الترجمة (অনুবাদ) শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতো।"

---

২৪৪. Iordan Corina. *Defination of translation, translation strategy, translation procedure, translation method, translation technique, translation transformation, Scientific Collection Interconf (42),* (Rome: 2021), p. 475

২৪৫. মাহমুদ হামদি জাকজুক, *ইসলামিক ইনসাইক্লোপেডিয়্যা* (কায়রো: ধর্মবিষয়ক মন্ত্রনালয়, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৬৬

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, ترجمة বা অনুবাদ হলো একটি রূপান্তর প্রক্রিয়া; যার মাধ্যমে একটি ভাষার কোনো তথ্য-উপাত্ত, ভাব, বক্তব্য বা রচনাকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনুবাদের প্রকারভেদ

বিশেষজ্ঞদের মতে অনুবাদের শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে মতপার্থক্য থাকায় এগুলোর মূলত দু'টি বা তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়।

অনুবাদ সাধারণত দু'প্রকার।[২৪৬]

ক. (আক্ষরিক অনুবাদ/Literal or Word for Word Translation)। আক্ষরিক অনুবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একের পর এক শব্দের অনুবাদ, অতপর পূর্ণবাক্য গঠন এবং এভাবেই পূর্ণ গ্রন্থকে অনুবাদ করাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা হয়। আরবী অনুবাদকগণ যখন গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদ করতেন তখন আক্ষরিক অনুবাদ প্রচলিত ছিল। এছাড়া টলেডো নগরী পতনের পর ইহুদি ও ল্যাটিন অনুবাদকগণ যখন আরবী থেকে ইবরানি (হিব্রু) ও ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করতেন তখন সেখানেও আক্ষরিক অনুবাদ প্রচলিত ছিল।

খ. ভাবানুবাদ (Thematic or Sense for Sense Translation)। এ জাতীয় অনুবাদের বেলায় অনুবাদ্য গ্রন্থের বাক্যের সার্বিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, বাক্যসমূহের মাঝে অর্থের বন্ধন রক্ষা করেই অনূদিত গ্রন্থে মূল রচনার যথার্থ বক্তব্য ও বিষয়বস্তু ফুটিয়ে তোলা হয়। এখানে শাব্দিক অনুবাদ মূল লক্ষ্য নয়; বাক্যের মর্মার্থ আর ভাবের পরিস্ফুটনই এ ধরণের অনুবাদের মূল লক্ষ্য।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে রোমান জ্যাকবসন জে.সি ক্যাটফোর্ড (১৮৯৬-১৯৮২ খ্রি.)[২৪৭] তিন ধরণের অনুবাদের কথা উল্লেখ করেছেন;[২৪৮]

১. অন্তর্ভাষী অনুবাদ (Intralingual Translation)ঃ একই ভাষার বিভিন্ন মৌখিক সংকেতের মাধ্যমে এ অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়। একই ভাষার মধ্যে সংঘটিত অনুবাদ প্রক্রিয়া এ ধরণের নতুন শব্দ প্রয়োগ করে বা শব্দাবলি নতুনভাবে সাজিয়ে অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে এখানে সহজবোধ্য করে তোলা

---

২৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

২৪৭. রোমান জ্যাকবসন জে.সি ক্যাটফোর্ড বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত রুশ দার্শনিক ও ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি ১১ অক্টোবর, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার মস্কোতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮ জুলাই, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুবরণ করেন

২৪৮. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, *অনুবাদের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০০৮, খ্রি.), পৃ. ৩০

হয়। এক শব্দ থেকে অন্য শব্দের, এক বা একাধিক সমার্থ শব্দের অনুবাদকে বলা হয় অন্তর্ভাষী বা আন্তঃভাষাতাত্ত্বিক অনুবাদ।

২. আন্তর্ভাষী অনুবাদ (Interlingual Translation): এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন মৌখিক বাকসংকেত বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। এ ধরণের অনুবাদকে সাহিত্যের অনুবাদ বলা হয়। ভাষান্তরের মাধ্যমে এখানে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়। এ অনুবাদকে উপযুক্ত অনুবাদও বলা হয়।

৩. আন্তঃসংকেত অনুবাদ (Intersemiotic Translation or Transmulation):

অমৌখিক সংকেত সংশ্রয়ের মাধ্যমে গঠিত অনুবাদ এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমের সাহায্যে এখানে বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

'সংবাদ শিরোনামের ত্রি-ভাষিক অনুবাদ' গ্রন্থে বিষয়ের ভিত্তিতে লিখিত অনুবাদকে সতেরো প্রকারে বিভক্ত করা হয়েছে।[২৪৯] যেমন-

১. الترجمة الأدبية (সাহিত্যিক অনুবাদ/Literary Translation)ঃ সাহিত্যিক অনুবাদ হল্যে সাহিত্যিক গ্রন্থাদি এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা। সাহিত্যিক অনুবাদ তুলনামূলকভাবে অনুবাদের অন্য সকল প্রকার অনুবাদ থেকে কঠিন।

২. الترجمة العلمية (বৈজ্ঞানিক অনুবাদ/Scientific Translation)ঃ বৈজ্ঞানিক তথ্য, আবিষ্কার, প্রবন্ধ, জার্নাল ইত্যাদির অনুবাদ বৈজ্ঞানিক অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে অনুবাদকারীকে এমন কিছু উপাদানের শরণাপন্ন হতে হয় যা অন্য ধরণের অনুবাদে প্রয়োজন পড়ে না। এখানে অনুবাদককে উৎস ভাষাগুলোর সঠিক বিকল্প চয়নে সতর্ক হতে হয়।

৩. الترجمة الدينية (ধর্মীয় অনুবাদ/Religious Translation)ঃ এ অনুবাদ হল ধর্মীয় গ্রন্থ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা। এ ধরণের অনুবাদ ধর্ম বা মতবাদ প্রচারের অন্যতম মাধ্যম।

৪. الترجمة الإعلامية (মিডিয়া অনুবাদ/Media Translation)ঃ মিডিয়া অনুবাদ হল সংবাদপত্র, প্রকাশিত সংবাদপত্রের উপর মন্তব্য, জাতীয় পত পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের পর্যালোচনা এবং নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদিকে উৎস ভাষা থেকে টার্গেট ভাষায় রূপান্তরিত করা।

---

২৪৯. ড.আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৮।

৫. الترجمة القانونية (আইনি অনুবাদ/Legal Translation)ঃ এ অনুবাদ মূলত নিয়ম-নীতি, চুক্তি এবং ধারা সম্পর্কিত অনুবাদ। একটি দেশের নিয়ম-নীতি প্রণয়ন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের সময় বিভিন্ন দেশের নিয়ম-নীতি এবং সংবিধানের অনুবাদের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়াও দেশের নাগরিকদের মাঝে তাদের অধিকার পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিয়ম-নীতি, চুক্তি এবং ধারাসমূহের অনুবাদ জানা প্রয়োজন।

৬. الترجمة الاقتصادية (অর্থনৈতিক অনুবাদ/Economic Translation)ঃ এ ধরণের অনুবাদ অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট। আর্থিক বিষয়াদি, ব্যাংকের তথ্য, বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, আর্থিক যেকোনো লেনদেনের অনুবাদ এ ধরণের অনুবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

৭. الترجمة العامة (সাধারণ অনুবাদ/General Translation)ঃ যেসকল বক্তব্য কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তাকে সাধারণ অনুবাদ বলা হয়। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু থাকবে সাধারণ। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো কষ্ট ছাড়াই ঐ বিষয়বস্তুটি বুঝতে পারবে।

৮. الترجمة الطبية (চিকিৎসা বিষয়ক অনুবাদ/Medical Translation)ঃ চিকিৎসা বিষয়ক অনুবাদ বলতে ঔষধ প্রস্তুতের বিদ্যা এবং স্বাস্থ্যসেবা শিল্পের সমস্ত উপাদান সম্পর্কিত নথির অনুবাদকে বোঝায়। এক্ষেত্রে অনুবাদককে চিকিৎসার সাথে সংশ্লিষ্ট পরিভাষা এবং বিভিন্ন ঔষধপত্রের নাম সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে হবে।

৯. الترجمة الإدارية (প্রশাসনিক অনুবাদ/Administrative Translation)ঃ প্রশাসনিক অনুবাদ বলতে ব্যবসা কর্পোরেশন, সরকারী সংস্থা, মন্ত্রণালয়, পৌরসভা এবং অন্যান্য সংস্থার দৈনন্দিন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে ব্যবহৃত প্রশাসনিক তথ্যাদির অনুবাদকে বুঝায়।

১০. الترجمة التقنية (প্রযুক্তিগত অনুবাদ/Technical Translation)ঃ প্রযুক্তিগত অনুবাদ হলো এক ধরণের বিশেষ অনুবাদ যার মধ্যে প্রযুক্তিগত বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত নথির অনুবাদ (ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতির ম্যানুয়াল, ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা ইত্যাদি)। মূলত, বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারিক প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত পাঠ্যের অনুবাদই হলো প্রযুক্তিগত অনুবাদ।

১১. الترجمة الدبلوماسية (কুটনৈতিক অনুবাদ/Diplomatic Translation)ঃ কুটনৈতিক অনুবাদ হচ্ছে এমন ধরণের অনুবাদ যার মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক সমস্যা এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিলের অনুবাদ অন্তর্ভুক্ত।

১২. الترجمة العسكرية (সামরিক অনুবাদ/Military Translation)ঃ সামরিক অনুবাদ হচ্ছে সামরিক প্রশিক্ষণ, সামরিক সরঞ্জাম এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সামরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্যাদির অনুবাদ। সামরিক অনুবাদ করার জন্য অনুবাদকের সামরিক পরিভাষা, শর্তাবলী এবং পদ্ধতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অনুবাদের সময় এসব তথ্যের গোপনীয়তা যাতে রক্ষা হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৩. الترجمة التعليمية (শিক্ষা সংক্রান্ত অনুবাদ/Educational Translation)ঃ পাঠ্য বই, গবেষণা প্রবন্ধ এবং শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন নথিপত্রের অনুবাদ এ ধরণের অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরণের অনুবাদ শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভাষাভাষী লেখকদের গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

১৪. الترجمة السياسية (রাজনৈতিক অনুবাদ/Political Translation)ঃ রাজনৈতিক অনুবাদ হলো রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ঠ বক্তব্য, আলোচনা, সংলাপ, বিবৃতি, ইশতেহার, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম এর অনুবাদ।

১৫. الترجمة الترفيهية (বিনোদনমূলক অনুবাদ/Entertainment Translation)ঃ বিনোদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অনুবাদকে বিনোদনমূলক অনুবাদ বলে। নাটক, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি এ অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত।

১৬. الترجمة الرياضية (ক্রীড়া অনুবাদ/Sports Translation)ঃ খেলাধুলা বিষয়ক সংবাদ, খেলার ধারাভাষ্য, খেলাধুলা বিষয়ক ফিচার ইত্যাদির অনুবাদকে ক্রীড়া অনুবাদ বলে।

১৭. الترجمة الثقافية (সাংস্কৃতিক অনুবাদ/Cultural Translation)ঃ সাংস্কৃতিক অনুবাদ হলো কোনো জাতির সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট আচার-আচরণ, অভ্যাস, জ্ঞান, বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির অনুবাদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাক ইসলামী ও ইসলামী যুগে ক্রমবিকাশ

ইসলাম পূর্ববর্তী আরব সমাজে অনুবাদচর্চার সুস্পষ্ট ধারা ছিল না। তৎকালীন আরব উপদ্বীপে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেনি; জ্ঞানচর্চা ছিল মূলত মৌখিক, কাব্যনির্ভর ও গোত্রভিত্তিক। ফলে চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো পদ্ধতিগত অনুবাদ তখনও সামাজিক অগ্রাধিকারে পরিণত হয়নি। তবে আরব উপদ্বীপের সীমান্তবর্তী অঞ্চল-বিশেষত সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন ও নাজরানে-খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের উপস্থিতি আন্তঃসাংস্কৃতিক সংযোগের দ্বার খুলে রেখেছিল। ধর্মীয় পরিবেশ ও বাণিজ্যপথের প্রভাবে কিছু পবিত্র গ্রন্থের আংশিক মৌখিক আরবী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। এ প্রেক্ষাপটে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আব্দুল উজ্জার (মৃ. ৬১০ খ্রি.) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি হিব্রু ভাষা ও ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ আছে-যা আরব সমাজে সীমিত হলেও তা গ্রন্থভিত্তিক জ্ঞানের উপস্থিতি নির্দেশ করে। একইভাবে ইবনে হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.) তাঁর সীরাত গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের (মৃ. ১৫২ হি.) বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে 'ইঞ্জিল'-এর প্রাচীন আরবী পাঠ ও ধর্মীয় পূর্বাভাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখা করা হয়েছে।[২৫০] তাছাড়া প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কার্ল ব্রুকালম্যানের (১৮৬৮-১৯৫৬ খ্রি.) বর্ণনাতেও জাহেলী যুগে আরবী অনুবাদের সূচনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেসময়েই আসমানী গ্রন্থ 'ইঞ্জিল' আরবী ভাষায় অনূদিত হয় এবং এ অনুবাদটিকেই প্রথম আরবী অনুবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,[২৫১]

إذا صرفنا النظر عن ترجمات قديمة للإنجيل قد نرجع إلى زمن الجاهلية.

অর্থাৎ "যদি আমরা ইঞ্জিলের পুরোনো অনুবাদ অনুসন্ধান করি তাহলে আমাদের জাহেলী যুগের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

---

২৫০. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান, *হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাহ* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল ফাহাদ আল-ওতানিয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬

২৫১. কার্ল ব্রুকালম্যান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (মিশর : দারুল মা'য়ারিফ, ১৯৬২ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০

ইসলামপূর্ব যুগে আরবী ভাষা মিশর, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, সিন্ধুসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে আহমাদ আমিন উল্লেখ করেন:[২৫২]

كانت جزيرة العرب قبل الإسلام قليلة الاتصال بمن حولها وبما حولها! و خاصة سكان أواسط الجزيرة، فلما جاء الإسلام وفتحت الفتوح، كان لذلك آثر فى اللغة متعاكسة، فمن ناحية : انتشرت اللغة العربية في البلاد المفتوحة، فى مصر والشام والعراق وفارس والسند، وأخذ أهل هذه الأمصار يتكلمون العربية شيئا فشيئا حتى غلبت ما عداها، فكسبت اللغة من المتكلمين بها أضعاف من كان يتكلم بها من عرب الجزيرة. واستفادت أيضا أن كل مصر من هذه الأمصار غذى اللغة العربية بكلمات لم تكن تعرفها، فنباتات كل مصر وحيواناته وملابسه ونحو ذلك مما لم يكن للعرب به علم قد أخذه العرب وأدخلوه فى لغتهم.

অর্থাৎ "ইসলামপূর্ব যুগে আরব উপদ্বীপের আশপাশের প্রতিবেশী বিশেষত মধ্য আরবের অধিবাসীগণের সাথে আরবদের যোগাযোগ ছিল খুবই কম। ইসলাম ধর্ম আগমনের পর যখন বিজয়াভিযান অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে, তখন তা আরবী ভাষার ওপর বিপরীত প্রভাব ফেলে। পরিশেষে মিশর, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য এবং সিন্ধুসহ অন্যান্য বিজিত শহরগুলোতে আরবী ভাষা ছড়িয়ে পড়ে। এসমস্ত বিজিত অঞ্চলের লোকেরা ধীরে ধীরে আরবী ভাষা আয়ত্ব করার কারণে স্বাভাবিকভাবে স্থানীয় অন্যান্য ভাষাগুলোর ওপর আরবী ভাষা পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। ফলে আরব উপদ্বীপে আরবী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বহুগুনে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এ বিজিত প্রতিটি অঞ্চলই আরবী ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে নতুন নতুন শব্দ দ্বারা সমৃদ্ধ করেছে যা তারা জানত না। বিভিন্ন স্থান, প্রাণী, গাছপালা, পোশাক ইত্যাদির নাম আরবদের জানা ছিল না, সেগুলো তারা (আরবীকরণের মাধ্যমে) আরবী ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং এগুলোর ব্যবহার শুরু করে।"

ইসলাম পরবর্তী যুগে আরবরা তাদের আশপাশের জনগণের সংস্পর্শে আসলে উত্তরে রোমান ও পূর্বে পারস্য দেশের জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এ সময়ে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে তেমন জ্ঞান ছিল না। কারণ তারা ছিল নিরক্ষর জাতি। তাদের জ্ঞান পারস্পরিক শ্রবণের

২৫২. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম* (কায়রো: মাকতাবাতুল উসরাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[২৫৩] মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়কালে অনুবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়, সেসময়ে প্রচলিত দোভাষীদের থেকে। কেননা দোভাষীদের কাজই ছিল অন্যান্য ভাষার বক্তব্য আরবী ভাষায় অনুবাদ করা, যেন আরবরা সেসকল বক্তব্য বুঝতে পারে।[২৫৪] তৎকালে অনুবাদ অনেকাংশেই দোভাষীদের মৌখিক অনুবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা.) ইয়াহুদি ও সুরিয়ানীদের বিভিন্ন পত্রাবলি পাঠ করে মুহাম্মাদ (স.)-কে বুঝিয়ে দিতেন এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসারে জবাব লিখে দিতেন।[২৫৫] উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ (স.)-এর দোভাষী হযরত যায়িদ (রা.) সুরিয়ানী, ফারসী, হাবশী, রোমান ও কিবতী ভাষা-ভাষীদের কাছ থেকে তাদের ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।[২৫৬]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উমাইয়্যা যুগে ক্রমবিকাশ

উমাইয়্যা যুগে পারস্পারিক গৃহযুদ্ধ, গোত্র কলহ, বৈদেশিক শক্তির সাথে সংঘর্ষ, রাজনৈতিক সুস্থ পরিবেশের অভাব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আব্বাসীয় শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তার বীজ গ্রীক, সিরীয় ও পারসীয় সংস্কৃতির মিলনে উমাইয়্যা যুগেই উপ্ত হয়েছিল। এজন্য এ যুগকেই আরবী অনুবাদ সাহিত্যের সূচনাপর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[২৫৭] উমাইয়্যা যুগে জ্ঞান চর্চা কেবল ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পবিত্র কুরআন, হাদীস, তাফসির ও ফিক্বহ চর্চায় তাদের কাছে মূখ্য বিষয় ছিল। তাই তাদের সাহিত্যকর্ম এ কয়টি বিষয়ের মধ্যেই সীমিত ছিল। কারণ 'আলেকজান্দ্রিয়া বিদ্যাপীঠ' প্রাচীন রোমান সম্রাট টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি.) শাসনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও দর্শনের অঙ্গনে আলোড়ন

---

২৫৩. কার্ল ব্রুকালম্যান, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

২৫৪. ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২৫৫. সাঈদ আবদুল ফাত্তাহ আশুর; জাগলুল আব্দুল হামিদ এবং আহমাদ মুখতার আবাদি, *দিরাসাতু ফি তারিখিল হাদারাতিল ইসলামীয়াতিল* আরাবীয়্যাহ (কুয়েত: দারুল ফিকরিল আরবী, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫

২৫৬. মুহাম্মাদ আব্দুল হাই আল-কাত্তানী, *নিজামুল হুকুমাতিন নাবওয়াতিল মুসাম্মা আত-তারাতিলুল ইদারিয়্যাওহ* (বৈরুত: শারিকাতু দারিল আরক্বাম ইবনিল আরক্বাম, তাবি), ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৮৫

২৫৭. মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৩

সৃষ্টি করেছিল। এ বিদ্যাপীঠ খ্রিস্টপূর্ব ৩০৬ অব্দ থেকে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। বিভিন্ন রাজ্য বিস্তারের ধারাবাহিকতায় উমাইয়্যা আমলেই এ বিদ্যাপীঠের সাথে আরবদের পরিচয় ঘটে। আরবরা তখন এ বিদ্যাপীঠের পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করতে থাকে, ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রও সম্প্রসাারিত হতে থাকে। তবে পরবর্তী যুগের তুলনায় এ স্তর ছিল খুবই দুর্বল ও সীমিত পরিসরে।[২৫৮]

মূলত আরব বিশ্বে সাহিত্যিক অনুবাদের সূচনা হয় খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন মু'য়াবিয়া (৬৩৫-৭০৪ খ্রি.)[২৫৯]-এর উদ্যোগে। 'আল-ফিহরিস্ত' গ্রন্থের লেখক ইবনে নাদীম তাঁকে حكيم آل مروان বা 'মারওয়ানী বংশের জ্ঞানী' বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে সৎকর্মপরায়ণতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জ্ঞানানুরাগের সমন্বয় ছিল। রসায়নশাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ থেকেই তিনি মিশরে বসবাসকারী আরবী ভাষায় পারদর্শী গ্রীক দার্শনিকদের আহ্বান জানান। তাঁর নির্দেশে গ্রীক ভাষা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্রের গ্রন্থাবলি আরবীতে অনূদিত হয়।[২৬০] তবে তাঁর এ অনুবাদকর্ম ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও নিজের প্রয়োজনের মধ্যেই সীমিত ছিল এবং এগুলো রসায়ন শাস্ত্রের মধ্যেই নির্দিষ্ট ছিল।[২৬১] খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন মু'য়াবিয়ার (৬৩৫-৭০৪/৫ খ্রি.) পরে আরব বিশ্বের রাষ্ট্রীয় অফিসগুলোর আরবীকরণের আন্দোলন খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের (৬৪৪-৬৪৭ খ্রি.) মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ (৬৮২-৭২০ খ্রি.) অনুবাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ফলে এসময়ে আরবী ভাষার ব্যবহার এবং এর ব্যাপক প্রসার ঘটে।[২৬২]

উমাইয়্যা শাসনামলেই অনুবাদের মাধ্যমে আরবরা গ্রীক, পারস্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সীমিত পরিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

---

২৫৮. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ.২৬০-২৬২

২৫৯. খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন মু'য়াবিয়া (৬৩৫-৭০৪/৫ খ্রি.) মারিয়ানুস নামক আলেকজান্দ্রীয় খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর অধীনে রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। রসায়নশস্ত্রের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর এ অনুরাগ ছিল আত্মোন্নয়ন ও সঙ্গীদের জ্ঞানবিকাশের আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত। একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থতার পর জ্ঞানের মাধ্যমে মর্যাদা ও কৃতিত্ব অর্জনের বাসনাও তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। দ্র. ড. হার্‌বী আব্বাস আতিতু মাহমুদ ও য. হাস্‌সান হাল্লাক, *আল-উলুমু ইন্দাল আরাব উসুলাহা ওয়া মালামিহাহাল আরাবীয়্যাহ* (বৈরুত: দারুন নাহদাতিল আরাবীয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৪৬-২৪৭

২৬০. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান, *হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; সাঈদ আবদুল ফাত্তাহ আশুর ও অন্যান্য, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯; ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

২৬১. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, (বৈরুত: মাকতাবাতুল খিয়াত, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৩৫৪

২৬২. ড. ফাদিল মুহাম্মাদ আল-হুসাইনী, *আফাকুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ* (ওমান: দারুশ শুরুক, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৭১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগে ক্রমবিকাশ

ইসলামী সভ্যতার 'স্বর্ণযুগ' নামে পরিচিত আব্বাসী যুগে অনুবাদ আন্দোলন এক অভূতপূর্ব বিকাশের সাক্ষী হয়। উমাইয়া শাসনামলে অনুবাদ কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল; খলিফাগণ তখন রাষ্ট্র-সংগঠন ও প্রশাসনিক দায়িত্বে অধিক ব্যস্ত। কিন্তু অনুবাদ আন্দোলনের প্রকৃত প্রস্ফুটন ঘটে আব্বাসীয় খেলাফতে। খলিফা আবু জাফর আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) শাসনামল থেকে অনুবাদ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হতে থাকে। গ্রীক, ফারসী ও ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে এক নতুন বৌদ্ধিক জাগরণের দ্বার উন্মোচন করে। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে এসে ইসলামী বিশ্ব গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের বহু রচনার আরবী অনুবাদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা এবং ৭৮৬ সালে হারুন অর-রশিদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) খেলাফত গ্রহণের পর এ নগরী অনুবাদ ও গবেষণার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। মার্ভ ও জুনদিশাপুরের মতো প্রাচীন জ্ঞানকেন্দ্র থেকে পণ্ডিতদের আগমন, বারমাকী মন্ত্রীদের প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্ব এবং খোরাসানসহ পারস্য অঞ্চল থেকে আগত জ্ঞানানুরাগীদের অংশগ্রহণসব মিলিয়ে বাগদাদে গড়ে উঠে এক বিশ্বজনীন বিদ্যাচর্চার পরিবেশ।[২৬৩] এ যুগে অনুবাদ চর্চার পর্যায় ছিল তিনটি। যথা:[২৬৪]

প্রথম পর্যায়: আব্বাসীয় যুগে অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম পর্যায় জুড়ে রয়েছে খলিফা আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)-এর যুগ থেকে খলিফা হারুন অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৬ হি./৭৫৩ খ্রি. থেকে ১৯৩ হি./৮০৮ খ্রি) পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পর্যায়ের অনুবাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো المجسطى (দ্যা ম্যাগনেট)-এর অনুবাদক ইয়াহিয়া বিন আল-বাতরিক (মৃ. ২০০ হি./৮১৫ খ্রি), জরজিশ বিন জিবরিল (মৃ. ১৮৪ হি./৭৯৬ খ্রি.), আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) যিনি যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন এবং ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) যিনি চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ অনুবাদে বিশেষ অবদান রাখেন।

---

২৬৩. ড. হার্‌বী আব্বাস আতিতু মাহমুদ ও য. হাস্‌সান হাল্লাক, *আল-উলুমু ইন্দাল আরাব উসুলাহা ওয়া মালামিহাহাল আরাবীয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-২৪৮

২৬৪. মারয়্যাম সালামা কার, *আত-তারজামাতু ফিল আসরিল আব্বাসী* (দামেস্ক: মাকতাবাতুন আসাদ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩১-৩২

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ১৯৮ হিজরীতে খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ৩০০ হিজরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এটি অনুবাদকদের দ্বিতীয় প্রজন্ম, যার অন্তর্গত ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (মৃ. ২০০ হি./৮১৫ খ্রি), হাজ্জাজ বিন মাতার (৭৮৬-৮৩৩ খ্রি.), কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.), আব্দুল মাসীহ বিন নাঈমা আল-হোমসী (২২০ হি./৮৩৫ খ্রি.), হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.), তার পুত্র ইসহাক বিন হুনাইন (২৯৮ হি./৯১০ খ্রি.), সাবিত বিন কুররা (৮২৬-৯০১ খ্রি.), হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.)-এর নাতি হুবাইশ বিন হাসান আল-আসাম আদ-দিমাশকী (মৃ. ৯১৩ খ্রি.)। উপরোল্লিখিত অনুবাদকগণ হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৭০ খ্রি.পূ.), গ্যালেন (১৩০-২০০ খ্রি), অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) এবং প্লেটোর (৪২৭-৩৪৭ খ্রি.পূ.) গুরুত্বপূর্ণ অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

তৃতীয় পর্যায়ঃ বিখ্যাত হুবাইশ বিন হাসান (মৃ. ৯১৩ খ্রি.)-এর মৃত্যুর পর থেকে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষের সময়ের অনুবাদকদের মধ্যে নিম্নোল্লিখিত অনুবাদকগণ উল্লেখযোগ্য। মাত্তা ইবনে ইউনুস যার মৃত্যুর তারিখ জানা যায়না; তবে তিনি ৩২০ হি./৯৩২ খ্রি. অথবা ৩৩০ হি./৯৪২ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাগদাদে অবস্থান করেছিলেন, সিনান বিন সাবিত বিন কুররাহ (মৃ. ৩৬০ হি./৯৭১ খ্রি.), ইয়াহিয়া বিন ইবাদী (মৃ. ৩৬৩ হি./৯৭৪ খ্রি.), আবু আলী বিন জারায়াহ (৩৩১-৩৯৮ হি./৯৩৩-১০০৯ খ্রি.), হেলাল বিন হেলাল আল-হামসী এবং ইসা বিন সারবাখত। এ অনুবাদকগণ অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.)-এর যুক্তিবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসী খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে মজবুতকরণের জন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও অনুবাদকদের সাথে সময় কাটাতে ও তাঁদের যথাযথ মর্যাদা ও উপঢৌকন প্রদান করতে পছন্দ করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ পোষণকারী আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে তিনিই প্রথম।[২৬৫] অনুবাদ আন্দোলনকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রীক গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের জন্য তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতিষী ইব্রাহিম আল-আজ্জাজী এবং আলী বিন ইসা আল-আস্তলাবীকে খলিফা রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। এছাড়া তাঁর আমলেই মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম আল-

---

২৬৫. ইবনে কাসির, *আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু* (বৈরুতঃ মাকতাবাতুল মায়ারিফ, ১৯৮৫ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৬।

ফাজারী (৭৪৬-৮০৬ খ্রি.) প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও কবি ব্রহ্মগুপ্ত এর জ্যোর্তিবিদ্যা ও গণিত বিষয়ে ' السند هند ' গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[২৬৬] এ আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়েছিল-যার মধ্যে রয়েছে, كليلة و دمنة (কালিলা ওয়া দিমনা), টলেমির المجسطى (দ্যা ম্যাগনেট) এবং ইউক্লিডের الأصول (আল-উসুল) অন্যান্য।[২৬৭] তবে খলিফা আল-মানসুরের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরী আল-মাহদী এবং আল-হাদীর শাসনামলে এ আন্দোলন কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে।[২৬৮]

খলিফা হারুন অর-রশিদ খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এক নবপর্বের সূচনা করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বহুভাষিক গ্রন্থ অনুবাদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের ফলে অনুবাদ কার্যক্রম দ্রুত বিকশিত হয় এবং এ কাজে যুক্ত পণ্ডিত, অনুবাদক ও সহায়ক কর্মীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।[২৬৯] তাঁর শাসনামলে গ্রীক, ল্যাটিন, ফারসী ও ভারতীয় সাহিত্য থেকে অসংখ্য গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। তিনি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রীক গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায় অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণকারী প্রথম খলিফা। তাঁর পৃষ্ঠোপোষকতায় গ্যালেনের (১২৯-২১৬ খ্রি.) চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ এবং পরবর্তীতে প্লেটোর (৪২৩-৩৪৭ খ্রি.পূ.) অনেক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়।[২৭০] তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসকেন্দ্র بيت الحكمة প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে অনুবাদকগণ বিভিন্ন স্থান থেকে পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ সংগ্রহ করে সেগুলোর অনুবাদ করেন। আর্মেনিয়া, সিরিয়া ও মিশরসহ বিভিন্ন দেশের বিরল গ্রন্থাবলি প্রেরণের জন্য সে দেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ করেন। খলিফা ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহকে (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) সংগৃহীত গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায় অনুবাদের জন্য তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেন।[২৭১] জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র 'বাইতুল হিকমাহ' গ্রন্থাগারটিতে শিক্ষা, অনুবাদ, বিভিন্ন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ ও গ্রন্থ রচনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান ছিল। সেখানে চিকিৎসা,

---

২৬৬. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, ibid, p, 307

২৬৭. ড. ফাদিল মুহাম্মাদ আল-হুসাইনী, *আফাকুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

২৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

২৬৯. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন* (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, তা.বি), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৩

২৭০. গুস্তাফ লুবুন, (অনু) আদিল যি'ইতার, *হাদারাতুল আরব* (মাতবায়াতু ইসা আল-বাবি, তাবি), পৃ. ৪৮৮

২৭১. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বাইতুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯; হাজি খলিফাহ, কাশফুজ্জুনুন '*আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনুন* (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইসলামীয়্যাহ, ১৯৯২ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪

রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত এবং দর্শন বিষয়ের পণ্ডিতগণ জ্ঞানার্জন, গ্রন্থাবলি রচনা ও অনুবাদের জন্য একত্রিত হত। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজই ছিল গ্রীক, রোমান, পারসিক ও ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থাবলির আরবী অনুবাদ করা।[২৭২]

নবম শতাব্দীতে অনুবাদ আন্দোলন বিকাশের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। খলিফা হারুন-অর-রশিদের পর অনুবাদ আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ খলিফা আল-মামুন খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হলে এ আন্দোলন পূর্ণতা পায়। ইউরোপ যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তখন তিনি বাগদাদকে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।[২৭৩] ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ আরও সুসংহত ও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। পূর্বসূরীদের সূচিত ধারাবাহিকতা রক্ষা করে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত করেন। গ্রীক জ্ঞানভাণ্ডার সংগ্রহ এবং তা আরবী ভাষায় অনুবাদকরণের লক্ষ্যে তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাটদের নিকট দূত প্রেরণ করেন। সংগৃহীত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন ও অনুবাদ করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় বিভিন্ন অঞ্চলের দক্ষ অনুবাদকদেরও। ফলে মুসলিম পণ্ডিতসমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ আত্মস্থ করে সংরক্ষণ ও বিকাশে আত্মনিয়োগ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়।[২৭৪] তাঁর শাসনামলেই মূলত অনুবাদ সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময়ে গ্রীকদের দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, গণিত ও ভূগোল বিষয়ের গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। তিনি অনুবাদের জন্য যেসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যেগুলো পূর্ববর্তী খলিফাগণ গ্রহণ করতে সক্ষম হননি।[২৭৫]

খলিফাদের উদারতা লেখকসমাজের জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য ও মর্যাদা এনে দেয়। লেখক, গবেষক ও অনুবাদকগণ রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থিক নিরাপত্তা পেতেন; তাঁদের জন্য বরাদ্দ থাকত নিয়মিত ভাতা,

---

২৭২. আলী ইব্রাহিম হাসান, *আত-তারিখুল ইসলামী আল-আহদুল জাহিলি আদ-দাওলাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ* (কায়রো: মাকতাবাতুল নাহদা আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৪৬০

২৭৩. ড. ফাদিল মুহাম্মাদ আল-হুসাইনী, *আফাকুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

২৭৪. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বাইতুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; রাফিদাহ ইসমাইল আতাউল মান্নান ইসমাইল, *বাইতুল হিকমাহ আল-বাগদাদি ওয়া আসারুহু ফিল হারাকতিল ইলমিয়্যাহ ফিদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২৭৫. আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি, *তারিখুল খুলাফা* (কায়রো: দাওরু ইবনে হাইসাম, ২০০৫ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১২১; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

উপঢৌকন ও সম্মাননা। হুনাইন বিন ইসহাকের (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) মতো অনুবাদক খলিফা আল-মা'মুনের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন-যার ফলে তাঁরা নির্ভাবনায় জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন থাকতে পেরেছিলেন। দরবারের কর্মচারী, ফকিহ এবং পণ্ডিতদের মাসে ৩০০ দিনার পরিমাণ ভাতা দেওয়া হতো।[২৭৬] খলিফা আল-মা'মুনের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা এ বৌদ্ধিক আন্দোলনের যথার্থ মূল্যায়ন পাওয়া যায় কাজী সাইদ আল-আন্দালুসীর (মৃ. ৪৬২ হি.) তাব্কাতুল-উমাম গ্রন্থে। খলিফাকে মূল্যায়ন করে তিনি বলেন[২৭৭]

" ثم لما أفضت الخلافة الى الخليفة السابع منهم- يقصد بنى العباس-عبد الله المأمون بن الرشيد محمد المهدى ابن أبى جعفر المنصور فتم ما بدأ به جده المنصور فأقبل على طلب العلم فى مواضعه واسفخرجه من معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة..."

(আব্বাসী বংশের সপ্তম খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মা'মুন ইবনে আর-রশিদ মুহাম্মাদ আল-মাহদী ইবনে আবু জাফর আল-মানসুরের হাতে খেলাফত অর্পিত হলে তিনি তাঁর পিতামহ আল-মানসুরের জ্ঞানান্বেষণের কর্মধারাকে পূর্ণতা দান করেন। অতঃপর তিনি অগ্রগামী হয়ে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মশক্তির বলে জ্ঞানের খনি থেকে অমূল্য সম্পদ আহরণ করেন এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তা বিকশিত করেন... ।)

খলিফা আল-মামুন পরবর্তী সময়ে অনুবাদ আন্দোলন কিছুটা স্তমিত হয়ে পড়লেও খলিফাগণ রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সাহিতাঙ্গনে অবদান রেখেছেন। যেমন খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ (৯০৮-৯৩২ খ্রি.) ব্যক্তিগতভাবে লেখক ও অনুবাদকদের সহায়তায় এগিয়ে আসতেন। ইবনে দুরাইদের (৮৩৭-৯৩৩ খ্রি.) মতো মনীষী যখন দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় বাগদাদে আগমন করেন, তখন তাঁকে বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়-যা এক মানবিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ববোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর শাসনামলে রাজপুত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের আহ্বান করে সম্মানী ও উপহার প্রদান করতেন। এর ফলে জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, গবেষণা ও সৃজনশীলতা নতুন গতি লাভ করে। অনুরূপভাবে আল-ওয়াসিক বিল্লাহও (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলি আরবী

২৭৬. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, ৩৭৭
২৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

অনুবাদকরণের ক্ষেত্রে গভীর মনোযোগী ছিলেন। এ প্রক্রিয়ায় ইবনে মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগী। অনুবাদকদের সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট উদার ছিলেন। বিখ্যাত একটি গ্রন্থ অনুবাদকরণের জন্য একদা তিনি ইবনে মাসুবিয়াহকে তিন লক্ষ দিরহাম সম্মানী প্রদান করেন।[২৭৮]

আব্বাসীয় ষোড়শ খলিফা আল-মু'তাদিদ বিল্লাহ (৮৯২-৯০২ খ্রি.) কেবল রাজনৈতিক ও প্রশাসনেই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসন ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরণের গ্রন্থাগারকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার গ্রন্থে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তাঁর সময়ে কিছু গ্রন্থাগারে দশ লক্ষেরও অধিক গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল, যা সেই যুগে জ্ঞানচর্চার বিস্তৃত পরিসর ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ বহন করে। গ্রন্থাগারের পাশাপাশি গ্রন্থ ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র ও অনুবাদ কেন্দ্রসমূহও শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয়েছিল। এসময় লেখকগণ অনুবাদ ও ক্যালিওগ্রাফির উৎকর্ষ সাধনেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।[২৭৯]

২৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮ এবং ৭৮
২৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

আব্বাসী যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্য

প্রথম পরিচ্ছেদ : আব্বাসী যুগের অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আব্বাসী যুগের অনুবাদের বিষয়াবলি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আব্বাসী যুগের অনুবাদের বৈশিষ্ট্যাবলি

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আরবী অনুবাদ সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আরবী অনুবাদ সাহিত্যে বিভিন্ন পরিবারের অবদান

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগের অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজিদে বলেন-

و من ايته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ط ان فى ذالك لايت للعالمين.

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"[২৮০]

প্রাচীনকাল থেকেই অনুবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। যুগে যুগে জ্ঞান-বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম ছিল এ অনুবাদই। আধুনিক বিশ্বে এর প্রয়োজনীয়তা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ একটি জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে হলে তাকে বিশ্বজ্ঞানভান্ডারকে আপন করে নিতে হয়। একই সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের ঐতিহ্যকে নিজস্ব সাহিত্যে ধারণ করাও অপরিহার্য। কোনো ভাষার সাহিত্য এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; তাই যেকোনো উৎকৃষ্ট সাহিত্যকে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি ও প্রয়োগের সুযোগ করে দিতে হলে তাকে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়া দরকার। অনুবাদই এ ক্ষেত্রে ভাষার সীমানা অতিক্রম করে সাহিত্যকে বিশ্বমানবতার অভিন্ন সম্পদে পরিণত করে।

আর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন স্বভাব। সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ তাই কেবল দৃশ্যমান বাস্তবের বৃত্তে আবদ্ধ থাকেন না; তাঁরা সত্যের গভীরতম মর্ম উদ্ধার করে দৃষ্টিভঙ্গির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। বাস্তব জগতের অপূর্ণতাকে কল্পনা ও সৃজনশক্তির প্রভায় পূর্ণতা দিতে গিয়েই মানুষ গড়ে তুলেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহুবর্ণ স্তর। প্রযুক্তি ও বস্তুগত অগ্রগতি সেই সভ্যতার দৃশ্যমান ভিত্তি হলেও, তার প্রাণ নিহিত চিন্তা ও সৃষ্টির ধারায়। চিন্তার প্রকাশ যখন মৌখিকতা থেকে লিখিত রূপে উত্তীর্ণ হলো, তখন ভাষা পেল স্থায়িত্ব, ভাব পেল ঐতিহ্যের গভীরতা। গ্রন্থ রচনা মানুষের জ্ঞানকে শুধু সংরক্ষণই করেনি, বরং তার বিস্তার ঘটিয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। স্মৃতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে মুদ্রণশিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তি চিন্তাকে দিয়েছে স্থায়ী আসন, কর্মমুখী বিকাশে যুক্ত করেছে

---

২৮০. সুরা রুম, আয়াত: ২২

নতুন গতি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ মানুষকে সক্ষম করেছে নিজস্ব দর্শন ও চেতনাকে বৈশ্বিক পরিসরে উপস্থাপন করতে। ফলে সাহিত্য, যা একদিন ছিল স্থান ও কালের সীমারেখায় আবদ্ধ, আজ তা বিশ্বমানবের দুয়ার ছুঁয়ে যেতে চায়। বিশ্বব্যাপী এ অভিযাত্রায় অনুবাদ হয়ে ওঠেছে এক অনিবার্য সেতুবন্ধন-ভাষার প্রাচীর ভেঙে ভাবের মিলন ঘটানোর প্রয়াস। অনুবাদ তাই কেবল শব্দান্তর নয়; এটি মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় এক যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত মাধ্যম, যা জ্ঞানকে সীমা থেকে অসীমে, ব্যক্তি থেকে বিশ্বমানবতার পরিসরে পৌঁছে দেয়।[২৮১]

আব্বাসী যুগের অনুবাদ আন্দোলনই এর বাস্তব প্রমাণ। ভাষার বিভিন্নতা সত্বেও এ যুগের সাহিত্যে অনুবাদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। আব্বাসী যুগ কেবল তাদের নিজস্ব সাহিত্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকেনি; বরং অনুবাদের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে তাঁরা সমগ্র বিশ্বে বিচরণ করেছে। গ্রীক, রোমান, সুরিয়ানী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যসম্ভারকে তারা আপন করে নিয়েছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের প্রতি আরব জাতির গভীর অনুরাগের এক অনুপম সাক্ষ্য পাওয়া যায় স্পেনের 'আন্দালুসিয়া' নগরীর বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের প্রবেশদ্বারে খোদাই করা নিম্নোক্ত অমর বাণীতে-[২৮২]

العالم يقوم على أربعة أركان: معرفة الحكيم وعدالة العظيم وصلاة التقي وبسالة الشجاع.

"পৃথিবী চারটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত: জ্ঞানী ব্যক্তিদের জ্ঞান, মহান ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার, ধার্মিকদের প্রার্থনা এবং সাহসীদের সাহস।" এ বাণীতে 'জ্ঞান'-এর অগ্রাধিকার কেবল একটি শব্দগত সৌন্দর্য নয়; বরং এটি ইউরোপের বুকে ইসলামী আদর্শের বৌদ্ধিক দর্শনের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। অষ্টম শতাব্দীতে আরবরা বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে যে নবজাগরণের সূচনা করেছিল, তা ছিল ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়। তারা বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি অনুবাদ করে আরবী অনুবাদ সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ল্যাটিন বিশ্বের বৌদ্ধিক নবজাগরণের পেছনের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে–ছয় শতাব্দী ধরে বিকশিত এ গৌরবময় ঐতিহ্য মানব চিন্তাকে তার অন্ধকার যুগে আলোর দিশা দেখিয়েছিল। এটি গ্রীষ্মের মেঘের মতো বিলীন হয়নি, কিংবা বৃষ্টির বলয়ের মতো

---

২৮১. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, *অনুবাদের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৪৪

২৮২. রাফিদাহ ইসমাইল আতাউল মান্নান ইসমাইল, *বাইতুল হিকমাতি আল বাগদাদি ওয়া আসারুহু ফিল হারাকাতিল ইলমিয়্যাতি ফিদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

অদৃশ্যও হয়নি; বরং মানব পরিবারের আরেক প্রান্তে প্রবেশ করে এক নবীন চিন্তাধারার জন্ম দিতে সহায়তা করেছিল, যা অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার পথ খুঁজছিল।[২৮৩]

অনুবাদ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে আব্বাসীয়গণ তাদের নিজস্ব রুচি ও চিন্তাধারার পরোক্ষ প্রতিফলন ঘঠিয়েছিল। নানা কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সরাসরি সবার নাগালে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না; অনুবাদের মাধ্যমেই সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপিত হতো। অনুবাদ ছাড়া বিশ্বের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক সাহিত্যধারার অস্তিত্ব ও বিকাশ কল্পনা করা যায় না। বৃহৎ ও সমৃদ্ধ সাহিত্য নিজস্ব ঐতিহ্য ও অর্জনের শক্তিতে অগ্রসর হতে পারলেও ক্ষুদ্র সাহিত্য অন্যের সহায়তা ব্যতীত স্থবির হয়ে পড়ে। তাই ক্ষুদ্র সাহিত্যকে টিকে থাকতে ও বিকশিত হতে হলে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় অপরিহার্য। আর এ পরিচয়ের একমাত্র কার্যকর মাধ্যম হলো অনুবাদ।

তাছাড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে আব্বাসী যুগের সমৃদ্ধ অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এটি লেখক ও অনুবাদকদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তাদেরকে অপরিচিত জগতে নিয়ে এমন সাহিত্যভাণ্ডারের সাথে পরিচিত করে যা তাদের কাজকে সমৃদ্ধ করে এবং এমন পদ্ধতি ও শৈলীর দিকে পরিচালিত করে যা উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করে। কারণ নিজস্ব ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ সাহিত্য যতই উপাদান সমৃদ্ধ হোক না কেন, অনিবার্যভাবে তার সম্পদ নিঃশেষ করে দেয় এবং পুনরাবৃত্তির আশ্রয় নেয়। আব্বাসীয়রা অনেক আগেই এটি বুঝতে পেরেছিল। বিশেষত খলিফা হারুন-অর-রশিদ এবং খলিফা আল-মামুন অনুবাদের মূল্য উপলব্ধি করে গ্রীক, পারস্য এবং ভারতীয়দের বিজ্ঞান এবং দর্শন আররী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।[২৮৪] অনুবাদচর্চার ফলে এ যুগে বাগদাদ নগরী জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং 'বাইতুল হিকমা' বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

---

২৮৩. প্রাগুক্ত, ৯৯-১০০

২৮৪. Dr. Barihi Adetunji, *Translation, Arabic-English* (Nigeria: National Open University, 2010.), p.p. 24-25

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগের অনুবাদের বিষয়াবলি

আব্বাসীয় যুগে অনুবাদ সাহিত্য অনারবদের প্রভাবে উমাইয়্যা যুগের চেয়ে অনেক বিষয় বর্ধিত হয়ে বিকশিত হতে থাকে। এ সময়ে অনুবাদ সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। আব্বাসীয় সাহিত্যিকগণ স্বীয় প্রতিভায় অনুবাদের বিষয় পরিধিকে ব্যাপক ও বৈচিত্রময় করে তোলে। তারা চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, প্রকৌশবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীতবিদ্যা, জীবনচরিত, গল্পগ্রন্থ, ভূগোলবিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন, আইন প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থাবলি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। নিম্নে সেসব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

علم التاريخ (ইতিহাসশাস্ত্র)

ইতিহাস চর্চায় নব দিগন্তের সূচনা হয় মূলত আব্বাসী যুগে এবং এ যুগেই তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। এসময় ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস চর্চায় বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করে সমালোচনা ও তুলনার মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করতেন।[২৮৫] প্রাচীন পারসিক خداى نامه (খুদাইনামাহ) গ্রন্থটি আব্দুল্লাহ-ইবনুল মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) سير ملك العجم (অনারব রাজাদের জীবনচরিত) নামে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[২৮৬] তাছাড়াও তিনি সাসানী[২৮৭] সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় থেকে পতন সময়ের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বলিত خرابناسة (খরাবনাসা) গ্রন্থটি تاريخ ملوك الفرس (পারস্য সম্রাটদের ইতিহাস) নামে অনুবাদ করেন।[২৮৮]

---

২৮৫. কার্ল ব্রুকালম্যান, *তারিখুশ শু'উবিল ইসলামিয়্যাহ* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল-মালাইন, ১২৭৯ হি.), পৃ. ১৯৪

২৮৬. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৫০

২৮৭. ইরানে ইসলাম আগমনের পূর্বে সেখানকার সর্বশেষ সাম্রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ২২৪-৬৫১ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বছর ধরে এটি পশ্চিম ইউরোপের দু'টি শক্তির একটি ছিল। সাসানিয়ান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এলাকার মধ্যে ছিল বর্তমান ইরান, ইরাক, আর্মেনিয়া, দক্ষিণ ককেশাস, দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্য এশিয়া, পশ্চিম আফগানিস্তান, তুরস্ক ও সিরিয়ার অংশবিশেষ, পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং আরব উপদ্বীপের কিছু উপকূলীয় এলাকা। সাসানিয়ানরা তাদের সাম্রাজ্যকে 'ইরানশাহর' বা 'ইরানীয় সাম্রাজ্য' বলে ডাকত। সূত্রঃ The Encyclopaedia of Islam (Netherlands: Koninklijke Brill, Leiden, 1997), New Adition, V. 10th , P. 70

২৮৮. ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১৯ খ্রি.), ১ম প্রকাশ, পৃ. ৯১

علم الفلسفة (দর্শনশাস্ত্র)

আব্বাসীয় যুগে মুসলিম দর্শনশাস্ত্রের বিকাশ উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায়। এ যুগে যারা শুধু দর্শনশাস্ত্রের চর্চা করতেন তাদেরকে বলা হতো فيلسوف বা দার্শনিক; আর যারা দর্শনশাস্ত্রকে ধর্মের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন তাদেরকে বলা হতো متكلمين বা তার্কিক।[২৮৯] মুসলিম দর্শন হলো ইসলামী জীবন ও মূল্যবোধ বিষয়ক এমন একটি আদর্শ যা কুরআন ও হাদীস থেকে উপস্থাপিত এবং মুসলিম জাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায় সেই আদর্শ থেকে বিকশিত। এছাড়া মুসলিম মনীষীগণ গ্রীক দর্শন ও অন্যান্য দর্শনের সান্নিধ্যে এসে যৌক্তিক পদ্ধতিতে সত্যে উপনীত হতে নানান চিন্তা-চেতনা ধারণ করেন, যা পরবর্তীতে মুসলিম দর্শন নামে স্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়ে আব্বাসীয় যুগে বিকশিত হয়।[২৯০]

খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) সময় প্লেটো (৪২৩-৩৪৭ খ্রি.পূ.) ও অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.)-এর দর্শন বিশেষত নব্য প্লেটোবাদী ধারণা মুসলমানদেরকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। পবিত্র কুরআনের মৌলিক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা শুরু হয়। এভাবে মুসলমানগণ দর্শনশাস্ত্রের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।[২৯১] আব্বাসীয় খলিফাদের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি প্রথম গুরুত্বারোপ করেন খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)। তিনি গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (৪২৩-৩৪৭ খ্রি.পূ.), অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) ও সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রি.পূ.)-এর দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেন। তার শাসনামলেই দর্শন বিষয়ক গ্রন্থসমূহ অনুবাদকরণের পাশাপাশি দর্শনের যেসমস্ত বিষয় অস্পষ্ট ছিল তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। তাছাড়া সংস্কৃতি, পাহলভী, গ্রীক ও সুরিয়ানী ভাষায় রচিত দর্শন, চিকিৎসা, প্রকৃতিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থাবলি অনুবাদে উৎসাহিত করা হয়। সেসময়ে যেসকল অনুবাদক অনুবাদকরণের কাজে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.)। তিনি অ্যারিস্টটল, প্লেটো, গ্যালেন, হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৭০ খ্রি.পূ.) ও টলেমি (১০০-১৭০ খ্রি.)-এর অনেক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তার অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; المقولات (উদ্ধৃতিসমূহ), فن التأويل (বিশ্লেষণ শিল্প) ও الكون

---

২৮৯. ড. হাসান ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলাম* (বৈরুত: দারুল জিল, ১৪১১ হি./১৯৯১ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ.৩৮৮

২৯০. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

২৯১. জুরজি যায়দান,*তারিখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড, পৃ.৯৬

(সৃষ্টিজগৎ)।[২৯২] দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিন্দীও (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখেন। তিনি গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানার জন্য গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করেন এবং সিরীয়ও ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করে উভয় ভাষা থেকে অসংখ্য দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তিনি খলিফা আল-মামুন (৭৮৬-৮৩৩ খ্রি.), আল-মুতাসিম বিল্লাহ (৭৯৬-৮৪২ খ্রি.), মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিক বিল্লাহ (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) ও খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ (৮২২-৮৬১ খ্রি.)-এর রাজত্বকালে অনুবাদক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে المجسطى (দ্যা ম্যাগনেট) এবং الادوية المفردة (অনন্য ঔষধ) গ্রন্থদ্বয় উল্লেখযোগ্য।[২৯৩]

علم الطب (চিকিৎসাশাস্ত্র)

আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন। গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাবতীয় গ্রন্থ তৎকালীন মুসলিম পণ্ডিতগণ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। মূলত খলিফাদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদের মাধ্যমে এ যুগে পঠন-পাঠন অব্যাহত থাকে। বাগদাদে খলিফা হারুন-অর-রশিদ (১৭০-১৯৩ হি./৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) কর্তৃক নির্মিত 'বিমারিস্তান' (bimarestan) হাসপাতালটি পারস্যের আদলে তৈরী করা হয়েছিল। আর এই হাসপাতালের তৎকালীন প্রধান ছিলেন জিব্রিল ইবনে বখতিশু (মৃ. ৮২৮/৮২৯ খ্রি.) নামে একজন খ্রিস্টান।[২৯৪] ৯০০-১২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে আব্বাসীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। এসময়ে তারা ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের পথনির্দেশক। পূর্বে আব্বাসীয়রা গ্রীকদের অনুসরণ করে আসলেও এসময় হতে তারা চিকিৎসা বিষয়ক মৌলিক গবেষণার প্রতি মনোযোগী হন।[২৯৫] এ যুগে চিকিৎসা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। ইয়াহইয়া আরমাজানি এ প্রসঙ্গে বলেন-[২৯৬]

---

২৯২. মুহাম্মাদ হাসনাইন, *দাওরু হারাকাতিত তারজামাতি ওয়ান নাক্‌লু ফিল হায়াতিল ইলমিয়াতি ইবানাল আসরিল আব্বাসিল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫; ফাদিল মুহাম্মাদ আল হুসাইনি, *আফাকুল হাদারাতিল আরাবী য়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ* (জর্ডান: দারুশ শুরুক, ২০০৬ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৮৭

২৯৩. রাফিদাহ ইসমাইল আতাউল মান্নান ইসমাইল, *বাইতুল হিকমাতি আল বাগদাদি ওয়া আসারুহু ফিল হারাকাতিল ইলমিয়্যাতি ফিদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাতি* (সুদান: কিসমুত তারিখ, জামিয়াতু খারতুম, অক্টোবর, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৮৫

২৯৪. Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt*, ibid, p. 112

২৯৫. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল বুলিসিয়্যাহ, ১৯৮০ খ্রি.), ১০ম সংস্করণ, পৃ.৭৭৫-৭৭৭; ড. এম. এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

২৯৬. Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt*, ibid, p.112

"Among translators of Greek and Persian medical works into Arabic, as well as being distinguished physician in their own right, were Hunayn ibn-Ishaq (809-873), Youhanna ibn-Masawayh (777-857) an ophthalmologist, and Tabari, only to name a few."

অর্থাৎ "গ্রীক ও পারস্য চিকিৎসা বিষয়ক আরবী অনুবাদকারী এবং অন্যান্য বিখ্যাত চিকিৎসাবিদদের মধ্যে হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.), ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) নামক চক্ষু চিকিৎসাবিদগণ ও তাবারির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

মুসলিম খলিফাগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানচর্চার জন্য উন্নতমানের হাসপাতাল ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খলিফা আল-মানসুর (১৩৬-১৫৮ হি./৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাবলি অনুবাদ করার জন্য সিরিয়ার জুন্দিশাপুরের সৈন্যদের প্রধান চিকিৎসক জরজিস বিন বখতিশু (মৃ. ১৫২ হি./৭৬৯ খ্রি.)-কে দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রীক গ্রন্থাবলি বিশেষত চিকিৎসা বিষয়ক অনেক গ্রীক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[২৯৭]

আব্বাসীয় যুগে হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.), আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.), কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.), আবু সাহাল আল-ফাযাল বিন নওবখত (মৃ. ৮১৮ খ্রি.), মান্‌কা আল-হিন্দি প্রমুখ সাহিত্যিকের অনুবাদের কারণে চিকিৎসাশাস্ত্র আরো বিকশিত হয়। চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাবলি অনুবাদের ক্ষেত্রে হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। তার চিকিৎসা বিষয়ক অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ; كتاب فى العظام (হাড় বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ), كتاب فى العروق (শিরা বিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ), كتاب العلل والأمراض (রোগ ও রোগের উপসর্গ বিষয়ক গ্রন্থ), كتاب نبض الكبير (পালস সম্পর্কিত গ্রন্থ), كتاب فى علم الأبقراط بالتشريح (হিপোক্রেটিসের অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা গ্রন্থ), كتاب فى تشريح الرحم (জঠর ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত গ্রন্থ) تقسيم كتاب الرأس لأبقراط (হিপোক্রেটিসের প্রধান গ্রন্থগুলোর শ্রেণিবিন্যাস), تفسير كتاب الجنين لأبقراط (হিপোক্রেটিসের ভ্রূণ গ্রন্থের বিশ্লেষণ), كتاب البول (মুত্রনালি সম্পর্কিত গ্রন্থ), كتاب الأدوية

২৯৭. *মুহাম্মাদ হাসনাইন, দাওরু হারাকাতিত তারজামাতি ওয়ান নাক্‌লু ফিল হায়াতিল ইলমিয়াতি ইবানাল আসরিল আব্বাসিল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

المفردة (অনন্য ঔষধ বহি) ইত্যাদি।[২৯৮] এছাড়াও ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) কর্তৃক অনূদিত চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, كتاب الإسهال (ডায়রিয়া সম্পর্কিত গ্রন্থ), كتاب علاج الصحاح (রোগ নিরাময়ের গ্রন্থ), كتاب الفصد و الحجامة (রক্তপাত ও শিঙ্গা লাগানো বিষয়ক গ্রন্থ), كتاب الأغذية (পুষ্টি বিষয়ক গ্রন্থ) এবং كتاب إصلاح الأدوية السهلة (সহজ পদ্ধতিতে রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত গ্রন্থ)।[২৯৯]

علم الفلك (জ্যোতির্বিদ্যা)

আব্বাসীয় যুগে যেসমস্ত বিষয়ে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। মানবসভ্যতার শুরু থেকেই মানুষের মনে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র বিষয়ে জানার আগ্রহ জন্ম নেয়। মুসলমানরা গ্রীকদের মতো জ্যোতির্বিদ্যাকে গণিতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করত। তাদের নিকট এটি আকাশ বিজ্ঞান বা علم الفلك নামে পরিচিত ছিল।[৩০০] 'আরকান্দ' ও 'সিদ্ধান্ত' নামক ভারতীয় গ্রন্থদ্বয়ের প্রভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে মুসলমানদের অগ্রগতি সূচিত হয়েছিল। মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ ধর্মীয় কারণে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। দৈনিক পাঁচবার নামাজ বিশেষকরে রাতের নামাজের সময় নির্ধারণের জন্য জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।[৩০১] জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি খলিফা আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)-এর বিশেষ আগ্রহ ছিল। কোনো কাজ করার পূর্বে তিনি জ্যোতির্বিদদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে সেই মোতাবেক কাজ করতেন। পারসিক জ্যোতির্বিদগণ তার দরবারে ভিড় জমাতেন এবং খলিফা তাদেরকে জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য উৎসাহ দিতেন।[৩০২]

পাহলভী ভাষায় জ্যোতিষ্ক সারণির অনুবাদ এবং টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি.) المجسطى (দ্যা ম্যাগনেট)-এর অনুবাদ জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুশীলনের পথকে আরো প্রশস্ত করে। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত (برهمكيت)-এর জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত বিষয়ে السدهانت (সিদ্ধান্ত)

---

২৯৮. *মুহাম্মাদ হাসনাইন, দাওরু হারাকাতিত তারজামাতি ওয়ান নাক্‌লু ফিল হায়াতিল ইলমিয়াতি ইবানাল আসরিল আব্বাসিল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৩০০. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৩০১. জুরজি যায়দান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫-১৫৬

৩০২. আব্দুর রহমান হিকমত নাজিব, *দিরাসাতু ফি তারিখিল উলুমি ইন্দাল আরব* (ইরাক: জামিয়াতুল মুসিল, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৮৩

মৌলিক গ্রন্থটি কংক নামক একজন হিন্দু পণ্ডিত বাগদাদে নিয়ে আসেন। ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতির্বিদ্যার বিখ্যাত পণ্ডিত মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহিম আল-ফাজারী (৭৪৬-৮০৬খ্রি.) খলিফার অনুরোধে السندهند গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। পাঁচ খণ্ডের এ গ্রন্থটি অনুবাদের মাধ্যমেই আরববিশ্ব ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান, সংখ্যা ও গণনা পদ্ধতির সাথে প্রথম পরিচিত হয়ে নিজেদের মাঝে তার প্রচলন শুরু করেন।[৩০৩]

আব্বাসী যুগে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত যেসকল গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুহাম্মাদ বিন মুসা আল-খাওয়ারাজিমী (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) কর্তৃক টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি.) المجسطى (দ্যা ম্যাগনেট) গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ صورة الأرض (পৃথিবীর চিত্র), ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে আরবী অনূদিত السند هند الكبير গ্রন্থটির পুন:অনুবাদ السندهند الصغير, কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.) কর্তৃক অনূদিত كتاب تحرير المساكن بالفلك (জ্যোতির্বিদ্যায় আবাসন সমাধান), সাবিত বিন কুর্‌রাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.) কর্তৃক অনূদিত كتاب الكرة المتحركة (চলন্ত গোলকের গ্রন্থ) ও كتاب الأشكال الكرية (বৃত্তাকার গোলকের গ্রন্থ) এবং ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (মৃ. ২০০হি/৮১৫ খ্রি.) কর্তৃক অনূদিত প্লেটোর طيماوس /Timaeus (বিশ্বতত্ত্ব ও ভৌত জগত সম্পর্কিত গ্রন্থ)।

علم الجغرافية (ভূগোলবিদ্যা)

ভূগোলবিদ্যা আব্বাসীয় যুগের আরবী অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মক্কায় পবিত্র কা'বা ঘরের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য উক্ত ঘরকে কেবলামুখী করার ধর্মীয় আবশ্যিকতা ভূ-বিদ্যা পঠন-পাঠনে মুসলমানদের উৎসাহ যুগিয়েছিল। এছাড়া সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ও ইসলামী শক্তিকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রেরণা ভৌগলিক জ্ঞানের চাহিদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল। মূলত মুসলমানগণ ইসলামের বিজয় ও বাণিজ্যের মাধ্যমে পৃথিবী সম্পর্কে অবহিত হয়। আব্বাসীয় যুগে অনেক ভূপর্যটক, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ও ভূগোলবিদদের উদ্ভব হয়; যারা তাদের পর্যবেক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের ফলে তারা নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে ভিন্নরূপ জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন। তাদের ইরান, মিশর ও সিন্ধু বিজয়ের ফলে একদিকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাচীন শিক্ষা সভ্যতার সন্ধান মিলে, অন্যদিকে

---

৩০৩. Philip K Hitti, *ibid*,p. 309-310; জুরজি যায়দান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫-১৫৬

ভূগোল বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। এ উন্নতি সাধনে মুসলমানগণ শুধু গ্রীক গ্রন্থাবলির সাথে পরিচিত ছিলেন না; বরং তারা অনারব সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতীয় ও পারসিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাসমূহের ব্যাপারেও জ্ঞাত ছিলেন।[৩০৪]

আব্বাসীয় যুগে ভূগোল বিষয়ে যেসমস্ত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল তন্মধ্যে সাবিত বিন কুর্‌রাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.)-এর كتاب جغرافيا فى المعمورة وصفة الأرض (ভূগোল: পৃথিবী ও ভূমির বর্ণনা) ও ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (মৃ. ২০০ হি/৮১৫ খ্রি.)-এর العالم والأثر العلوية (পৃথিবীতে ঊর্ধ্ব জগতের প্রভাব) নামে অ্যারিস্টটলের 'Meteorology'এর অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

علم الرياضيات (গণিতশাস্ত্র)

আব্বাসী যুগে মুসলিম বুদ্ধিদীপ্ত সমাজে গণিতশাস্ত্র চর্চায় অগ্রগতি সাধিত হয়। পবিত্র আল-কুরআনে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টননীতিমালা থাকায়, তা বাস্তবায়নে গাণিতিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়ে। গণিতশাস্ত্রের মধ্যে علم الحساب (পাটিগণিত)-এর প্রতি মুসলিমরা সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়। এ বিদ্যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে বহু সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, রাজস্ব ও কর আদায়, যাকাত নির্ধারণ, উত্তরাধিকার বণ্টন, বিভিন্ন ক্ষতিপূরণের হিসাব ইত্যাদি। জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সাথে এ যুগে বাগদাদে গণিতের অনুশীলন শুরু হয় বহুমাত্রিকভাবে। আল-ফাজারী (মৃ. ৭৯৬/৮০৬ খ্রি.) কর্তৃক ভারতীয় গ্রন্থ 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' السند هند নামে আরবীতে অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয় গণনায় সংখ্যা পদ্ধতি, অঙ্কপাতন, দশমিক পদ্ধতি ও শূন্য-এর সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম পরিচয় ঘটে।[৩০৫]

বাগদাদে খলিফা আল-মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিজ্ঞান ও গবেষণাগার 'বাইতুল হিকমা' এর বিখ্যাত গণিতবিদ বিজ্ঞানী মুহাম্মাদ বিন মুসা আল-খাওয়ারেজমি (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষত গণিতের জগতে বিশেষ অবদান রাখেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ حساب الجبر والمقابلة (বীজগণিত ও সমীকরণ)-এর (الجبر) শব্দ থেকে 'Algebra' নামের উৎপত্তি। আর এ গ্রন্থটি দ্বাদশ শতকে ক্রোমোনার জিরার্ড আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি ষোড়শ

---

৩০৪. জুরজি যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; Yahya Armajani, ibid, p. 113.

৩০৫. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, পৃ. ৭৭৮

শতক পর্যন্ত ইউরোপিয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গণিতের প্রধান পাঠ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৩০৬] অনুরুপভাবে সাবিত বিন কুর্‌রাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.) আব্বাসী যুগে গণিতশাস্ত্র অনুবাদের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অবদান রাখেন। তিনি যুক্তিবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের ১৫০ এর অধিক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন।[৩০৭] তিনি গণিত বিষয়ক অনেক গ্রন্থ পরিমার্জন ও সংশোধন করে পুনরায় অনুবাদ করেন। যেমন: তিনি টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি.) المجسطى (দ্যা ম্যাগনেট) গ্রন্থটি সংশোধন করে পুনরায় অনুবাদ করার কারণে তা সহজবোধ্য ও সাবলীল হয়ে উঠে।[৩০৮] এছাড়াও তার كتاب الأرثماطيقى فى علم العدد (সংখ্যাবিজ্ঞান ও পাটিগণিত) ও المدخل إلى علم العدد (সংখ্যাবিজ্ঞানের ভূমিকা) গ্রন্থদ্বয় গণিত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম।

علم الهندسة (স্থাপত্যশিল্প)

আরবরা শিল্প এবং সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ শাখায় উন্নতি সাধন করলেও সামগ্রীকভাবে স্থাপত্যশিল্পকে খুব সমৃদ্ধশালী করতে পারেনি। কারণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে শিল্পকলার কিছু দিক সীমিত থাকায় মুসলমানগণ শিল্পকলা চর্চার প্রতি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। ফলে তারা শিল্পকলা চর্চা হতে দূরে থাকেন। কিন্তু বাইজেন্টিয়ানের খ্রিস্টান এবং ইরানের জরথুস্ত্রগণের ধর্মীয় শিল্পকলার সংস্পর্শে এসে আরবগণ বেশিদিন নিষ্প্রাণ থাকতে পারেনি। ফলে তারা ইসলামের ধর্মীয় গণ্ডিকে ছাড়িয়ে শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন করেন।[৩০৯] উমাইয়্যা স্থাপত্যশিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট স্থাপনাগুলোর মধ্যে এখনো যেগুলো টিকে আছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দামেস্কের ' উমাইয়্যা মসজিদ' এবং জেরুজালেমের 'প্রস্তরের গম্বুজ' (Dome of the Rock)। ঐতিহাসিকদের মতে, সাধারণত উমাইয়্যা স্থাপত্যশিল্পে বাইজেন্টাইন এর প্রভাব এবং আব্বাসীয় স্থাপত্যশিল্পে পারস্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রাণীর ছবি আঁকা নিষেধ থাকার ফলে তৎকালীন সময়ে মসজিদগুলো রঙিন টালি দ্বারা অলংকৃত করা হতো।[৩১০] খলিফা আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) তার শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ়করণ এবং বাগদাদ নগরীর উন্নতিকরণে খুবই মনযোগী

---

৩০৬. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১

৩০৭. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত* (বৈরুত: দারুল মা'য়ারিফ, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৩৩

৩০৮. আলী বিন আব্দুল্লাহ আদ-দিফয়ী, *আল-উলুমুল বাহতাতু ফিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতি ওয়াল ইসলামিয়্যাহ* (বৈরুত: মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৭৭

৩০৯. Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt*, ibid, p. 117; মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৯ খ্রি.), ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ. ৩২৭

৩১০. Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt*, ibid, p. 118

ছিলেন। এজন্য তিনি স্থাপত্যশিল্প বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।[৩১১] তিনি প্রকৌশল বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ করে সেগুলো অনুবাদের জন্য প্রখ্যাত অনুবাদক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিন মাতারকে (৬৬১-৭১৪ খ্রি.) নির্দেশ প্রদান করেন। ইউহান্না বিন মাতার (৬৬১-৭১৪ খ্রি.) খলিফার নির্দেশে টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি.) المجسطى (দ্যা ম্যাগনেট) আরবী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটি আরবী ভাষায় পুন:অনুবাদ করেন।[৩১২]

এমনিভাবে আব্বাসীয় যুগে প্রকৌশল বিষয়ে যেসমস্ত গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কি (৮২০-৮৯৯ খ্রি.) কর্তৃক প্লেটোর أصول الهندسة (প্রকৌশল বিদ্যার মূলনীতি), সাবিত বিন কুর্‌রাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.) কর্তৃক আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রি.পূ.)-এর كتاب الأصول الهندسة (প্রকৌশল বিদ্যার মূলনীতি সম্পর্কিত গ্রন্থ), ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিন মাতার (মৃ. ৮৩৩ খ্রি.)-এর গ্রীক গ্রন্থ 'আকলিদ্‌স' এর আরবী অনুবাদ كتاب الأصول أو كتاب الأركان (মূলনীতির গ্রন্থ/সোপান গ্রন্থ) উল্লেখযোগ্য।[৩১৩]

علم الكيمياء (রসায়নশাস্ত্র)

রসায়নশাস্ত্র আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের অতি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কুরআন, হাদীস, তাফসির ও ফিকহ্-এর বিভিন্ন বিষয় চর্চা উমাইয়্যা যুগের মূখ্য বিষয় হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তারা উন্নতি লাভ করেছিল। গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাদের যথেষ্ট ভালোবাসা ও ঝোঁক ছিল। উমাইয়্যা যুগে খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন মু'য়াবিয়া (৬৩৫-৭০৪/৫ খ্রি.) প্রথম ব্যক্তি যিনি الطب (চিকিৎসা) ও الكيمياء (রসায়ন) শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন।[৩১৪] তার অনুবাদকর্ম সম্পর্কে আল-জাহিজ বলেন:[৩১৫]

---

৩১১. ইবনে কাসির, *আল বিদায়্যাতু ওয়ান নিহায়্যাতু* (বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ, ১৯৮৫ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১২৬

৩১২. জামালুদ্দিন আলী ইউসুফ আল-কাফাতি, *তারিখুল হুমামা* (মাকতাবাতুল মুসান্না, তা.বি), পৃ. ৯৯ ও ২৭০; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত* (বৈরুত: দারুল মাসিরাহ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৩৩ ও ৩০৪

৩১৩. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ বিন খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমাহ* (বৈরুত: দারুল জিল, ১৯৮২ খ্রি.), ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৩৭ ও ৪৮৫

৩১৪. সাঈদ আবদুল ফাত্তাহ আশুর ও অন্যান্য, *তারিখুল হাদারাতিল ইসলামিয়্যাতি* (কুয়েত: মানশুরাতি দারুস সালাসিল, ১৯৮৬ খ্রি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৩১৫. আবি উসমান ওমর বিন ইয়াজির আল-জাহিজ, *আল-বাইয়ানু ওয়াত তাবয়িন* (দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৮৯ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৮

وكان خالد بن يزيد بن معاوية خطيبا شاعرا وفصيحا جامعا وجيد الرأى كثير الأدب و كان أول من ترجم كتب النجوم والطب و الكيمياء.

অর্থাৎ "খালিদ ইবনে ইয়াজিদ বিন মু'য়াবিয়াহ ছিলেন খতিব, কবি, বাগ্মী, ভালো অভিমত পেশকারী ও সাহিত্যিক। তিনি সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ও রসায়ন বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ করেন।"

আব্বাসী যুগে অনুবাদ সাহিত্যের বিস্তার লাভ করলে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে রসায়নবিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়। ফলে এ যুগে রসায়নশাস্ত্রের উষ্ণীকরণ (calcination), লঘূকরণ (reduction), বাষ্পীয়করণ (evaporatin), উর্ধ্বপাতন (sublimation), তরলীকরণ (melting) এবং স্ফটিককরণ (crystallization) প্রভৃতি সূত্রগুলোর উৎকর্ষ সাধিত হয়।

علم الموسيقى (সঙ্গীতশিল্প)

জাহেলী যুগের কবিরা তাদের কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে সঙ্গীতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তারা নিজেদের কবিতা নিজেরাই সঙ্গীতের আদলে আবৃত্তি করতেন এবং সঙ্গীতের সঙ্গে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন। এ যুগে বিভিন্ন মদের দোকানে এবং গোত্রসমূহের কায়িনাত, কাজিনাত ও মুগিনাতের সঙ্গে সঙ্গীতশিল্প বিদ্যমান ছিল। এ সময়ে মুযহির, দাফ, সানজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল।[৩১৬]

অবশ্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাম্মাদ (স.) সঙ্গীত শুনতে ও চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। সঙ্গীতের সুর মূর্ছনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে তিনি কর্ণকুহুরে অঙ্গুলী প্রবেশ করাতেন। মুহাম্মাদ (স.) বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে সাবধান বাণী উল্লেখ করে বলেছেন-[৩১৭]

ان الله عز و جل بعثني رحمة و هدى للعالمين و أمرني ان أمحق المزامير والكنرات يعني البرابط والمعازف والاوثان التى كانت تعبد فى الجاهلية.

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে জগতসমূহের রহমত ও হেদায়েত স্বরূপ পাঠিয়েছেন এবং বাঁশি, সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র এবং জাহেলী যুগে যেসমস্ত মূর্তির পূজা করা হতো সেগুলো ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেছেন।"

মুহাম্মাদ (স.) গান শুনাকে অন্তরে মুনাফেকি সৃষ্টির মাধ্যম মনে করতেন। যেমন হাদিসে এসেছে:[৩১৮]

---

৩১৬. ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

৩১৭. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, *আল-মুসনাদ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪২১

الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرعة. অর্থাৎ "গান অন্তরে নিফাকের (মুনাফেকি) সৃষ্টি করে, যেমন পানি ফসলের উৎপাদন করে।" ধর্মীয় অনুমোদন না থাকায় মুহাম্মাদ (স.)-এর সময় সঙ্গীত চর্চা উন্নতি লাভ করেনি। কিন্তু উমাইয়্যা যুগে এ শিল্পের ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়। এসময় বিভিন্ন অঞ্চলের বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা ও বাদকরা রাজদরবারে আগমন করতেন এবং এ কাজে নির্ধারিত হারে সম্মানী পেতেন। সেসময়ে 'মুখান্নাসুন' (নপুংসক) নামক একদল লোক সঙ্গীতজীবী হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন।[৩১৯]

আব্বাসীয় যুগে সঙ্গীতশিল্প ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এ যুগে সঙ্গীত চর্চায় মুসলমানগণ আকৃষ্ট হয় পড়ে। সর্বপ্রথম খলিফা আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত চর্চা শুরু হয়েছিল।[৩২০] খলিফা হারুন-অর-রশিদ (১৭০-১৯৩ হি./৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) মার্জিত ও জাঁকজমকপূর্ণ রাজসভা শিল্প ও বিজ্ঞানের মতো সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষতা করায় এতে বহু সঙ্গীত শিল্পীর মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বেতনভোগী সঙ্গীত শিল্পী ছাড়াও রাজদরবারের দাস-দাসীদের মধ্যেও বহু কণ্ঠশিল্পী ছিল। এ আমলে যেসব গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়েছিল তার মধ্যে অল্প কয়েকটি সঙ্গীতশাস্ত্রও ছিল। অ্যারিস্টটলের এরূপ দু'টি গ্রন্থকে হুনাইন বিন ইসহাক كتاب فى النفس (মানবাত্মার গ্রন্থ) এবং গ্যালনের একটি গ্রন্থ كتاب الصوت (ধ্বনিতত্ত্ব) নাম দিয়ে অনুবাদ করেন।[৩২১]

علم القانون (আইনশাস্ত্র)

আব্বাসীয় যুগে আইনশাস্ত্রের পরিসর ছিল সুবিস্তৃত। আরব শাসকগণ নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপাদান হতে সাহায্য অনুসন্ধান করতেন। তাই এ আমলেই ব্যাপকভাবে আইন ও বিচারশাস্ত্র চর্চার মধ্য দিয়ে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে একটি স্বনির্ভর বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠে। এ বিচারব্যবস্থাকে বলা হতো 'ফিকহ্'। কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে এ বিচারব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে বিশাল আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ইসলামের মর্মবাণী ও অনুশাসন ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কুরআনে উদ্ধৃত ও হাদিসে বিশ্লেষিত আল্লাহর বিধান ফিকহের মাধ্যমে জনগণের

---

৩১৮. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, ৫ম খণ্ড, পৃ.২২৩; আহমাদ বিন হুসাইন আল-বাইহাকি, *আস-সুনানুল-কুবরা* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি), ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩

৩১৯. তারিখুল মুশকিলিল আরাবিয়্যাহ, পৃ. ৯৪

৩২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৩২১. মুহাম্মদ রেজা-ই-করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০ ও ৩৩১

নিকট সহজভাবে তুলে ধরা হতো। নতুন নতুন বিজিত রাজ্যসমূহে সেখানকার জাতীয়তা ও কৃষ্টি-কালচারের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দেওয়ানি, ফৌজদারি, রাজনৈতিক ও আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত পরিসরে আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ পরিস্থিতি থেকেই চিন্তা-বিবেচনা ও বুদ্ধিবৃত্তি الإجماع (ইজমা)[৩২২] এবং القياس (কিয়াস)[৩২৩] নামে দু'টি মৌলিক নীতির সংযোজন ঘটে।[৩২৪]

প্রাথমিক আব্বাসীয়দের শাসনামলে বিশেষত খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) ও খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) সময় বিভিন্ন গ্রন্থ অনূদিত হয়। 'বাইতুল হিকমাহ' প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাবলি সংগ্রহ করে সেগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদ করা।[৩২৫] আব্বাসীয় যুগে আইনশাস্ত্র সম্পর্কিত যেসকল গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে আব্দুল্লাহ-ইবনুল মুকাফফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) কর্তৃক পাহলভী ভাষায় রচিত 'আইন নামা' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ كتاب العين (গোয়েন্দা বহি), পারস্য সাম্রাজ্যের আইন ও শাসনব্যবস্থা এবং পারসিক জাতির ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আচার, উৎসব ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কিত عين نامه (আইন নামা) এবং সাহল বিন হারুন (মৃ.

---

৩২২. ইজমা ইসলামী শারীয়াতের চারটি মূল উৎসের মধ্যে তৃতীয় এবং কার্যত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোনো ব্যাপারে একমত হওয়া। তত্ত্বগতভাবে এটি হলো আল্লাহর আরোপিত কোনো বিধান সম্পর্কে উম্মাতের সর্মসম্মত ঐকমত্য। পরিভাষায় কিয়াস বলতে যেকোনো যুগের স্বীকৃত মুজ্তাহিদগণের সর্বসম্মত ঐকমত্যকেই বুঝায়। এক্ষেত্রে মুজ্তাহিদগণ কুরআন ও সুন্নাহর নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান প্রদান করে থাকেন। দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৭৩৮। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ উসুলবিদগণের মতে ইজমা হলো-

إنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه و سلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স.)-এর তীরধানের পরবর্তী বিভিন্ন যুগে শারীয়াতের কোনো বিধানের ব্যাপারে তাঁর উম্মাতের মুজতাহিদগণের ঐকমত্য। দ্র. ড. ওয়াহাবাহ আজ-জুহাইলী, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামী* (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ২০০৬ খ্রি.), ১ম খণ্ড, ১৪তম সংস্করণ, পৃ. ৪৬৯

৩২৩. কিয়াস অর্থ তুলনা করা, একটির সাথে অন্যটির সাদৃশ্য নির্ধারণ করা। অর্থাৎ যে বিষয়ে কোনো অকাট্য-স্পষ্ট দলীল নেই নেই কোনো ইজমা সেই বিষয়টিকে অপর এমন একটি বিষয়ের সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করা, যে বিষয়ে শরীয়াতের স্পষ্ট-অকাট্য দলীল আছে কিংবা যে বিষয়ে কোনো ইজমা হয়েছে এবং এ শেষোক্ত বিষয়ে শরীয়াতের যে-হুকুম, সেই হুকুমকে প্রথমোক্ত বিষয়ে প্রয়োগ করা। এ প্রয়োগের মূল কারণ হলো এই যে, ঠিক যে-কারণে এ বিষয়ে কোনো অকাট্য হুকুম হয়েছে, আলোচ্য বিষয়টিতে সেই কারণটিও বর্তমান রয়েছে। সুতরাং কিয়াসের পারিভাসিক সংজ্ঞা হলো-

فالمراد با لقياس هو اظهار ان حكم الله فى الفرع هو حكمه فى الاصل المقيس عليه.

অর্থাৎ কিয়াস বলতে বুঝায় একথা প্রকাশ করা যে, শাখা বিষয়ে আল্লাহর হুকুম তা-ই যা মূল বিষয়ে আল্লাহর হুকুম। এ মূল বিষয়টি বিবেচনা করেই শাখা বিষয়েও অনুরূপ হুকুম আরোপ করাকেই বলা হয় কিয়াস। দ্র. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১১২৭ হি/২০০৬ খ্রি.), ৩য় প্রকাশ, পৃ. ১২৮

৩২৪. ড. এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

৩২৫. Yahya Armajani, *Middle East Past and Presenttt,* ibid, p.97

৮৩০ খ্রি.) কর্তৃক অনূদিত শাসক ও রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত تدبير الملك والرئاسة (রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা) গ্রন্থগুলো উল্লেখযোগ্য।[৩২৬]

السيرة الذاتية (জীবনচরিত)

আব্বাসীয় শাসনামলে জীবনচরিতমূলক মৌলিক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনীগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। এসব অনূদিত গ্রন্থে সমাজ-সভ্যতা, কলা, সংস্কৃতি, ধর্মীয়-রাজনীতি প্রভৃতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জীবনের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন শাসক, মনীষী, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বিখ্যাত মানুষের মেধা মননশীলতা, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, চিন্তাধারা, মূল্যবোধসহ প্রভৃতি বিষয় জানার জন্য জীবনচরিত রচনা আব্বাসীয় যুগের এক স্বতন্ত্র সাহিত্যশিল্পে অগ্রগতি সাধিত হয়। এ যুগে জীবনচরিতমূলক যেসমস্ত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আব্দুল্লাহ-ইবনুল-মুকাফফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.)-এর পারসিক ধর্মসংস্কারক মাযদাকের[৩২৭] জীবনীগ্রন্থ كتاب مزدك (মাজদাকের জীবনচরিত), পাহলভী ভাষায় রচিত বাদশাহ আনুসিরওয়ানের জীবনচরিতমূলক গ্রন্থ كتاب التاج في سيرة أنوسوان (আনুসিরওয়ানের অনন্য জীবনচরিত)।[৩২৮]

الكتب المترجمة حول القصة (গল্প বিষয়ক অনূদিত গ্রন্থ)

পৃথিবীর অন্য যেকোন সাহিত্যের চেয়ে আরবী সাহিত্য বেশি সমৃদ্ধশালী। এ সাহিত্যে আরবদের বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ কোনো জাতি নয়, বরং সমগ্র মানবসভ্যতারই প্রতিফলন ঘটেছে এ সাহিত্যে। বিশেষত আব্বাসীয় শাসনামলে বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণে এক নতুন সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। এ সময় প্রাচীন দুর্লভ গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে সমাজ জীবনে শিক্ষামূলক বিষয় রসাত্মকভাবে তুলে ধরা হতো।

আব্বাসীয় শাসকগণ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। আরবী ভাষাতত্ত্ব ও শব্দ বিজ্ঞানে আরবদের মৌলিক অবদান থাকলেও আরবী বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার কেবল আরবদের সৃষ্টি

---

৩২৬. ইবনে নাদিম, আল-ফিহরিস্ত, (বৈরুত: দারুল মায়া'রিফ, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৫০; ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১ ও ৯৪

৩২৭. তার পুরো নাম হলো মাজদাক বিন মোবজান (مزدك بن موبذان)। তিনি ৪৬৭ বা ৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তৎকালীন রাজা তাকে এবং তার অনুসারীদের হত্যা করেন

৩২৮. P.K.Hitti, *History of the Arabs*, ibid, p. 308

নয়। বরং তা তৎকালীন বহু ভাষিক ও বহু জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত বিশাল ইসলামী বিশ্বের আরব অনারব সকলের সম্মিলিত মেধা ও মননের ফসল। আব্বাসীয় বিপ্লবের পর আরব জাতিসত্তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্য নষ্ট হয়। এ সময় থেকে আরবদের বৌদ্ধিক প্রাধান্য লোপ পাওয়ায় সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনারবদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয় স্বর্ণযুগে সাম্রাজ্যের জাতিসত্তার মধ্যে এক নতুন সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠে। আব্বাসীয়দের মূল স্লোগান ছিল সংস্কৃতির যা কিছু মঙ্গলজনক তার আত্মীয়করণ।[৩২৯]

আব্বাসীয় শাসনামলে গল্প বিষয়ক সাহিত্য রচনা ও অনুবাদে একদল পণ্ডিত আত্মনিয়োগ করেন। তাদের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষ আব্দুল্লাহ-ইবনুল-মুকাফফা (৭২৪-৭৪৯ খ্রি.) একজন বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন, যিনি দুষ্প্রাপ্য অনেক মূল্যবান গল্পগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাছাড়া গ্রীক, ফারসী, সুরিয়ানী ও আরবী ভাষায় দক্ষ অনুবাদক হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.), আবু বিশার মুতি ইবন ইউনুস (৮৭০-৯৪০ খ্রি.), ইউহান্না বিন আল-বাতরিক , কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী প্রমুখ অনুবাদকের নাম উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য জগতে গল্প বিষয়ে অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে প্রথম আব্দুল্লাহ-ইবনুল-মুকাফফার 'কালিলা ওয়া দিমনা' (كليلة و دمنة) গ্রন্থটি নির্ভুল ও নিখুঁত গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পশু-পাখির প্রতিকী ভাষায় ব্যক্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এসকল কাহিনীর 'হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র' নামে একাধিক সংকলন পাওয়া যায়। এ গল্পগ্রন্থটির মাধ্যমে আরবী সাহিত্য জগতে শিল্পকলা সাহিত্যের বিপ্লব ঘটে। গ্রন্থটি পরবর্তীতে পৃথিবীর প্রায় ৪০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়।[৩৩০]

এ গ্রন্থটি মূলত কতগুলো উপদেশমূলক কাহিনী, যা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে জীব-জন্তুর প্রতিকী ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। এ গল্পগুলো মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনবোধকে জাগ্রত করে। উদাহরণত কোনো ব্যক্তি যদি প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয়ে সমাজে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চান এবং উপার্জিত সম্পদ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ ও ব্যয় করে পরকালে এর সুফল ভোগ করতে চান তাহলে তার

---

৩২৯ ড এম.এম. শরিফুল বারী, *আব্বাসীয় খিলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

৩৩০. P.K.Hitti, *ibid,* p. 308; জি.এম. মেহেরুল্লাহ, *আরবী কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য* (ঢাকা: নাহদা প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, ২০১৪, পৃ.৩৪-৩৫

করণীয় সম্পর্কে 'কালিলা ও দিমনা' গ্রন্থটির 'এক বৃদ্ধ ও তার তিন ছেলে' শীর্ষক গল্পটির কিয়দাংশ এখানে উদ্ধৃত হলো।[৩৩১] যেমন-

مثل الشيخ وبنيه الثلاثة

قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف وهو رأس البراهمة: اضرب لي مثلاً لمتحابين يقطع بينهما الكذوب المحتال، حتى يحملهما على العداوة والبغضاء. قال بيدبا: إذا ابتلي المتحابان بأن يدخل بينهما المكذوب المحتال لم يلبثا أن يتقاطعا ويتدبرا وافة المودة النميمة، ومن أمثال ذلك أنه كان بأرض دستاوند رجل شيخ له ثلاثة بنين. فلما بلغوا أشدهم أسرفوا في مال أبيهم ولم يكونوا احترفوا حرفة يكسبون بها لأنفسهم خيرا؛ فلامهم أبوهم ووعظهم على سوء فعلهم. وكان من قوله لهم: يا بني إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لن يدركها إلا بأربعة أشياء. أما الثلاثة التي يطلب فالسعة في الرزق والمنزلة في الناس والزاد للآخرة. وأما الأربعة التي يحتاج إليها في درك هذه الثلاثة؛ فاكتساب المال من أحسن وجه يكون. ثم حسن القيام على ما اكتسب منه، ثمَّ استثماره، ثم إنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرضي الأهل والإخوان فيعود عليه نفعه في الآخرة فمن ضيَّع شيئًا من هذه الأحوال لم يدرك ما أراد من حاجته. لأنه إن لم يكتسب لم يكن له مال يعيش به. وإن هو كان ذا مال واكتسب ثم لم يحسن القيام عليه أوشك المال أن يفنى ويبقى معدما. وإن هو وضعه ولم يستثمره لم تمنعه قلة الإنفاق من سرعة الذهاب، كالكحل الذي لا يؤخذ منه إلا غبار الميل ثم هو مع ذالك سريع فناؤه. وإن هو أنفقه في غير وجهه ووضعه في غير موضعه وأخطأ به مواضع استحقاقه صار بمنزلة الفقير الذي لا مال له، ثم لم يمنع ذلك أيضا ماله من التلف بالحوادث والعلل التي تجري عليه كمحبس الماء الذي لا تزال المياه تنصب فيه فإن لم يكن له مخرج ومفاض ومتنفس يخرج منه الماء بقدر ما ينبغي خرب وسال ونز من نواح كثرية وربما انبثق البثق العظيم؛ فذهب الماء ضياعا.

(এক বৃদ্ধ ও তার তিন ছেলে

"সম্রাট দেবশালিম তৎকালীন ব্রাহ্মণদের প্রধান দার্শনিক বায়দাবাকে বললেন, আপনি আমাকে এমন দু'জন বন্ধুর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন, যাদের মধ্যে মিথ্যুক ধোঁকাবাজ অনুপ্রবেশ করে উভয়ের মাঝে

৩৩১. ইবনুল মুকাফ্ফা, *কালিলা ও দিমনা* (কায়রো: কালিমাতু হিনদাভী, তা.বি)

হিংসা ও শত্রুতার বীজ বপন করেছে। ফলে উভয়ের মধ্যে চরম শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে। দার্শনিক বায়দাবা বললেন, দুই বন্ধুকে বিপদগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে যখন কোনো মিথ্যুক কুচক্রী অনুপ্রবেশ করে, তখন তারা পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ ও একে ওপরের দোষ অন্বেষণ করা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে দস্তাবন্দ জনপদের সেই বৃদ্ধার ঘটনা।

এক বৃদ্ধের তিন ছেলে ছিল। তারা যৌবনে পদার্পণ করেও পৈতৃক সম্পত্তি কল্যাণমূলক কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ না করে অপব্যয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পিতা তাদের কর্মকাণ্ড দেখে ভর্ৎসনা করে উপদেশস্বরুপ বললেন, ছেলেরা ! দুনিয়াদার লোকেরা তিনটি বস্তু অন্বেষণ করে থাকে, আর এ তিনটি বস্তু অন্য চারটি বস্তু ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। যে তিনটি বস্তু তারা অর্জন করে তা হচ্ছে;

১. জীবিকায় স্বচ্ছলতা।

২. সমাজে মান-সম্মান।

৩. পরকালের পাথেয়।

এর জন্য প্রয়োজনীয় চারটি বস্তু হচ্ছে;

১. সর্বোত্তম ও বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা।

২. উপার্জিত সম্পদ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা ।

৩. উপার্জিত সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বিনিয়োগ করা।

৪. জীবিকা নির্বাহ ও পরিবার পরিজন সন্তুষ্ট হয় এমন ক্ষেত্রে তা খরচ করা।

উপর্যুক্ত চারটি বিষয় অনুসরণ করতে পারলে ইহকাল ও পরকালে এর সুফল ভোগ করতে পারবে। কিন্তু এর কোনো একটিতে ত্রুটি হলে প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে না। কেননা সর্বোত্তম ও বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা সম্ভব না হলে, জীবিকা নির্বাহ আয়াসসাধ্য হয়ে পড়বে। আর সম্পদ উপার্জন করে উপার্জিত সম্পদ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং সম্পদ সংরক্ষণ করে তা বিনিয়োগে সচেষ্ট না হলে, মিতব্যয়িতা অবলম্বন করেও সম্পদের বিলুপ্তি ঠেকাতে পারবে না। যেমন, সুরমা নিতান্ত সামান্য পরিমাণ ব্যয় করা সত্ত্বেও একসময় শেষ হয়ে যায়। তাই অপাত্রে ব্যয় করলে অরক্ষিত যায়গায় সংরক্ষণ করলে অল্পদিনেই সর্বহারা নিঃস্ব ভিক্ষুকে পরিণত হতে হবে। সম্পদ চলমান ব্যাধি ও কালাবর্তনের কারণে এর ধ্বংস থেকে নিস্তার পাবে না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো অবিরাম পানি নির্গমণকারী কূপ। পানি বের হওয়ার কোনো পথ না থাকলে অবশ্যই পার ধসে সবটুকু পানি কূপ থেকে বেরিয়ে যাবে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগের অনুবাদের বৈশিষ্ট্যাবলি

আব্বাসী যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও অনুবাদ সাহিত্যের স্বর্ণদীপ্ত অধ্যায়। এসময়ে অনুবাদ সাহিত্য শুধু ভাষান্তরের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা আরবী রীতি ও ভাষা শেলীতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এ সময়ে অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ কেবল একবার অনুবাদ করেই থেমে থাকেনি; বরং একই গ্রন্থ বারংবার অনূদিত, পরিমার্জিত ও সংশোধিত হয়েছে। নিম্নে আব্বাসী যুগের অনুবাদ সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো–

১. পুনঃ ও সংশোধনমূলক অনুবাদ

জ্ঞানপিপাসু পাঠকদের নির্ভুল গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য আব্বাসী যুগে প্রথিতযশা অনুবাদকগণ বহু গ্রন্থের সংশোধিত পুন:অনুবাদ করেন। এধরণের সংশোধনমূলক অনবাদকরণকে খলিফাগণও উৎসাহিত করতেন। ফলে এ যুগে একটি গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ হয়। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) অনূদিত الرسالة القلمية গ্রন্থটি নাসিরুদ্দীন আব্দুর রহিম বিন আবি মানসুর আরবী ভাষা থেকে ফারসী ভাষায় পুন:অনুবাদ করেন।[৩৩২] কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কীর (৮২০-৮৯৯ খ্রি.) বেশ কয়েকটি গ্রন্থ পুন:অনুবাদ হয়। তাঁর পুন:অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো كتاب الأكر الذيل الذى ألحقه أبسقلاوس بكتاب الأصول لأقليدس।[৩৩৩] এছাড়া আব্বাসী যুগের পুন:অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল-কিন্দীর (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) كتاب المطالع لأبسقلاوس , الميتافيزيقيا আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন আলী হাসান আত-তুসীর (৩৪৭-৩৯৫ খ্রি.) كتاب الأيام والليل لثيودوسيوس এবং সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.)-এর كتاب الأصول, المجسطي ও علم النبات উল্লেখযোগ্য।

২. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

এযুগের অনুবাদ সাহিত্যে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক অনুবাদ। এধরণের গ্রন্থগুলোর মধ্যে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক বিখ্যাত

---

৩৩২. মুহাম্মাদ হাসান আয়াতুল্লাহ, *তারজামাতু আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬২
৩৩৩. কার্ল ব্রুকলমান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

গ্রন্থ 'Kategorias'-এর আরবী অনুবাদ كتاب قاطيغورياس গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এটি প্রথিতযশা অনুবাদক ইবনুল-মুকাফ্ফা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেন।

৩. প্রাণিকুলের প্রতীকী ভাষায় কাহিনী রূপায়ণ

আব্বাসী যুগের অনেক অনুবাদ গ্রন্থে প্রাণিকুলের প্রতীকী ভাষায় কাহিনী রূপায়ণের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি ও জীবনদর্শন তুলে ধরা হতো। ফলে গ্রন্থগুলো আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় হয়ে উঠত। এ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আব্দুল্লাহ-ইবনুল মুকাফ্ফার কালজয়ী অনুবাদ গ্রন্থ كليلة و دمنة এবং সাহল বিন হারুন (মৃ. ২১৫ হি./৮৩০ খ্রি.)-এর ثعلة وعفراء ও الثعلب والنمر গ্রন্থদ্বয়।

৪. বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের প্রাধ্যান্য

এ যুগে অনুবাদকাগণ বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রন্থ অনুবাদকরণকে অগ্রাধিকার দেন। গ্রীক ও সিরীয় ভাষা থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে বিরাট ভূমিকা রাখে। আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান তাঁর 'হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাহ' শীর্ষক গ্রন্থে পদত্ত হুনাইন বিন ইসহাকের (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) অনূদিত গ্রন্থের তালিকায় দেখা যায় তাঁর অনূদিত ১৭৩টি গ্রন্থের মধ্যে ১৪১টি হলো বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। এছাড়া কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কীর (৮২০-৮৯৯ খ্রি.), সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.), সাহল বিন হারুন (মৃ. ২১৫ হি./৮৩০ খ্রি.), ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (২০০ হি./৮১৫ খ্রি.), আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.), জরজিস বিন বখতিশু (মৃ. ১৫২ হি./৭৬৯ খ্রি.), মুহাম্মাদ বিন মুসা আল-খাওয়ারেজমী (৭৮০-৮৫০ খ্রি.), ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.), আবু সাহাল আল-ফাজাল বিন নওবখত (মৃ. ৮১৫ খ্রি.) প্রমুখ অনুবাদকগণ বিজ্ঞানবিষয়ক অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

৫. উপমা ও প্রবাদের ব্যবহার

আব্বাসী যুগের অনুবাদ সাহিত্যের আরেকটি গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মূল ভাবার্থ ঠিক রেখে উপমা ও প্রবাদের ব্যবহার। যেমন আমরা দেখতে পাই ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) কর্তৃক অনূদিত 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থের السائح والصائغ অধ্যায়ে তিনি অনেক উপমা ও প্রবাদ ব্যবহার করেছেন।

তাঁর ব্যবহৃত প্রবাদগুলোর মধ্যে বিখ্যাত একটি প্রবাদ হলো[৩৩৪]- إنك إن تلتمس رضى جميع الناس تلتمس مالايدرك. অর্থাৎ "তুমি যদি সকল মানুষের সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করো তবে যা অনুসন্ধান করছো তা অর্জন করতে পারবে না।" এ প্রবাদটি মূলত আকসাম বিন সাইফী আত-তামিমীর (মৃ. ৬৩০ খ্রি.) নিম্নোক্ত প্রবাদ থেকে নেয়া হয়েছে। رضى الناس غاية لا تدرك. অর্থাৎ "জনগণের সন্তুষ্টি একটি দুষ্প্রাপ্য লক্ষ্য।" অনুরূপভাবে সাহল বিন হারুনসহ (মৃ. ২১৫ হি./৮৩০ খ্রি.) আরো অনেক অনুবাদক তাঁদের অনুবাদ গ্রন্থে বিভিন্ন উপমা ও প্রবাদের ব্যবহার করতেন। ফলে এসময়ের অনূদিত গ্রন্থগুলো পাঠক মহলে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে।

৬. আত্মসংস্কার ও নৈতিক শিক্ষা

বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি অনুবাদের মাধ্যমে অনুবাদকগণ জ্ঞানার্জনের ধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁরা নিজে এবং অধীনস্থদের উপদেশ প্রদান ও সংশোধনের জন্য গ্রন্থ অনুবাদ করতেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা তাঁর ছেলেকে শিষ্টাচারিতা ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে الرسالة القلمية গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।

৭. পরিভাষার ব্যবহার

নির্ভুলতা ও শৈল্পিক দক্ষতায় আব্বাসী অনুবাদকগণ ভাষার সৌন্দর্য ও শুদ্ধতার প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। দর্শন, চিকিৎসা, গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতো জটিল বিষয় অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁরা উপযুক্ত আরবী পরিভাষা ব্যবহার করতেন। এক্ষেত্রে তাঁরা শব্দচয়নে ছিল দক্ষ, বাক্যগঠনে ছিল দৃঢ় আর অর্থ প্রকাশে ছিল স্বচ্ছ। এসময় অনেক নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠে, যা পরবর্তীতে ইসলামী সভ্যতার ভিত্তিকে সমৃদ্ধ করে।

৮. দূর-দূরান্তে পরিভ্রমণ

আব্বাসী যুগে অনুবাদ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো একটি নির্ভুল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সঠিক অনুবাদ উপহার দেওয়ার জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরের বিভিন্ন নগরীতে পরিভ্রমণ। এ দীর্ঘ ভ্রমণ ছিল জ্ঞানের প্রতি তাদের আন্তরিকতার প্রমাণ। যেমন বিখ্যাত অনুবাদক হুনাইন বিন ইসহাককে (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) গ্রীক ভাষা অধ্যায়ন ও প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি সংগ্রহের

৩৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২

উদ্দেশ্যে আলেকজান্দ্রিয়া, রোমান ও পারস্যসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।[৩৩৫] অনুরূপ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার পণ্ডিত ইউহান্না বিন আল-বাতরিককে (২০০ হি./৮১৫ খ্রি.) খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর সময়ে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করার জন্য রোম দেশ ভ্রমণ করেন। ফলে তিনি গ্রীক ভাষা থেকে আরবী ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি অনেক অনূদিত গ্রন্থের ভুল সংশোধন করতে সক্ষম হন।[৩৩৬]

৯. মধ্যস্থতাকারী ভাষার ব্যবহার

আব্বাসী যুগে অনুবাদ সাহিত্যের বেশিষ্ট্যাবলির মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো মধ্যস্থতাকারী ভাষার ব্যবহার। কোনো ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা অনুবাদকদের অগ্রযাত্রাকে থামাতে পারেনি। যখন মূল ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ কঠিন হতো তখন তারা একটি মধ্যবর্তী ভাষার সাহায্য নিতেন। গ্রীকসহ বিভিন্ন ভাষার অনেক গ্রন্থ প্রথমে সিরীয় ভাষায়, পরে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। যেমন, ইবনুল-মুকাফ্ফা মধ্যস্থতাকারী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় كليلة و دمنة গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থের মূল উৎস ছিল ভারতীয় সাহিত্য, যা মধ্যবর্তী ভাষার মাধ্যমে আরবী জগতে প্রবেশ করে। মূলত তিনি গ্রন্থটি পাহলভী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আল-কিন্দীর (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) বিখ্যাত 'Metaphysics' গ্রন্থটি গ্রীক ভাষায় পারদর্শী তাঁর ছাত্র চিকিৎসক اسطاث (উস্তাস) দ্বারা অনুবাদ করান এবং পরবর্তীতে তিনি নিজে তা সংযোজন-বিয়োজন করে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এছাড়া অন্যান্য কিছু অনুবাদকও এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়, আবার কখনও তৃতীয় ভাষার সহায়তায় গ্রন্থ অনুবাদ করতেন।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি ছাড়াও আব্বাসী যুগের অনুবাদ সাহিত্যে আরো অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর কারণে এ সাহিত্য আজও ইতিহাসের পাতায় অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। যেমন, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতির ব্যবহার, ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার, বাক্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিভক্তকরণ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষার ব্যহার, পাঠককে রসোদ্দীপক হাসি-ঠাট্টার মিশ্রণে সাহিত্যরস সঞ্চার, অনূদিত

---

৩৩৫. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান, *হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৩৩৬. জুরজি যায়দান, *তারিখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১; ড. হারবী আব্বাস আতিতু মাহমুদ ও ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *আল-উলুমু ইন্দাল আরাব উসুলুহা ওয়া মালামিহুহাল হাদারিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬০; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১

গ্রন্থে চিত্রের ব্যবহার, ইতিহাস ও ঐতিহ্য উপস্থাপন এবং অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থার সংস্কার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরবী অনুবাদ সাহিত্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবদান

আব্বাসী খলিফাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রাজপুত্র, মন্ত্রী এবং বিত্তশালী জ্ঞানানুরাগীরাও জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। তাঁরা উদার হস্তে অনুবাদকদের পুরস্কৃত করতেন, যেন তাঁরা প্রাচীন পণ্ডিতদের গ্রন্থ ভাণ্ডার থেকে মনোনীত জ্ঞান আহরণ করে আরবী ভাষায় রূপ দিতে পারেন। ফলে জ্ঞানের এ আদান-প্রদান এক সমৃদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়; আর বাগদাদ নগরী হয়ে উঠে তার প্রাণকেন্দ্র। খলিফা, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট অনুবাদকগণ যথাযথ মর্যাদা লাভ করতেন। ফলে পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে লেখক ও অনুবাদকগণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মিলনক্ষেত্র এ নগরীর দিকে ধাবিত হয়। সিরিয়া, পারস্য ও ভারতবর্ষ থেকে আগত জ্ঞানসন্ধানীরা এখানে এসে বসতি গড়ে তোলেন। তাঁদের সম্মিলিত সাধনায় প্রাচীন সভ্যতার গ্রন্থসমূহ নতুন জীবন লাভ করে। অনুবাদের পাশাপাশি তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ যৌথ প্রয়াসের ফলে বাগদাদ নগরী যেন জ্ঞানের এক উপচে পড়া ঝর্ণাধারায় পরিণত হয়-যেখান থেকে জ্ঞানের আলোর স্রোত ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র জগতে।[৩৩৭]

এসময় গ্রীক জ্ঞানভাণ্ডারকে আরবী ভাষায় রূপান্তরের এক মহৎ আন্দোলনের সূচনা হয়। আব্বাসীয় রাজপরিবার, বিশেষত বারমাকী বংশ এ আন্দোলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ইতিহাসে অমর। এ যুগে বাগদাদে স্থায়ী আবাসস্থল গড়া প্রসিদ্ধ পরিবারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বখতিশু পরিবারের জরজিস ইবনে বখতিশু (মৃ. ১৫২/৭৬৯ খ্রি.), বখতিশু বিন জরজিস (মৃ. ১৮৫/৮০১ খ্রি.), ইসহাক পরিবারের ইসহাক বিন হুনাইন (মৃ. ২৯৮ হি.) এবং দাউদ বিন হুনাইন। মুসা ইবনে শাকির (৮০৩-৮৭৩ খ্রি.) ও তাঁর তিন পুত্র মুহাম্মদ, আহমদ ও আল-হাসান এবং সাবিত পরিবার। তাঁদের অবদান

---

৩৩৭. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯

বাগদাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যকে দৃঢ় ও দীপ্তিময় করে তোলে। বারমাকিদের সহায়তায় বিখ্যাত অনুবাদক হুনাইন ইবনে ইসহাকে (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.) গ্রীক ভাষায় পারদর্শী হওয়ার জন্য এবং প্রাচীন মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এশিয়া মাইনরে পাঠানো হয়। তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে বিপুল ভাতা ও সম্মান প্রদান করা হয়।[৩৩৮]

আব্বাসী যুগে মন্ত্রীবর্গ কেবল প্রশাসনিক দক্ষতায় নয়, লেখনশৈলী ও সংস্কৃতি চর্চায় ছিলেন অনন্য। তাঁদের প্রজ্ঞা, পরিশীলিত রুচি ও বিদ্যাপ্রীতি রাষ্ট্রযন্ত্রকে এক নতুন মাত্রা দেয়। খলিফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)-এর মন্ত্রী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক আল-জাইয়াত (মৃ. ২৩৩ হি./৮৪৭ খ্রি.) 'সামারায়' এক সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে গ্রন্থের সমৃদ্ধিতে কখনো ভাটা পড়ত না। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রন্থ ক্রয় করতেন, অনুলিপি প্রস্তুত করাতেন, অন্য ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ করাতেন এবং গ্রন্থগুলো বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করতেন। তিনি অন্যদের গ্রন্থ উপহার দিতেন এবং নিজেও গ্রন্থ উপহার হিসেবে পেতে পছন্দ করতেন।[৩৩৯] তিনি অনুবাদক ও লেখকদের জন্য প্রতি মাসে প্রায় দুই হাজার দিনার ব্যয় করতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বহু মূল্যবান গ্রন্থ অনূদিত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ হলো كتاب الصوت, যা হুনাইন বিন ইসহাকের (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.) অনুবাদ করেন। এছাড়া খলিফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহের শাসনামলে আহমদ ইবনে আল-মুদির তাঁর সম্পদের বড় অংশ ব্যয় করতেন গ্রন্থ সংগ্রহ ও লেখকদের ভাতা বাবদ।[৩৪০]

খলিফা মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)-এর মন্ত্রী আল-ফাতহ ইবনে খাকানও (৮১৭-৮৬১ খ্রি.) ছিলেন জ্ঞানতাপসদের মধ্যে অন্যতম; যিনি গ্রন্থ সংগ্রহ ও অনুবাদকরণে উদারভাবে ব্যয় করতেন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। তাছাড়া ইতিহাসের পাতায় তিনি একজন জ্ঞাননিষ্ঠ পাঠক হিসেবেও সুপরিচিত। খলিফা যখন দরবার ত্যাগ করতেন, তখন তিনি একটি গ্রন্থ খুলে পড়ায় মগ্ন হয়ে যেতেন। রাজনীতির কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান সাধনায় মগ্ন হতেন।[৩৪১] এ ব্যক্তিগত অনুরাগই তাঁকে প্রেরণা দেয় এক বিশাল ও সুবিন্যস্ত

---

৩৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯

৩৩৯. হামিদ হাসান আদ-দামুর, *আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত তা'লিমি ফিল ইরাকী ফিল আসরিল আব্বাসীল আওয়াল* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

৩৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪

৩৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায়। তিনি নিজ উদ্যোগে একটি বিশাল গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন। আলী ইবনে ইয়াহইয়্যা আল-মুনাজ্জিম (মৃ. ২৭৫ হি./৮৮৮ খ্রি.) এ গ্রন্থাগার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "আমি এর চেয়ে সমৃদ্ধ ও সুন্দর কোনো গ্রন্থাগার কখনও দেখিনি।" ইবনে নাদীম উল্লেখ করেন যে, আলী ইবনে ইয়াহইয়্যা আল-মুনাজ্জিম এবং মন্ত্রী আল-ফাতহ ইবনে খাকানের (মৃ. ২৪৭ হি./৮৬১ খ্রি.) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাঁর জন্য একটি সুবিন্যস্ত গ্রন্থাগার নির্মাণে সহায়তা করেন। সেখানে আল-ফাতহের নিজস্ব গ্রন্থের পাশাপাশি আলী ইবনে ইয়াহইয়্যা তাঁর জন্য রচিত ও সংগৃহীত বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল, যা অন্য যেকোনো ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ ছিল। এ গ্রন্থাগারটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বসরা ও কুফার বেদুইন, ভাষাবিদ ও অনুবাদকগণ এখানে অধ্যয়ন, গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করতেন। ফলে এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা এবং অনুবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৩৪২]

ইবনে জুলজাল (মৃ. ৯৯৪ খ্রি.), সাঈদ আল-আন্দালুসী (মৃ. ৪৬২ হি.) এবং হাজী খলিফার (১৬০৯-১০৬৭ খ্রি.) বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আব্বাসী যুগের খলিফা ও মন্ত্রীগণ অনুবাদ এবং সাহিত্যচর্চায় যে পরিমাণ নিষ্ঠা ও উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য।

৩৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১-৩১২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরবী অনুবাদ সাহিত্যে বিভিন্ন পরিবারের অবদান

আব্বাসী যুগে অনুবাদ আন্দোলন ছিল এক সামষ্টিক বৌদ্ধিক জাগরণ, যেখানে একাধিক পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের পরিবারগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গ্রীক, সুরিয়ানী, ফারসী ও সংস্কৃত জ্ঞান-ভাণ্ডার আরবী ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিচে কয়েকটি প্রভাবশালী অনুবাদক-পরিবারের অবদান সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত হলো।

১. آل موسى بن شاكر (মুসা ইবনে শাকির পরিবার)

মুসা ইবনে শাকিরের (৮০৩-৮৭৩ খ্রি.) পরিবার-বিশেষত তাঁর তিন পুত্র মুহাম্মদ, আহমদ ও আল-হাসান, যারা সম্মিলিতভাবে 'বানু মুসা' নামে পরিচিত-আব্বাসীয় যুগের অনুবাদ-আন্দোলন ও বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে। গ্রন্থের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহে অকুণ্ঠ অর্থব্যয়ের জন্য তাঁরা সুপরিচিত ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য রোম দেশে তাঁরা দূত প্রেরণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন দেশের দক্ষ অনুবাদকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[৩৪৩] তাঁদের এ উদ্যোগ কেবল গ্রন্থ সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁরা পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করার পাশাপাশি অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতেন। প্রথিতযশা অনুবাদক হুনাইন বিন ইসহাকসহ (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) বহু বিদ্বানকে তাঁরা গ্রন্থ সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে দর্শনশাস্ত্র, প্রকৌশলবিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যার বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তাঁদের হাতে এসে পৌঁছায়। খলিফা আল-মা'মুন ৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর মৃত্যুর পর তাঁরা নিজ উদ্যোগে এ কার্যক্রম জোরদার করেন। ফলে তাঁদের গৃহ ধীরে ধীরে রূপ নেয় এক জীবন্ত জ্ঞানকেন্দ্রে-যেখানে অনুবাদক, সংকলক ও গবেষকেরা সানন্দে সাহিত্যচর্চা করতেন।[৩৪৪]

---

৩৪৩. ইবনে নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৩৭৯

৩৪৪. হামিদ হাসান আদ-দামুর, *আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত তা'লিমি ফিল ইরাকী ফিল আসরলি আব্বাসীল আওয়াল* (জর্ডান: জামিয়াতু মু'তাহ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৩১৭

২. آل حنين (হুনাইন পরিবার)

আব্বাসী যুগের অনুবাদ আন্দোলনে এক অনন্য বৌদ্ধিক বংশপরম্পরার নাম-হুনাইন পরিবার। এ পরিবারের প্রবর্তক হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.) কেবল একজন চিকিৎসকই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন গ্রীক জ্ঞানভাণ্ডারকে আরবী ভাষায় রূপান্তরকরণের মহান পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী। জীবদ্দশায় হুনাইন পরিবার খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)-এর রাজত্বকালে তিনি অনুবাদ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন এবং ইসতিফান ইবনে বাসিল (মৃ. ৮৮৮ খ্রি.) এবং মুসা ইবনে খালিদসহ (২১১ হি.) একদল অনুবাদক তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন। তিনি তাদের অনুবাদকর্মগুলো সম্পাদনা, সংশোধন ও পরিমার্জন করে দিতেন।[৩৪৫]

তাঁর পুত্র দাউদ বিন হুনাইনও পিতার অনুবাদকর্ম সম্পাদনে সহযোগিতার পাশাপাশি নিজেও অনুবাদ করতেন। হুনাইন পরিবারের আরেক উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ছিলেন তাঁর ভগনীপুত্র হুবাইশ বিন আল-হাসান আল-আসাম আদ-দিমাশকী (মৃ. ৯১৩ খ্রি.)। চিকিৎসাশাস্ত্র ও অনুবাদকর্ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ সময় তিনি হুনাইন বিন ইসহাকের (৮০৯-৮৭৩ খ্রি.) কাছে অবস্থান করতেন। তাঁকে সহযোগিতার পাশাপাশি নিজেও মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করতেন। ফলে চিকিৎসাবিদ্যা ও অনুবাদ-উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন।[৩৪৬] হুনাইনের অপর সুযোগ্য পুত্র ইসহাক বিন হুনাইন (মৃ. ২৯৮ হি.) চিকিৎসাশাস্ত্র ও অনুবাদশিল্পে অসামান্য অবদান রাখেন।

তিনি তাঁর পিতাকে মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থগুলো প্রস্তুতকরণে সহযোগিতা করার পাশাপাশি গ্রীক ভাষা থেকে অ্যারিস্টটল ও গ্যালেনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

৩. آل بختيشوع (বখতিশু পরিবার)

আরবী অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে বখতিশু পরিবারের নাম উচ্চারিত হয় গভীর শ্রদ্ধায় সাথে। তাঁদের প্রথম বংশধর ছিলেন জরজিস ইবনে বখতিশু (মৃ. ১৫২/৭৬৯ খ্রি.), যিনি খলিফা আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর হাত ধরেই বখতিশু নামটি রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তীতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন পুত্র বখতিশু বিন জরজিস (মৃ. ১৮৫/৮০১ খ্রি.)। তাঁকে

---

৩৪৫. জুরজী যায়দান, *তারিখু তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭০; আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৩৪৬. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান, *হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১০; জুরজী যায়দান, *তারিখু তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭০-১৭১; ড. এরফান আব্দুল হামিদ, *আল-ফালসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ* (বাগদাদ: দারুত তারবিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৯১

খলিফা হারুন অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) নিজ উদ্যোগে জুন্দিশাপুর থেকে বাগদাদে আসার আমন্ত্রণ জানান-যেমনটি একসময় খলিফা আল-মনসুর তাঁর পিতাকে আহ্বান করেছিলেন। এ আহ্বান ছিল জ্ঞানের প্রতি রাষ্ট্রশক্তির গভীর অনুরাগের প্রতিফলন। রাজদরবারে তাঁর আগমন ছিল স্মরণীয় ঘটনা। খলিফা হারুন অর-রশিদ তাঁকে ফারসী ও আরবী-উভয় ভাষায় সম্বোধন করে উজির ইয়াহিয়া আল-বারমাকিকে (মৃ. ৮০৬ খ্রি.) তাঁর যোগ্যতা যাচাইয়ের নির্দেশ দেন। দরবারে আহবান করা হয় আবু কুরাইশ ইসা, আবদুল্লাহ আত-তাইফুরী, দাউদ ইবনে সারাবিউনসহ প্রমুখ সমসাময়িক খ্যাতিমান চিকিৎসককে। তাঁদের মধ্যে আবু কুরাইশ ইসা মন্তব্য করেন-"এ ব্যক্তির সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া আমাদের সাধ্যের বাইরে; তিনি বাগ্মীতার মূর্তপ্রতীক। তিনি, তাঁর পিতা ও তাঁর বংশধরেরা বিখ্যাত দার্শনিক।" তাঁর এ মন্তব্য কেবল ব্যক্তিগত প্রশংসা ছিল না; এটি ছিল বখতিশু পরিবারের বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। ফলে খলিফা তাঁকে প্রধান চিকিৎসকের পদে অধিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর পুত্র জিব্রিল ইবনে বখতিশু (মৃ. ২১২/৮২৮ খ্রি.) পিতার আসন অলংকৃত করেন। পরবর্তী প্রজন্মে বখতিশু ইবনে জিব্রিল (মৃ. ২৫৬/৮৭০ খ্রি.) এমন এক মর্যাদা ও প্রভাব অর্জন করেন, যা তাঁর সমসাময়িক চিকিৎসকদের থেকে অতুলনীয় করে তোলে।[৩৪৭]

এ ধারাবাহিকতার শেষ প্রান্তে দেখা যায় জিব্রিল ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে বখতিশুকে (মৃ. ৪৪৪/১০৫৮ খ্রি.), যিনি খলিফা আল-মুকতাদির বিল্লাহ (৯০৮-৯৩২ খ্রি.)-এর চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। পরবর্তীতে উবায়দুল্লাহ ইবনে জিব্রিল (মৃ. ৪৫০ হি.) পরিবারের এ ঐতিহ্য বহন করেন। বখতিশু পরিবারের এ ছয়জন চিকিৎসক ছিলেন নিজ নিজ সময়ের দক্ষ ও স্বীকৃত বিদ্বান। খলিফাদের চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করার জন্য যথাযথ উপঢৌকন ও সম্মানী লাভ করেন। চিকিৎসা, দক্ষতা, প্রশাসনিক প্রজ্ঞা ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এ পরিবার আব্বাসী যুগের অন্যতম প্রভাবশালী বংশে পরিণত হয়।[৩৪৮]

---

৩৪৭. ইবনে নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২-৪১৩; জুরজী যায়দান, *তারিখু তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮-১৬৯

৩৪৮. জুরজী যায়দান, *তারিখু তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯

৪. آل ثابت (সাবিত পরিবার)

যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রের অসামান্য প্রতিভার অধিকারী সাবিত বিন কুররাহ (৮৩৬-৯০০ খ্রি.) আব্বাসীয় জ্ঞানভাণ্ডারের এক মহীরুহ। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ যেমন মৌলিক গবেষণার নিদর্শন, তেমনি অনুবাদকর্ম ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের অন্যতম হাতিয়ার। তাঁর পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরবী অনুবাদ জগতে তিনি অসামান্য খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁর পুত্র সিনান বিন সাবিত (মৃ. ৯৪৩ খ্রি.), পৌত্রদ্বয় সাবিত (মৃ. ৯৭৩ খ্রি.) এবং ইব্রাহিম (মৃ. ৯৪৬ খ্রি.), প্রপৌত্র আবুল ফারাজ এবং সিনানের পুত্র আবুল হাসান সকলেই বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি সুরিয়ানী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদকরণে বিভিন্নভাবে তাঁকে সহযোগিতা করতেন।[৩৪৯]

অনুরুপভাবে হুনাইনের অপর পুত্র ইসহাক বিন হুনাইন (মৃ. ২৯৮ হি.) ছিলেন আব্বাসী যুগের অনুবাদ আন্দোলনের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি আব্বাসীয় মন্ত্রী আল-কাসিম ইবনে উবায়দুল্লাহ (মৃ. ৯০৪ খ্রি.)-এর আস্থাভাজন উপদেষ্টা ও সহযোগী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে তাঁর সততা, প্রজ্ঞা ও গোপনীয়তা রক্ষার নৈতিক দৃঢ়তা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। তিনি ২৯৮ হিজরীর রবিউস সানি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৫০] গ্রীক ও সুরিয়ানী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভুলতা ও ভাষাগত শুদ্ধতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতা হুনাইন বিন ইসহাকের (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও আরবী ভাষার ব্যুৎপত্তি, রীতি ও শৈলীতে পারদর্শিতার জন্য বহু গবেষকের দৃষ্টিতে পিতাকেও ছাড়িয়ে যান। তিনি অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) রচনার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। সত্যিকারার্থে অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি নির্ভুলতা এবং বিশ্বস্ততার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে ছিলেন বলে বিবেচনা করা হয়।[৩৫১]

মৌলিক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তিনি প্রাচীন অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই ছিল চিকিৎসা বিষয়ক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো[৩৫২]-

---

৩৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ৩৮ এবং ৩৮০-৩৮১; Philip K Hitti, *History of the Arabs*, ibid, p. 315

৩৫০. ইবনে নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫

৩৫১. ড. এরফান আব্দুল হামিদ, *আল-ফালসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ* (বাগদাদ: দারুত তারবিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৯১

৩৫২. ইবনে নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫; ড. এরফান আব্দুল হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

كتاب الأدوية المفردة على الحروف، كتاب الكناش اللطيف، كتاب تاريخ الاطباء، كتاب الأدوية المفردة اللطيف على الحروف، سوفسطي افلاطون، الطبيعة لارسطو، رسالة النفس، كتاب العبارات و رسالة الكون والفساد.

ইসহাক পরিবারের অনুবাদচর্চা আব্বাসী যুগের অনুবাদের ধারাকে সুদৃঢ় করার পাশাপাশি ভাষা, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে এক সৃজনশীল সেতুবন্ধন তৈরী করেছে। অনুবাদকর্মে এ পরিবারের অবদান আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

৫. آل ماسرجويه (মাসারজাওয়ায়েহ পরিবার)

এ পরিবারের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন বসরার চিকিৎসক মাসারজাওয়ায়েহ (মৃ. ৭২০ খ্রি.)। ধর্মীয় পরিচয়ে তিনি ইহুদি এবং ভাষাগতভাবে সুরিয়ানী ছিলেন। সুরিয়ানী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় দর্শন ও চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তাঁর পুত্র ইসা বিন মাসারজাওয়ায়েহ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনুবাদ ও চিকিৎসা-উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পিতা-পুত্রের এ ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, অনুবাদকর্ম কেবল ব্যক্তিগত প্রয়াস ছিল না; বরং পারিবারিক জ্ঞান ও ঐতিহ্যেরও অংশে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের রচনায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রয়োগ একত্রে প্রতিফলিত হতো, যা সমকালীন চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছিল।[৩৫৩]

৬. آل الكرخي (কারখী পরিবার)

ইরাকের 'আল-কারখ' অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত এ পরিবারের প্রথম উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ছিলেন শাহদী আল-কারখী (মৃ. ২০০ হি.। তিনি অনুবাদ সাহিত্যে সমসাময়িক পণ্ডিতমহলে সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রধান ক্ষেত্রও ছিল সুরিয়ানী ভাষা থেকে আরবী ভাষান্তর। শাহদীর পর তাঁর পুত্র অনুবাদকরণের এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি পিতার সমতুল্য দক্ষতার পরিচয় দিলেও, জীবনের শেষভাগে এসে তিনি পিতাকেও অতিক্রম করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তার অনুবাদকর্মে প্রজন্মান্তরের উৎকর্ষ ও অভিজ্ঞতার পরিপক্বতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[৩৫৪]

---

৩৫৩. জুরজী যায়দান, *তারিখু তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭১
৩৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভূমিকা

আব্বাসী যুগে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, ব্যক্তিগত ও মসজিদভিত্তিক গ্রন্থাগার, জ্যোতির্বিদ্যা পর্যবেক্ষণকেন্দ্র, হাসপাতাল এবং ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে অনুবাদ কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে পরিচালিত হতো। এসব প্রতিষ্ঠান শুধু অনুবাদ ও আরবীকরণের কেন্দ্রই ছিল না, বরং সেখানে গ্রন্থ রচনা, পাঠ, অনুলিপি প্রস্তুত, শ্রেণিবিন্যাস ও সংরক্ষণের কাজও সম্পন্ন হতো। পাশাপাশি ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক চিত্র, বিভিন্ন লিপি ও মানচিত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান মুসলিম সমাজে ধারাবাহিক বিজ্ঞান চর্চার এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। ফাতেমী খলিফা ও মুসলিম রাজপুত্রদের ঐকান্তিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহকে বলা হতো গণ গ্রন্থাগার। অপরদিকে পণ্ডিত, লেখক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলো ছিল ব্যক্তিগত। যেখান থেকে সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতো।[৩৫৫] আব্বাসী যুগে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. مدرسة جنديسابور (মাদরাসাতু জুন্দিশাপুর)

পারস্যের প্রাচীন জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে জুন্দিশাপুর এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। তৃতীয় শতকে সাসানীয় শাসনামলে প্রথম শাপুরের উদ্যোগে (মৃ. ২৪১/২৭২ খ্রি.) এর ভিত্তি স্থাপিত হয়; যা কিছুসময়ের জন্য রোমান বন্দীদের আশ্রয়স্থল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটি চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও অনুবাদচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও, ধীরে ধীরে এটি জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। ষষ্ঠ শতকে পারসিক সম্রাট খসরু নাওসিরওয়ানের (মৃ. ৫৭৯ খ্রি.) পৃষ্ঠপোষকতায় জুন্দিশাপুরে শিক্ষাব্যবস্থা নতুন মাত্রা পায়। গ্রীক, সিরীয় ও ভারতীয় জ্ঞানধারার সমন্বয়ে এখানে চিকিৎসাবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হতো। বিশেষত চিকিৎসাশাস্ত্রে জুন্দিশাপুরের অবদান ছিল ব্যতিক্রমধর্মী; এখানে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক চিকিৎসার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানদের বিজয়ের পরও জুন্দিশাপুরের বিদ্যাচর্চা থেমে যায়নি; বরং আব্বাসী যুগ পর্যন্ত এর প্রভাব

---

৩৫৫. রাফিদাহ ইসমাইল আতাউল মান্নান ইসমাইল, *বায়তুল হিকমাহ আল-বাগদাদি ওয়া আসারুহু ফিল হারাকতিল ইলমিয়্যাহ ফিদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

অব্যাহত ছিল। আব্বাসীয়র খেলাফতের জ্ঞানানুরাগী নীতির ফলে জুন্দিশাপুরের চিকিৎসক ও অনুবাদকরা বাগদাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খলিফা আবু জাফর আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) সময়ে জুন্দিশাপুরের চিকিৎসকদের খ্যাতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, খলিফা আল-মানসুর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে দরবারের চিকিৎসকেরা ব্যর্থ হয়ে তাঁকে জুন্দিশাপুরের প্রধান চিকিৎসক জরজিস ইবনে বখতিশুর (মৃ. ১৫২ হি./৭৬৯ খ্রি.) কাছে নিয়ে যান। যথপোযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে খলিফার আরোগ্য লাভের বার্তা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লে এ প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি সর্বত্র বৃদ্ধি পায়।[৩৫৬]

চিকিৎসা বিদ্যার ধারক হিসেবে জুন্দিশাপুরের বখতিশু পরিবার বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। এ বংশের চিকিৎসকরা আব্বাসীয় দরবারে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা বিকাশে ভূমিকা রাখেন। তাঁদের মাধ্যমে জুন্দিশাপুরের চিকিৎসাবিদ্যা বাগদাদে প্রবেশ করে, যা পরবর্তীকালে 'বাইতুল হিকমা' ও অন্যান্য চিকিৎসাবিদ্যা বিকাশে সহায়ক হয়। বিশেষত খলিফা আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) চিকিৎসক জরজিস ইবনে বখতিশু (মৃ. ১৫২ হি./৭৬৯ খ্রি.), হারুন অর-রশিদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) চিকিৎসক বখতিশু এবং খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) প্রাজ্ঞ চিকিৎসক জিবরিল ইবনে বখতিশু-সবাই ছিলেন নেস্টোরীয় ঐতিহ্যের ধারক।[৩৫৭]

২. مدرسة حران (মাদরাসাতু হার্‌রান)

এটি একটি প্রাচীন শহর; যা গ্রীক ও রোমান পৌত্তলিক ঐতিহ্য, খ্রিস্টধর্ম এবং পরবর্তীকালে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উত্তর ইরাকের বিখ্যাত দ্বীপ 'রাহা' এবং 'রাসুল-আইন'-এর মধ্যবর্তী স্থানে এটি অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কারণে নগরটি বহু শতাব্দী ধরে জ্ঞানচর্চা ও ধর্মীয় সহাবস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ইসলামী যুগে গ্রীক সংস্কৃতির প্রধান উৎস ছিল। বিশেষত এ অঞ্চলের বিদ্বজ্জনেরা গ্রীক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ঐতিহ্য অনুবাদকরণ ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হারানিয়ানরা আব্বাসীয় খেলাফতের জ্ঞানানুরাগী পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। এ ধারার অন্যতম ব্যক্তিত্ব সাবিত

---

৩৫৬. ড. হারবী আব্বাস আতিতু মাহমুদ ও ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *আল-উলুমু ইন্দাল আরাব উসুলুহা ওয়া মালামিহুহাল হাদারিয়্যাহ* (বৈরুত: দারুন নাহদাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৪৩

৩৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

ইবনে কুররাহ আল-হার্‌রানী (৮২৬-৯০১ খ্রি.), চিকিৎসক ইবনে সিনান (মৃ. ৯৪৩ খ্রি.), এবং তাঁর প্রপৌত্র ইব্রাহিম ইবনে সিনান (মৃ. ৯৭৩ খ্রি.) এবং চিকিৎসক ও গ্রহ পর্যবেক্ষণকারী হেলাল ইবনে ইব্রাহিম। অনুরূপভাবে আল-বাত্তানী (৮৫০-৯২৯ খ্রি.) জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটিয়ে মধ্যযুগীয় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেন এবং গণিতশাস্ত্রে আবু জাফর আল-খাজিনের (৯০০-৯৭১ খ্রি.) মতো বিদ্বানরা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও প্রয়োগধর্মী গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। হাররানীয়দের জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতচর্চার পেছনে গ্রহ-নক্ষত্রকেন্দ্রিক ধর্মীয় ও দার্শনিক অনুরাগ একটি প্রেরণাদায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল। তবে এ অনুরাগ কেবল আচারগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা পর্যবেক্ষণ, গণনা ও তত্ত্বনির্মাণের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে রূপান্তরিত হয়। ফলে 'হাররান' নগরী জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, যেখানে প্রাচীন ও নতুন গবেষণার সমন্বয় সাধিত হয়।[৩৫৮]

৩. مدرسة الإسكندرية (মাদরাসাতুল ইসকান্দারিয়্যাহ)

উমাইয়্যা যুগে জ্ঞান-জ্ঞানচর্চার পরিসর যখন ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছিল তখন আলেকজান্দ্রিয়া কেন্দ্রিক প্রাচীন বিদ্যাপীঠের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটে। এ যোগাযোগ কেবল সাংস্কৃতিক কৌতূহলের ফল নয়; বরং তা ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের সঞ্চিত ঐতিহ্যের প্রতি নব-উদিত মুসলিম সমাজের গভীর আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। এসময় খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার (মৃ.৭০৪ খ্রি.) পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়, যা অনুবাদ-আন্দোলনের প্রারম্ভিক ইঙ্গিত বহন করে। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের (৭২০-৬৮২ খ্রি.) হাতে ইসলাম গ্রহনকারী আলেকজান্দ্রীয় বিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে আবজার চিকিৎসাবিদ্যা ও অনুবাদকর্মে দক্ষতার জন্য সমাদৃত হন।

আব্বাসী যুগে আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। আলেকজান্দ্রীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন চিকিৎসক ও পণ্ডিতের সন্ধান মেলে, যাদের মধ্যে বালিতিয়ান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মিশরের একজন খ্যাতিমান খ্রিস্টান চিকিৎসক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং খলিফা আল-মানসুরের শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে খলিফা হারুন অর-রশিদের সময়ে রাজপ্রাসাদে চিকিৎসাসেবার প্রয়োজনে মিশরীয় চিকিৎসকদের আহ্বান

---

৩৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

জানানো হয়। আহ্বানে সাঁড়া দিয়ে একজন মিশরীয় দাসীর চিকিৎসায় বালিতিয়ানকে প্রেরণ করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় আহমদ ইবনে তুলুনের (৮৩৫-৮৮৪ খ্রি.) চিকিৎসক সাইদ ইবনে তাওফিলসহ (মৃ. ২৯৯ হি.) মিশরীয় বিভিন্ন চিকিৎসক রাজদরবারে আগমণ করেন। আব্বাসীয় খেলাফতের সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যালয়ের সম্পর্ক জুন্দিশাপুর কিংবা হার্‌রানের মতো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ততটা নিবিড় ছিল না। মিশর ও ইরাকের ভৌগোলিক দূরত্ব, জুন্দিশাপুর ও হার্‌রানের প্রশাসনিক ও বৌদ্ধিক নৈকট্য এবং আলেকজান্দ্রীয় জ্ঞানচর্চায় ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীদের ওপর এ বিদ্যালয়ের ব্যাপক প্রভাবের কারণে এমনটি হয়েছিল।[৩৫৯]

৪. مدرسة نصيبين (মাদরাসাতু নুসাইবীন)

সুরিয়ানী ভাষী খ্রিস্টানদের মাঝে গ্রীক ধর্মতত্ত্ব প্রসারের উদ্দেশ্যে ৩২০ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের নুসাইবীন অঞ্চলে এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে তুরস্কের 'রাহা' অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীগণ সম্পৃক্ত হলে এর খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। মূলত এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পারসিকদের মাঝে গ্রীক সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। এ বিদ্যালয়টি ধর্মতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যার জন্য বিশেষায়িত ছিল।[৩৬০] সিরীয় ভাষাভাষী অঞ্চলেও এ জ্ঞানধারা মধ্যযুগীয় নিকটপ্রাচ্যের বৌদ্ধিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন রচনা করে। এ পরিমণ্ডল থেকেই নেস্টোরিয়ান ঐতিহ্য অনুসরণকারী বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে- যাদের মধ্যে পঞ্চম শতাব্দীর দোভাষী ও অষ্টম শতাব্দীর সূচনালগ্নে খ্রিস্টান আরবদের বিশপ জর্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কর্মতৎপরতা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও ভাষান্তর-বিদ্যার ক্ষেত্রে আন্তঃসাংস্কৃতিক জ্ঞানবিনিময়কে ত্বরান্বিত করে। পঞ্চম শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে পারসিক সম্রাট খসরু নাওসিরওয়ানের (মৃ. ৫৭৯ খ্রি.) রাজত্বকালে সিরীয় অঞ্চলের কিছু বিদ্বান পারস্যের প্রখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র জুনদিশাপুরে বসতি স্থাপন করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে 'হার্‌রান' থেকে আগত চারজন খ্রিস্টান দার্শনিক বাগদাদে আগমন করে ব্যক্তিগতভাবে গড়ে ওঠা শিক্ষাকেন্দ্রেগুলোতে পাঠদান শুরু করেন। শিক্ষায় অবদানের কারণে তাঁদেরকে رؤساء المدارس (প্রতিষ্ঠান প্রধান) বলা হতো। তাঁদের নেতৃত্ব ও পাঠদানকে কেন্দ্র করে যে বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠে, তা পরবর্তীকালে 'বাগদাদ বিদ্যালয়'-এর ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

৩৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

৩৬০. ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

এসময় খ্রিস্টান ধর্মালম্বীদের বিদ্যালয় المدرسة التأويلية এবং المدرسة النصية তাগলিব এবং নাজরান খ্রিস্টানদের মাধ্যমে মুসলমানদের প্রভাবিত করেছিল। এ বিদ্যালয়দ্বয়ের দ্বিমুখী প্রভাব ইসলামী সংস্কৃতিতে পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ, ভাষ্যরীতি ও যুক্তিবাদের পরিসর বিস্তৃত করে।

ফলে আব্বাসীয় যুগে বহিরাগত সংস্কৃতি ও জ্ঞানধারার সংখ্যা ও বৈচিত্র বৃদ্ধি পায় এবং আরব সংস্কৃতির সঙ্গে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। এ প্রেক্ষাপটেই এক শক্তিশালী অনুবাদ-আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে- যার লক্ষ্য ছিল গ্রীক, সিরীয় ও পারস্যভিত্তিক ঐতিহ্যকে আরবী ভাষায় স্থানান্তর ও পুনর্গঠন করা। অনুবাদের এ সৃজনশীল উদ্যোগ শেষপর্যন্ত একটি সমৃদ্ধ ও বৌদ্ধিক সভ্যতা বিকাশের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

৫. مدرسة الرها (মাদরাসাতুর রাহা)

খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ হিসেবে খ্যাত এ প্রতিষ্ঠানটি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইরাকের উত্তরাঞ্চলে 'রাহা' নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩৬৩ খ্রিস্টাব্দে সাসানীদের হাতে এ অঞ্চলের পতন হলে পারসিকরা তা পূনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকই ছিল আলেকজান্দ্রিয়া বিদ্যালয় থেকে আগত; যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-ত্বিতইয়ানুস (মৃ. ১৭০ খ্রি.) ও বারদিসান (মৃ. ২২২ খ্রি.)। এখানে গ্রীক ও সুরিয়ানী ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার পাশাপাশি অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.) কিছু গ্রন্থ সুরিয়ানী ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু বাইজেন্টাইন সম্রাটের বিরোধীতা করে খ্রিস্টানদের 'নাস্তুরী মতবাদের' অনুসারী হওয়ায় রোমান সম্রাট জাইনুন (৪৭৪-৪৯১ খ্রি.) ৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে এ বিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেন।[৩৬১]

৬. مدرسة الإنطاكية (মাদরাসাতুল ইনত্বাকিয়্যাহ)

সিরিয়ায় প্রাচ্য খ্রিস্টীয় বিদ্যাচর্চার যে আলোকস্তম্ভ জ্বলে উঠেছিল তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল 'মাদরাসাতুল ইনত্বাকিয়্যাহ'। আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগ কিংবা চতুর্থ শতাব্দীর সূচনালগ্নে তৎকালীন প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের অনুকরণে আলেকজান্দ্রিয়ায় এ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে। সূচনালগ্ন থেকেই এটি গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যকে প্রাচ্যের ভাষা ও চিন্তার সঙ্গে আবদ্ধ করার এক মহৎ প্রয়াসে

৩৬১. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

আত্মনিয়োগ করে। প্লেটোর (৪২৩-৩৪৭ খ্রি. পূ.) দর্শন চর্চায় এ বিদ্যালয়টি অনন্য ছিল। এখানে গ্রীক ও সুরিয়ানী ভাষায় শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হতো। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে লুকইয়ানুস ও দিওদুস স্মরণীয়–যাঁদের প্রজ্ঞা ও বৌদ্ধিক দিকনির্দেশনায় এটি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। সেসময়ে মাদরাসাতুল ইনত্বাকিয়্যাহ গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। যেখানে ধর্মতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করেছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাস্তব অনুশীলন, ধর্মতত্ত্বের তাত্ত্বিক গভীরতা এবং দর্শনশাস্ত্রের বিশ্লেষণাত্মক শৃঙ্খলা-এ ত্রিবেণী মিলনে বিদ্যালয়টি ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।[৩৬২]

৭. مدرسة قنسرين (মাদরাসাতু ক্বানস্রীন)

সিরিয়ার আলেপ্পোর দক্ষিণাঞ্চলে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এ বিদ্যাপীঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের প্রবাহে সপ্তম শতাব্দীতে এটি নিজ মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে গ্রীক সাহিত্য, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব এবং প্রকৃতিবিদ্যা পাঠদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতো গ্রীক ও সুরিয়ানী উভয় ভাষায়। ফলে জ্ঞানচর্চা এখানে কেবল পাঠ্যক্রমের সীমায় আবদ্ধ থাকেনি; অনুবাদ, ভাষ্য ও তর্কের ধারায় তা লাভ করেছিল এক জীবন্ত বৌদ্ধিক চরিত্র। গ্রীক তাত্ত্বিক ঐতিহ্য সুরিয়ানী ভাষার ব্যাখ্যাশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে নির্মাণ করেছিল এক সমৃদ্ধ শিক্ষাবাতাবরণ। সমকালীন দুই প্রভাবশালী বিদ্যাপীঠ مدرسة نصيبين (মাদ্রাসাতু নুসাইবিয়ীন) ও مدرسة الرها (মাদ্রাসাতুর রাহা)-এর সঙ্গে জ্ঞান ও মর্যাদার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এ সৃজনশীল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যালয়টিকে গতিশীল ও সমৃদ্ধ করে তোলে; যা ইসলামী যুগে খ্রিস্টীয় ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল।[৩৬৩]

০৮. بيت الحكمة (বায়তুল হিকমাহ)

ইসলামী সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রন্থের প্রতি গভীর অনুরাগ, জ্ঞানের অবিরাম প্রসার এবং গ্রন্থাগারের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা। এ জ্ঞানানুরাগ কেবল একটি বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর মধ্যে

---

৩৬২. ফাদিল খলীল ইব্রাহীম, *খালীদ ইবন ইয়াজিদ সীরাতুহু ওয়া ইহতিমামুহুল ইলমিয়্যাহ: দিরাসাতান ফীল উলুমি ইন্দাল আরব* (বাগদাদ: দারুল হুরিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রি.), ৩১

৩৬৩. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং লিঙ্গ, বয়স কিংবা জাতিগত বিভেদের উর্ধ্বে উঠে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে জ্ঞানকে সহজলভ্য করে তোলাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলা হয়েছে[৩৬৪]

لم يبز شعب من شعوب الأرض كلهاعليها المسلمين فى حبهم للكتب وجذبهم.

(পৃথিবীতে গ্রন্থের প্রতি ভালোবাসা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ছাড়িয়ে গেছে-এমন কোনো জাতি নেই।)

এ অনুরাগের বীজ আরব ইতিহাসের সূচনালগ্নেই রোপিত হয়েছিল। আরবরা তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন ঐতিহ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে যখন ইসলামী বিজয়ের বিস্তৃত তরঙ্গ দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, তখন আধ্যাত্মিক মহিমা ও শক্তি উভয় দিক থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র ধীরে ধীরে মানব সভ্যতার নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে শুরু করে। এ সময়েই বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নব অধ্যায়ের সূচনা হয়, যা ইসলামী সভ্যতার অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হয়। জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন, প্রাচীন ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রতি গভীর নিষ্ঠা এ নবজাগরণের সঙ্গে সমান্তরালে অগ্রসর হয়। পারস্পরিক প্রভাব ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে এ আন্দোলন এক সমৃদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক পরিবেশের সৃষ্টি করে, যা পরবর্তীকালে ইসলামী সভ্যতার বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করে এবং মানব ইতিহাসে এক দীপ্তিময় অধ্যায় সংযোজন করে।[৩৬৫]

বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

আব্বাসী যুগের আগমন ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে-যার মধ্য দিয়েই সূচিত হয় তার স্বর্ণযুগ। ১৩২ হিজরী/৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটিয়ে আব্বাসীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী বিশ্বের রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তর করা হয়। এ নগরী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। খলিফা হারুন অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.), খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.), খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) প্রমুখ আব্বাসীয় খলিফা জ্ঞানচর্চাকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মর্যাদা দেন এবং বিদ্যা ও প্রজ্ঞাকে রাষ্ট্র

৩৬৪. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন* (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, তা.বি), ১ম সংস্করণ, পৃ. ২৮

৩৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

পরিচালনার অন্যতম স্তম্ভে পরিণত করেন। আব্বাসীয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিল বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি। এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল খলিফাদের জ্ঞান প্রচারমূলক নীতি, পণ্ডিতদের প্রতি উদার সমর্থন এবং প্রাচীন সভ্যতার মূল্যবান রচনাসমূহকে আরবী ভাষায় অনুবাদকরণের মাধ্যমে। বিশেষভাবে খলিফা আল-মানসুর ছিলেন এ জ্ঞানানুশীলনের এক অগ্রদূত। তিনি বাগদাদে চিকিৎসক ও পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও সাহিত্যের অসংখ্য গ্রন্থ অনূদিত হওয়ার পাশাপাশি ইতিহাস ও ধর্ম বিষয়ে অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়। এসময় জরজিস ইবনে বখতিশু (১৫২ হি./৭৬৯ খ্রি.) গ্রীক ভাষা থেকে আরবী ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এসকল অনুবাদ ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য খলিফা আল-মানসুর (১৩৬-১৫৮ হি./৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) بيت الحكمة নামে বিশেষ এ গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন; যার কার্যক্রম তাঁর মৃত্যুর পরেও নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকে।[৩৬৬]

প্রথমদিকে এসব পাণ্ডুলিপি ও জ্ঞানভাণ্ডার বাগদাদের রাজ-প্রাসাদে সংরক্ষিত ছিল; কিন্তু জ্ঞানের বিস্তার ও গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশস্ত প্রাসাদও অপ্রতুল হয়ে পড়ে। এরপর ক্ষমতায় আসেন খলিফা হারুন অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.)-যিনি আব্বাসী খেলাফতের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর শাসনামলে আব্বাসীয় রাষ্ট্র সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। বাগদাদ নগরী তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা এবং বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এসময়ে আবির্ভূত হন বহু খ্যাতিমান কবি ও ইতিহাসবিদ–যেমন আবুল আতাহিয়া (৭৪৮-৮২৮ খ্রি.), আব্বাস ইবনে আল আহনাফ (৭৫০-৮০৮ খ্রি.), মারওয়ান ইবনে আবি হাফসা (মৃ. ৭৯৮ খ্রি.), আল আসমায়ী (৭৪২-৮৩১ খ্রি.) ও আল ওয়াকিদী (৭৪৭-৮২৩ খ্রি.)-যাঁদের রচনায় সে যুগের মননশীল জ্যোতি প্রতিফলিত হয়েছে।[৩৬৭]

খলিফা হারুন অর-রশিদ উপলব্ধি করেন যে, জ্ঞান কেবল রাজ-প্রাসাদের অলংকার হয়ে থাকলে তার প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তিনি প্রাসাদের অন্তরালে সঞ্চিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি জনসাধারণের

---

৩৬৬. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; রাফিদাহ ইসমাইল আতাউল মান্নান ইসমাইল, *বায়তুল হিকমাহ আল-বাগদাদি ওয়া আসারুহু ফিল হারাকতিল ইলমিয়্যাহ ফিদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫ এবং ৯২

৩৬৭. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

কল্যাণে উন্মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির বিপুল সংগ্রহকে কেন্দ্র করে তিনি সর্বসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি এক বিশাল ও শৈল্পিক কারুকার্যপূর্ণ ভবন নির্মাণ করেন এবং সেখানে জ্ঞানের সমস্ত ধনভাণ্ডার স্থানান্তর করেন। এর মহৎ লক্ষ্য ও গভীর তাৎপর্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এর নামকরণ করেন-' بيت الحكمة ' বা 'জ্ঞানের ভূবন'; যা পরবর্তীকালে মানব সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় প্রতীক হয়ে উঠে।[৩৬৮]

এ প্রতিষ্ঠানটি কেবল একটি গ্রন্থ সংগ্রহশালা নয়; বরং একটি মহৎ বৌদ্ধিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকারী কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল জ্ঞানসংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে গবেষণা ও অধ্যয়ন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হবে। ইবনে আল-নাদিমের (মৃ. ৯৯৫/৯৯৮ খ্রি.) বর্ণনা অনুযায়ী, খলিফা আল-মামুনের শাসনামলে এ প্রতিষ্ঠানটি বিকাশ লাভ করে এবং ধীরে ধীরে এমন এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, যা গবেষণা ও উচ্চতর জ্ঞানচর্চার জন্য একান্ত মনোনিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করত। এসময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার 'বায়তুল হিকমাহ' নামমাত্র একটি গ্রন্থাগার হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল না ; বরং এটি একটি বিরল প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়-যা আধুনিক অর্থে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচিত হতো। এখানে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য নির্ধারিত স্থান, গ্রন্থ সংরক্ষণ, ও অনুবাদকরণের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ বিদ্যমান ছিল। পাশাপাশি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য ছিল একটি পর্যবেক্ষণাগার; যা প্রমাণ করে যে প্রতিষ্ঠানটি তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণভিত্তিক বিজ্ঞানের চর্চাকেও সমান গুরুত্ব প্রদান করত।[৩৬৯]

বায়তুল হিকমাহ-এর নামকরণ

'বায়তুল হিকমাহ' নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক একে কখনো خزانة الحكمة (জ্ঞানের ভাণ্ডার) নামে অভিহিত করেছেন, আবার কখনো بيت الحكمة নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবার কখনো কখনো এ দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন সেই স্থানকে

---

৩৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; রাফিদাহ ইসমাইল আতাউল মান্নান ইসমাইল, *বায়তুল হিকমাহ আল-বাগদাদি ওয়া আসারুহু ফিল হারাকতিল ইলমিয়্যাহ ফিদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

৩৬৯. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

বোঝাতে–যেখানে মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষিত থাকত; বিশেষত বিভিন্ন গ্রন্থাবলি। প্রকৃতপক্ষে 'بيت' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় তহবিল ও সম্পদ সংরক্ষণের স্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। সে কারণে শুধুমাত্র গ্রন্থ সংরক্ষণের অর্থে 'بيت' শব্দের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল। অন্যদিকে, 'الحكمة' শব্দটি সেসময় মূলত দর্শন ও বৌদ্ধিক চিন্তার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এ কারণেই ধারণা করা হয়, خزانة الحكمة (জ্ঞানের ভাণ্ডার) কিংবা بيت الحكمة (জ্ঞান ভূবন) বলতে সেই স্থানকেই বোঝানো হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতা থেকে অনূদিত দর্শন, বিজ্ঞান ও মননশীল রচনাবলী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হতো।[৩৭০] আবার দেখা যায় 'বায়তুল হিকমাহ'-কে একটি বিশাল ভবন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে প্রশস্ত হল ও কক্ষজুড়ে থরে থরে বইয়ের আলমারি সাজানো ছিল। প্রতিটি আলমারিতে নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ সংরক্ষিত থাকত এবং অনেক আলমারির নামকরণ করা হয়েছিল খলিফাদের নামে। যেমন হারুন অর-রশিদের আলমারি কিংবা আল-মামুনের আলমারি।[৩৭১]

মূলত 'خزانة /ভাণ্ডার' বা 'بيت /ঘর' শব্দদ্বয় কোনো সাধারণ স্থানের প্রতি ইঙ্গিত নয়; বরং তা এমন এক সুশৃঙ্খল ও মর্যাদাপূর্ণ কেন্দ্রকে নির্দেশ করে, যেখানে গ্রন্থসমূহ সুপরিকল্পিতভাবে সংরক্ষিত থাকত এবং সঞ্চিত জ্ঞান অধ্যয়ন, গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে সেটি জীবন্ত হয়ে ওঠত এবং মানবসভ্যতার কল্যাণে ব্যবহৃত হতো।[৩৭২]

এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ বৌদ্ধিক দর্শন। এখানে সংগৃহীত ও অনূদিত গ্রন্থসম্ভারের প্রতি ইঙ্গিত করেই একে বলা হতো بيت الحكمة কিংবা خزانة الحكمة। এ নামকরণ প্রমাণ করে যে, এর লক্ষ্য ছিল নিছক গ্রন্থসঞ্চয় নয়, বরং জ্ঞানের উপলব্ধি, বিশ্লেষণ ও বিকাশ। আল-মুজামুল ওয়াসিতে উল্লিখিত 'علم' শব্দের ভাষাগত অর্থ বহুমাত্রিক। এর অর্থ কেবল জ্ঞানই নয়; এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম এবং একই সঙ্গে 'حاكم'/বিচারক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে[৩৭৩]-...أفغير الله أبتغي حكما "তবে কি

---

৩৭০. হামিদ হাসান আদ-দামুর, *আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত তালিমমি ফিল ইরাকী ফিল আসরিল আব্বাসিল আওয়াল* (জর্ডান: জামিয়াতু মু'তাহ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২৯৯-৩০০

৩৭১. রাফিদাহ ইসমাইল আতাউল মান্নান ইসমাইল, *বায়তুল হিকমাহ আল-বাগদাদি ওয়া আসারুহু ফিল হারাকতিল ইলমিয়্যাহ ফিদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ* (সুদান: কিসমুত তারিখ, জামিয়াতু খরতুম, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৫৫

৩৭২. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

৩৭৩. সুরা আন্‌য়া, আয়াত: ১১৪

আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানব?" এখানে জ্ঞান ও বিচারের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে উঠে। আরও বলা হয়েছে[৩৭৪] وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها... "তাদের উভয়ের (স্বামী-স্ত্রী) মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা তার পরিবার হতে একজন এবং ওর পরিবার থেকে একজন বিচারক নিযুক্ত করবে;...।"

অবশ্য প্রাচীন ভাষ্য অনুযায়ী জ্ঞানী ব্যক্তি বলতে বোঝানো হতো সেই পরিপক্ব ও অভিজ্ঞ মানুষকে-যিনি প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ। 'علم' অর্থ বোধগম্যতা, অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর উপলব্ধি। যেমন মহিমান্বিত কুরআনে লোকমান আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে[৩৭৫] ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله... "আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছি এবং বলেছি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" এ জ্ঞান ছিল নৈতিকতা, প্রজ্ঞা ও জীবনবোধের সমন্বয়। আরও বলা হয়েছে, জ্ঞান হলো আইন প্রণয়ন ও বিচারিক কাজের প্রজ্ঞা। জ্ঞান মানেই বিচার, আর বিচার মানেই জ্ঞান, বোধ ও প্রজ্ঞার সমাহার। এমনকি এক সময়ে জ্ঞান এতটাই মর্যাদাসম্পন্ন ছিল যে, নীরবতাকেও জ্ঞানের সমার্থক ও ন্যায় বিচার বলে গণ্য করা হতো। গ্রীক দর্শন তখন বিচার বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। তবে দর্শন শব্দটি এখানে সীমিত অর্থে নয়, বরং তাৎপর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; যেখানে দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রকৃতিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যার মতো জ্ঞানের শাখাগুলো এক সুসংহত পরিসরে অন্তর্ভুক্ত। অতএব بيت الحكمة নামটি সেই প্রতিষ্ঠানের বৌদ্ধিক প্রবণতা ও সমকালীন সাংস্কৃতিক ধারারই প্রতিচ্ছবি। আর 'بيت' বা 'কোষাগার' শব্দটি নির্দেশ করে এমন এক স্থানকে, যেখানে কেবল মূল্যবান জিনিস সংরক্ষিত হয় না; বরং যেখানে জ্ঞান সযত্নে লালিত, বিকশিত ও মানবসভ্যতার কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।[৩৭৬]

বায়তুল হিকমার তত্ত্বাবধায়ক

বায়তুল হিকমার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিয়োজিত থাকতেন, যিনি صاحب بيت الحكمة 'জ্ঞানের ঘরের তত্ত্বাবধায়ক' নামে পরিচিত ছিলেন। যিনি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও বিভিন্ন ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায়

---

৩৭৪. সুরা নিসা, আয়াত: ৩৫

৩৭৫. সুরা লুকমান, আয়াত: ১২

৩৭৬. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

অনুবাদ করতেন। এ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী ছিলেন সাহল বিন হারুন (মৃ. ৮৩০ খ্রি.)। তিনি বাগদাদের 'আল-মামুনিয়া' প্রাসাদে অবস্থান করতেন এবং বায়তুল হিকমার শিক্ষামূলক ও প্রশাসনিক কার্যাবলির তত্ত্বাবধান করতেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ কুদর আলী উল্লেখ বলেন, "সাহল বিন হারুন (মৃ. ৮৩০ খ্রি.) খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং একই সঙ্গে বায়তুল হিকমার তত্ত্বাবধানও তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। অর্থাৎ তিনি একযোগে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পদ দু'টি স্বতন্ত্র হলেও বাস্তবে উভয়ের দায়িত্বের পরিসর ও গুরুত্ব প্রায় সমপর্যায়ের ছিল।" তাঁর সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অংশীদার ছিলেন সাইদ বিন হারুন (মৃ. ২৫২ হি.) নামে একজন বিশিষ্ট লেখক, যিনি তাঁর বাগ্মিতা, ভাষাশৈলী ও প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আল-জাহিজ (১৪৯-২৫৫ হি.) তাঁর সম্পর্কে প্রশংসাসূচক বিবরণ প্রদান করেছেন। সাইদ বিন হারুনের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বহুসংখ্যক গ্রন্থ এবং বিপুল পরিমাণ চিঠিপত্রের সংকলন। এছাড়াও তাঁর কাছে ফারসী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনূদিত বহু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি সংরক্ষিত ছিল।[৩৭৭] তাছাড়া খলিফা হারুন-অর-রশিদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) শাসনামলে হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) এবং খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)-এর সময়ে ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (২০০ হি./৮১৫ খ্রি.) 'বায়তুল হিকমা'-এর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে প্রত্যেক খলিফার শাসনামলেই একেকজন পণ্ডিত 'বায়তুল হিকমা'-এর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

বায়তুল হিকমার বিষয়ভিত্তিক লেখকদের তালিকা

আব্বাসী যুগে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমাহ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র। এ জ্ঞানভাণ্ডারে যেসকল প্রথিতযশা আরব লেখক দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো[৩৭৮] -

علم الكيمياء (রসায়নশাস্ত্র)

১. جابر بن حيان (জাবির ইবনে হাইয়ান)

২. أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাযী)

---

৩৭৭. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৩৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১-৩২২

৩. ابو يوسف يعقوب الكندي (আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-কিন্দী)

علم الفلسفة (দর্শনশাস্ত্র)

১. أبو نصر الفارابي (আবু নসর আল-ফারাবী)

২. أبو حامد الغزالي (আবু হামিদ আল-গাজ্জালী)

৩. يحيى بن عدى النصراني (ইয়াহইয়া ইবনে আদী আল-নাসরানী)

৪. ابو على بن زرعة النصراني (আবু আলী ইবনে জুরাহ আন-নাসরানী)

৫. ابو الحسن على بن هارون (আবুল-হাসান আলী ইবনে হারুন)

৬. الزنجاني (আল-জানজানী)

৭. ابو الخير الحسن بن موار (আবুল-খায়ের আল-হাসান ইবনে মাওয়ার, যিনি ابن الخمار নামে পরিচিত)

৮. أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল-রাযী)

৯. ابو يوسف يعقوب الكندى (আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-কিন্দী)

১০. ابو الفرج على بن الحسين بن هندو (আবুল-ফারাজ আলী ইবনে আল-হুসাইন ইবনে হান্দুভী)

علم المنطق (যুক্তিবিদ্যা)

১. عبد الله بن المقفع (আবদুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা)

২. ثمامة بن الأشرس (সুমামা ইবনুল আশরাস)

৩. يحيى بن المبارك (ইয়াহইয়্যা ইবনুল মুবারক)

৪. ابو نصر الفارابي (আবু নসর আল-ফারাবী)

৫. ابو على بن زرعة (আবু আলী ইবনে জুরয়াহ)

৬. يحيى بن عدى النصراني (ইয়াহইয়া ইবনে আদী আন-নাসরানী)

৭. أبو بشر متى بن يونس (আবু বিশর মাত্তা ইবনে ইউনুস)

علم الكلام (ধর্মতত্ত্ব)

১. ابو الهذيل العلاف (আবুল-হুযাইল আল-আল্লাফ)

২. أحمد بن يحيى بن اسحاق (আহমদ বিন ইয়াহইয়া ইবনে ইসহাক)

৩. الراوندي (আল-রাওয়ান্দী)

৪. احمد بن ابى داوود (আহমদ বিন আবি দাউদ)

৫. ثمامة بن الأشرس (সুমামা ইবনুল আশরাস)

علم الفلك والتنجيم (জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র)

১. ابو عبد الله محمد بن جابر البناني (আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন জাবির আল-বনানী)

২. موسى بن شاكر (মুসা বিন শাকির)

৩. ابو سهل الفضل بن نوبخت (আবু সাহল আল-ফযল ইবনে নওবাখত)

৪. محمد بن ابراهيم الفزاري (মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম আল-ফাজারী)

৫. يحيى بن أبي منصور (ইয়াহইয়া বিন আবি মানসুর)

৬. محمد بن موسى الخوارزمي (মুহাম্মদ বিন মুসা আল-খাওয়ারিজমী)

৭. على بن عيسى الأسطرلابي (আলী বিন ইসা আল-আস্তরলাবী)

৮. ما شاء الله (মাশা আল্লাহ)

৯. ابو الريحان محمد بن احمد البيروني (আবু রায়হান মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-বিরুনী)

১০. العباس بن سعيد الجوهري (আল-আব্বাস বিন সাইদ আল-জাওহারী)

১১. احمد بن محمد النهاوندى (আহমদ বিন মুহাম্মদ আন-নাহাওয়ান্দী)

১২. يحيى بن البطريق (ইয়াহইয়া বিন আল-বাতরিক)

১৩. أبو حامد بن محمد الصاغاتي (আবু হামিদ বিন মুহাম্মদ আস-সাগতী)

১৪. سهل بن بشار (সাহল বিন বাশশার)

১৫. عبد العزيز القابسي (আব্দুল আজিজ আল-কাবিসী)

১৬. ابن أعلم الشريف البغدادي (ইবনে আলাম আশ-শরীফ আল-বাগদাদী)

১৭. أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن يوسف الأسطرلابي (আবুল-কাসিম হিবাতুল্লাহ বিন আল-হাসান বিন ইউসুফ আল-আস্তরলাবী (যিনি البديع الأسطر নামে পরিচিত ছিলেন।)

১৮. ابو اسحاق ابراهيم بن سنان بن قرة (আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন সিনান বিন কুররাহ)

১৯. محمد بن عيسى ابو عبد الله المهاني (মুহাম্মদ বিন ইসা আবু আবদুল্লাহ আল-মাহানী)

২০. أبو الحسن على بن اسماعيل الجوهري (আবুল-হাসান আলী বিন ইসমাইল আল-জাওহারী)

২১. ابو جعفر بن أحمد الكوهني (আবু জাফর বিন আহমদ আল-কুহানী)

২২. على بن زياد التميمي (আলী বিন জিয়াদ আত-তামিমী)

علم الطب (চিকিৎসাশাস্ত্র)

১. جرجس بن بختيشوع (জরজিস বিন বখতিশু)

২. جبرائيل بن بختيشوع (জিব্রিল বিন বখতিশু)

৩. يوحنا بن ماسويه (ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ)

৪. حنين بن اسحاق (হুনাইন বিন ইসহাক)

৫. ابو يوسف يعقوب الكندي (আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-কিন্দী)

৬. قسطا بن لوقا البعلبكي (কুস্তা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী)

৭. أبو بكر الرازي (আবু বকর আল-রাযী)

৮. على بن العباس المجوسى (আলী বিন আব্বাস আল-মাজুসী)

৯. ابن بطلان الحكيم (ইবনে বুতলান আল-হাকিম)

১০. ابن جزلة البغدادي (ইবনে জাজলাহ আল-বাগদাদী)

১১. على بن عيسى الكحال (আলী বিন ইসা আল-কাহ্হাল)

১২. ابن التلميذ البغدادي (ইবনে আল-তিলমিদ আল-বাগদাদী)

১৩. موفق الدين عبد اللطيف البغدادي (মুওয়াফ্ফাক আল-দীন আবদুল-লতিফ আল-বাগদাদী)

১৪. أبو البركات بن على ملك (আবুল-বারাকাত বিন আলী মালিক)

১৫. ابن هبل البغدادي (ইবনে হুবাল আল-বাগদাদী)

১৬. ثابت بن ابراهيم (সাবিত বিন ইব্রাহিম)

علم الرياضيات (গণিতশাস্ত্র)

১. محمد بن موسى الخوارزمى (মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমী)

২. أبو يوسف يعقوب الكندى (আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-কিন্দী)

৩. احمد بن موسى بن شاكر (আহমদ বিন মুসা বিন শাকির)

৪. محمد بن موسى بن شاكر (মুহাম্মদ বিন মুসা বিন শাকির)

৫. الحسن بن موسى بن شاكر (আল-হাসান বিন মুসা বিন শাকির)

৬. ثابت بن قرة (সাবিত বিন কুররাহ)

৭. ابو بكر محمد بن حسن الكرخي (আবু বকর মুহাম্মদ বিন হাসান আল-কারখী)

৮. محمد بن جابر بن سنان (মুহাম্মদ বিন জাবির ইবনে সিনান)

৯. ابو عبد الله البتاني (আবু আবদুল্লাহ আল-বাত্তানী)

১০. الحسن بن الهيثم (আল-হাসান ইবনুল হায়সাম)

১১. محمد بن محمد بن يحيى بن اسماعيل بن العباس ابو الوفا البوزجاني (মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন ইসমাইল বিন আল-আব্বাস আবুল-ওয়াফা আল-বুজ্জানী, যিনি البوزجاني الحاسب নামে অধিক পরিচিত ছিলেন।)

১২. أبو القاسم على بن احمد (আবুল-কাসিম আলী বিন আহমদ)

১৩. المحتسبي الأنطاكي (আল-মুহতাসিবী আল-আনতাকী)

১৪. ابو النصر الكلوازي (আবু আন-নাসর আল-কালওয়াজী)

১৫. ابو الرشيد الرازي البرهاني (আবুর-রশিদ আল-রাজি আল-বুরহানী)

১৬. ابو حنيفة بن داود الدينوري (আবু হানীফা বিন দাউদ আদ-দিনাওয়ারী)

১৭. ابو اسحاق ابراهيم بن علال الحراني (আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন ইলাল-হাররানী, যিনি ابن زهدون নামে পরিচিত ছিলেন।)

১৮. كمال الدين بن يونس (কামালুদ্দীন বিন ইউনুস)

১৭. قسطا بن لوقا البعلبكي (কুস্তা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী)

১৯. نصر الدين الطوسي (নাসিরুদ্দীন আত-তুসী)

বায়তুল হিকমার অনুবাদকদের তালিকা

আব্বাসী যুগে বাগদাদের 'বাইতুল হিকমাহ' ছিল অনুবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রধান কেন্দ্র। এখানে গ্রীক, সুরিয়ানী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের অনুবাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো[৩৭৯]

১. يوحنا بن ماسويه (ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ)

৩৭৯. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

২. حنين بن اسحاق العبادي (হুনাইন বিন ইসহাক আল-ইবাদী)

৩. ابو يوسف يعقوب الكندي (আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-কিন্দী)

৪. اسحاق بن حنين (ইসহাক বিন হুনাইন)

৫. الفضل بن سهل (আল-ফযল বিন সাহল)

৬. سهل بن هارون (সাহল বিন হারুন)

৭. حبيش بن الأعسم (হুবাইশ বিন আ'সাম)

৮. قسطا بن لومنا (কুস্তা বিন লুমনা)

৯. يوحنا بن البطريق (ইউহান্না বিন আল-বাতরিক)

১০. الحجاج بن يوسف بن مطر (আল-হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিন মাতার)

১১. عيسى بن اسحاق بن زرعة (ইসা বিন ইসহাক বিন জুর'য়াহ)

১২. ابن ناعمة الحمصى (ইবনে নাঈমা আল-হাম্মী)

১৩. سعيد بن يعقوب الدمشقى (সাঈদ বিন ইয়াকুব আল-দিমাশকী)

১৪. ثابت بن قرة الحراني (সাবিত বিন কুররাহ আল-হাররানী)

১৫. أبو بشر متى بن يونس (আবু বিশর মাত্তা বিন ইউনুস)

১৬. موسى بن خالد الترجمان (মুসা বিন খালিদ আত-তারজুমান)

১৭. عمر بن الفرخان الطبرى (ওমর বিন ফারখান আত-তাবারী)

১৮. يحيى بن عدى (ইয়াহইয়া বিন আদী)

বায়তুল হিকমা ও অমুসলিম মনীষী

বাগদাদে বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা ছিল মধ্যযুগের ইতিহাসে এক আলোকোজ্জ্বল ঘটনা-যেন অন্ধকার রজনীতে হঠাৎ জ্বলে ওঠা এক দীপশিখা। এটি কেবল একটি প্রতিষ্ঠান ছিল না; ছিল সভ্যতার সেতুবন্ধন, যুগের সঙ্গে যুগের সংলাপ। ভাষা, ধর্ম ও জাতিসত্তার ভিন্নতা অতিক্রম করে এ প্রতিষ্ঠানের ছায়াতলে একত্রিত হয়েছিল মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি পণ্ডিতগণ। গ্রীসের বিজ্ঞান, দর্শন ও

চিকিৎসাশাস্ত্র, গ্যালেনের তত্ত্ব, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শন, আলেকজান্ডারের (৩৫৬-৩২৩ খ্রি.পূ.) প্রজ্ঞা-সবই নতুন প্রাণ পেয়েছিল এখানে।

ইবনে নাদীম অনুবাদ আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন বায়তুল হিকমায় সেইসব অমুসলিম মনীষীদের; যারা বৈশ্বিক জ্ঞান, ঐতিহ্য ও প্রাচীন চিন্তাধারাকে আরবী ভাষায় রূপান্তর করার মহান কাজে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.), হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.), তাঁর পুত্র ইসহাক বিন হুনাইন (মৃ. ২৯৮ হি.), কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.), ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (মৃ. ২০০ হি/৮১৫ খ্রি.) প্রমুখ অনুবাদক ও পণ্ডিতগণ। এসকল জ্ঞানসাধকের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল অনুবাদ আন্দোলনের প্রাণশক্তি। তাঁদের শ্রম ও প্রজ্ঞার ফলে গ্রীক, সুরিয়ানী, ফারসী এবং অন্যান্য সভ্যতার সঞ্চিত জ্ঞান আরবী ভাষার ভাণ্ডারে প্রবেশ করে, যা পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা বিকাশে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। আব্বাসী যুগের শাসকগণের পৃষ্ঠপোষকতা, জ্ঞানপিপাসু এবং বিদ্বজ্জনের প্রতি সম্মান এ অনুবাদ আন্দোলনকে শক্ত ভিত প্রদান করেছিল। তাঁদের সহায়তায় অনুবাদকগণ নিরাপদ পরিবেশ, উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও গবেষণার সুযোগ পেয়েছিল-যার ফলস্বরূপ আরবী ভাষা এক বৈশ্বিক জ্ঞানের সেতুবন্ধনে পরিণত হয়।[৩৮০]

'বায়তুল হিকমার' বার্ষিক ব্যয়ের তালিকা

মিশরীয় ইতিহাসবিদ আল-মাকরিজী (১৩৬৪-১৪৪২ খ্রি.) খলিফা আল-ওয়াসিক বিল্লাহের (৮৪২-৮৪৭ খ্রি.) শাসনামলের 'বায়তুল হিকমার' বার্ষিক ব্যয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থাপন করেছেন। যদিও তা ব্যাপ্তি ও উদারতার দিক থেকে সীমিত তবু এ তালিকা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মৌলিক গ্রন্থ রচনা, গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির অনুবাদকরণ ও প্রস্তুতকরণের মতো খরচসমূহ রাষ্ট্রীয় ব্যয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব ব্যয় আসলে একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন-যেখানে জ্ঞানকে দেখা হয়েছে সভ্যতার অগ্রগতির মূল ভিত্তি হিসেবে। নিম্নে বায়তুল হিকমা গ্রন্থাগারের বার্ষিক ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা-[৩৮১]

---

৩৮০. ইবনে নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত* (বৈরুত: লেবানন, ১৩২৮ হি.), পৃ. ৩৪০-৩৪১

৩৮১. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বাইতুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২

ক্র.নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১	লেখার কাগজ	৯০ দিনার
০২	গুদাম	৪৮ দিনার
০৩	বিছানার গদি	১৫ দিনার
০৪	গ্রন্থ বাঁধাইকরণ	১২ দিনার
০৫	পাঠকের কাগজ, কালি এবং কলম	১২ দিনার
০৬	মজুদকরণ	১০ দিনার
০৭	পানি	১০ দিনার
০৮	শীতের উষ্ণ গদি	০৫ দিনার
০৯	শীতের ছাউনি	৪ দিনার
১০	পর্দা ঝুলানো	০১ দিনার
	মোট	**২০৭ দিনার**

আব্বাসী যুগে বায়তুল হিকমার প্রভাব

এসময়ে খলিফা ও রাজপুত্রদের উদ্যোগে 'বায়তুল হিকমাহ' ছাড়াও একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলোর প্রতিটিতে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত গ্রন্থাগার বিদ্যমান ছিল। এসব কেন্দ্রের কোনোটি বৃত্তি প্রদান করত। আবার কোনোটি অনুবাদ ও জ্ঞান আদান-প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করত। তাছাড়া আব্বাসী যুগে কাগজ তৈরির প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অনুবাদ আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। এর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় গ্রন্থাবলি অনুবাদকরণে গ্রন্থাগারের বিস্তার ঘটে, যা ইসলামী সভ্যতার বৌদ্ধিক অবকাঠামোকে সুদৃঢ় করে।[৩৮২]

এ ধারাবাহিকতায় আলী ইবনে ইয়াহইয়া আল-মুনাজ্জিম (মৃ. ২৭৫ হি./৮৮৮ খ্রি.) এক ব্যতিক্রমী ও অনন্য ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। আব্বাসীয় যুগের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আস্থাভাজন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন; একই সঙ্গে কবি, গল্পকার এবং খ্যাতিমান জ্যোতির্বিদ হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল আকাশচুম্বী। খলিফার পরিবারের নিকট তিনি এমন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন যে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়াবলি তাঁর কাছে ন্যস্ত হতো। খলিফাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ

৩৮২. হাসান ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলামিস সিয়াসী ওয়াদ দিনী ওয়াস সাকাফী ওয়াল ইজতিমায়ী* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১৯৫৩ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৮

যোগাযোগের পূর্বে তিনি মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম আল-মুসাবীর (মৃ. ৮৫১ খ্রি.) তত্ত্বাবধানে ছিলেন-যা তাঁর বৌদ্ধিক বিকাশ ও সামাজিক সংযোগের এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত। আলী ইবনে ইয়াহইয়া আল-মুনাজ্জিম (মৃ. ২৭৫ হি./৮৮৮ খ্রি.) মৌলিক গ্রন্থ রচনায় সক্রিয় ছিলেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-الشعراء القدماء والاسلاميين এবং أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلى।[৩৮৩]

আব্বাসী খলিফাদের পরে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি গণপাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে তা জ্ঞানান্বেষীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিশাল এ গ্রন্থাগার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিভিন্ন গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল। ইতিহাসবীদ ইয়াকুত আল-হামাউয়ী (১১৭৮-১২২৯ খ্রি.) বর্ণনা করেন যে, বাগদাদের নিকটবর্তী 'আল-কাফস' অঞ্চলের 'কারকার'-এ আলী ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আল-মুনাজ্জিমের একটি মূল্যবান সম্পত্তি ও সুদৃশ্য প্রাসাদ ছিল। এ প্রাসাদের ভেতরে অবস্থিত ছিল একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার, যার নামকরণ করা হয়েছিল ' خزانة الحكمة '। এ গ্রন্থাগারটি ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থী ও জ্ঞানান্বেষীরা এখানে অবস্থান করত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করত। গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পাঠকদের সেবার দায়িত্ব তিনি নিজেই পালন করতেন। এর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল জ্যোতির্বিদ আবু মা'শার আল-মুনাজ্জিম (৮০৭-৮৮৫ খ্রি.)। তিনি হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে খোরাসান থেকে মক্কায় যাত্রাপথে এ গ্রন্থাগারের খ্যাতি শুনে তিনি সেখানে প্রবেশ করেন এবং এর সমৃদ্ধ গ্রন্থসম্ভার দেখে বিস্মিত হন। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তাঁর পূর্বজ্ঞান সীমিত থাকলেও তিনি হজ্জ স্থগিত রেখে এখানেই অবস্থান করেন এবং গভীরভাবে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এ ঘটনা আলী ইবনে ইয়াহইয়া আল-মুনাজ্জিমের গ্রন্থাগারে জ্ঞানের বৈচিত্র্য, বিশেষত জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের প্রাচুর্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।[৩৮৪]

পাঠকদের সহায়তার জন্য তিনি নিজ অর্থে বেতনভুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, বাগদাদের উপকণ্ঠে তাঁর প্রাসাদে শিক্ষার্থী ও পাঠকদের আবাসন ও খাদ্যের ব্যবস্থা করেন; যেন তাঁর এ

---

৩৮৩. শামসুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর বিন খাল্লিকান, *ওফায়্যাতুল আ'য়ানি ওয়া আনবাউ আবনায়ীজ জামান* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, ১৩৬৭ হি./১৯৪৮ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৫-৫৬

৩৮৪. আবু আলী আল-হাসান আত-তানুখী, *নাশরুল-মুহাদারা ওয়া আখবারুল মুজাকারাহ* (দামেস্ক: ১৩৪৮ হি.), ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৮; হামিদ হাসান আদ-দামুর, *আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত তা'লিমি ফিল ইরাকী ফিল আসরিল আব্বাসীল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

গ্রন্থাগার একটি কার্যকর বর্তমান যুগের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। একক ব্যক্তি হিসেবে এ বিশাল দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বহন করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতুলনীয়। খলিফা আল-মা'মুন এবং আল-মুতাওক্কিল বিল্লাহ-এর মন্ত্রী বন্ধু আল-ফাতহ ইবনে খাকানের (১৬২-২৪২ হি.) সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এ বন্ধুর জন্য তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে মূল্যবান অনেক গ্রন্থ নিজ তত্ত্বাবধানে অনুবাদ করান। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি আব্বাসী যুগে গ্রন্থসংগ্রহ, অনুবাদকরণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণের ধারাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন।[৩৮৫]

অনুরূপভাবে ইরাকের মসুলে আবুল-কাসিম জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-মাওসিলির (১৬২-২৪২ খ্রি.) স্থাপিত জ্ঞানকেন্দ্রের সৌন্দর্য ও মহিমা অতুলনীয়। সেখানে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিষয়ের গ্রন্থ সংগ্রহ করে একটি সুবিশাল গ্রন্থাগার স্থাপন করেন, যা জ্ঞানান্বেষণীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কেউ দরিদ্র হলে তাঁকে কাগজ ও লেখার সরঞ্জাম প্রদান করা হতো-যাতে দারিদ্র্য কখনও জ্ঞানের পথে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। সর্বদা এ গ্রন্থাগারের দরজা উন্মুক্ত থাকত; ভ্রমণ থেকে ফিরে আল-মাওসিলী নিজেও সেখানে বসতেন, আর পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীরা তাঁর চারপাশে সমবেত হতো। ফলে সেখানে সৃষ্টি হতো এক প্রাণবন্ত সাহিত্য-সমাবেশ।[৩৮৬]

আব্বাসী যুগে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমার মাধ্যমে যে বৌদ্ধিক আন্দোলনের সূচনা হয়, তার ছাপ ছড়িয়ে পড়ে ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য নগরে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহৎ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, যেখানে সংরক্ষিত হতো জ্ঞানের অমূল্য রত্ন। আব্বাসী যুগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত তালিকা সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।[৩৮৭]

ক্র. নং	শহরের নাম	গ্রন্থাগারের নাম	প্রতিষ্ঠাতা	প্রতিষ্ঠার সন
০১	বাগদাদ	দারুল ইলম্	সাবুর বিন আরদাশির	৩৮১ হি.
০২	বাগদাদ	মাকতাবাতুন নিজামিয়্যাহ	আল্প আরসালান	৪৫৭ হি.
০৩	বাগদাদ	মাকতাবাতুল মুনতাসিরিয়্যাহ	আল-মুনতাসির বিল্লাহ	৬৩১ হি.
০৪	মাওসুল	দারুল ইলম্	ইবনে হামদুন	৩২৪ হি.
০৫	বসরা	মাকতাবাতু ইবনে সাওয়ার	ইবনে সাওয়ার	হি. ৪র্থ শতাব্দী

৩৮৫. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, ৩৫-৩৬
৩৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
৩৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

০৬	আলেপ্পো (হাল্ব)	মাকতাবুতুল হামাদানী	আল-আমীর আল-হামাদানী	হি. ৪র্থ শতাব্দী
০৭	কায়রো	মাকতাবুতুল আজহার	আল-আজীজ	৩৭০ হি.
০৮	কায়রো	দারুল হিকমাহ	আল-হাকিম বি আমরিল্লাহ	৩৯৫ হি.
৯	কায়রো	আল-মাকতাবাতুল ফাতিমিয়া	আল-কাযী আল ফাযিল	
১০	গজনী	মাকতাবাতুন গাজনাহ		৪২৫ হি.
১১	মার্ভ	আল-মাকতাবাতুন নিজামিয়াহ	নিজামুল মুলক্	হি. ৫ম শতাব্দী
১২	মার্ভ	আল-মাকতাবাতুল আজীজিয়াহ	আজীজুদ্দীন	হি. ৬ষ্ঠ শতাব্দী
১৩	শিরাজ	মাকতাবাতু ইদুদ্দৌলা	ইদুদ্দৌলা	হি. ৩৬৭
১৪	কর্ডোভা	মাকতাবাতুল মুনতাসির	আল-মুনতাসির বিল্লাহ	হি. ৩৫০
১৫	ফেজ	মাকতাবাতুল ফেজ	সুলতান আব্দুল হক	হি. ৫৯২

আধুনিক যুগে বায়তুল হিকমার প্রভাব

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ইসলামী সভ্যতা জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন এক নবযুগের সূচনা করে, যা মানব ইতিহাসে এক অনন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে চিহ্নিত। ইউরোপ যখন মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত, ইসলামী বিশ্ব তখন জ্ঞানের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। এ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল নিশাপুর, বুখারা, সমরকন্দ, বাগদাদ, কুফা, বসরা, দামেস্ক, কায়রো এবং কর্ডোবা থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে। এ ছিল এমন এক সভ্যতার উত্থান যেখানে ভাষা ছিল আরবী, কিন্তু অংশগ্রহণ ছিল বহু জাতি ও সংস্কৃতির মানুষের।[৩৮৮]

এ বৌদ্ধিক জাগরণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল হিকমাহ'-যা কেবল একটি গ্রন্থাগার নয়, বরং সাহিত্যভাণ্ডার সংরক্ষণ ও উদ্ভাবনের এক সমন্বিত প্রতিষ্ঠান। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখি-গবেষণা, আন্তর্জাতিক জ্ঞানবিনিময়, পৃষ্ঠপোষকতা ও বিশেষায়িত বিদ্যাচর্চা-এগুলোর প্রাথমিক রূপ আমরা বায়তুল হিকমায় খুঁজে পাই। এখানে গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার অনুবাদের মাধ্যমে আরবী ভাষায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে মুসলিম পণ্ডিতরা শুধু প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণই করেননি বরং তা বিশ্লেষণ, সংশোধন ও উন্নত করে নতুন বৈজ্ঞানিক ধারা সৃষ্টি করেন। রসায়ন, বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি এবং পাটিগণিত-এসব ক্ষেত্রে মুসলিম বিজ্ঞানীরা মৌলিক অবদান রাখেন। এ জ্ঞান পরবর্তীকালে আন্দালুস ও সিসিলির মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করে এবং ইউরোপীয় নবজাগরণের বৌদ্ধিক ভিত্তি গঠনে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে

৩৮৮. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০

'বায়তুল হিকমা' ছিল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার এক প্রাচীন পূর্বসূরী। যেখানে জ্ঞান ছিল আন্তর্জাতিক, গবেষণা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক এবং পাণ্ডিত্য ছিল পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত।[৩৮৯] ইতিহাসবীদ হায়দার বামাতের (১৮৯০-১৯৬৫ খ্রি.) মতে, "বাগদাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা কেবল ইউরোপকেই প্রভাবিত করেনি, বরং সমগ্র এশিয়ায় জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল।" অন্যদিকে জালাল মাজহার উল্লেখ করেন, খলিফা হারুন অর-রশিদের প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল হিকমাহ' ও অনুবাদ কেন্দ্র খলিফা আল-মামুনের সময়ে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং প্রাচীন বিশ্বের বিজ্ঞান ও দর্শনকে প্রাণ সঞ্চার করে।"[৩৯০]

ঐতিহাসিক মূল্যায়ন

আব্বাসী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের প্রধান মাধ্যম ছিল গ্রন্থাগার। পাণ্ডুলিপির দুষ্প্রাপ্যতা ও ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে গ্রন্থ ছিল অমূল্য সম্পদ। যারা শিক্ষাদান ও জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিলেন, তারা এসব গ্রন্থকে বিশেষ যত্নে ব্যবহার করতেন। 'বায়তুল হিকমাহ' ছিল ইসলামী বিশ্বের প্রথম উল্লেখযোগ্য গণগ্রন্থাগার এবং প্রকৃত অর্থে প্রথম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে পণ্ডিত ও গবেষকেরা সমবেত হতেন, শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অন্বেষণে ভিড় জমাতেন। চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যার সমন্বয়ে এখানে এক বহুমাত্রিক বৌদ্ধিক সংস্কৃতি গড়ে উঠে। উমাইয়্যা যুগের সূচনালগ্ন থেকেই মুসলিম খলিফাগণ আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনা ও তার বিস্তারে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন। মসজিদগুলোতে কুরআন মাজিদ ও জ্ঞানমূলক গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পণ্ডিতরা সওয়াবের আশায় নিজেদের গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি দান করতেন।[৩৯১] রোমের পতনের পর যে জ্ঞানের শৃঙ্খল ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল, ইসলামী সভ্যতা তা সযত্নে ধারণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে পৌঁছে দেয়। শুধু সংরক্ষণই নয়–নবসৃষ্টি, বিশ্লেষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সে-জ্ঞানকে সমৃদ্ধ ও জীবন্ত করে তোলে।[৩৯২]

---

৩৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০-৪৪১

৩৯০. প্রাগুক্ত, ৪৪১

৩৯১. রাফিদাহ ইসমাইল আতাউল মান্নান ইসমাইল, *বায়তুল হিকমাহ আল-বাগদাদি ওয়া আসারুহু ফিল হারাকতিল ইলমিয়্যাহ ফিদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৩৯২. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বায়তুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, ৪৪১-৪৪২

মুসলিম খলিফাগণ জ্ঞানচর্চাকে রাজকীয় মর্যাদা দান করেছিলেন। পণ্ডিতদের সম্মান প্রদর্শন, গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা এবং অনুবাদকদের পুরস্কৃত করার মাধ্যমে আব্বাসী যুগে গড়ে উঠেছিল এমন এক সভ্যতা, যার দীপ্তি প্রতিবেশী বিশ্বের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। ইউরোপ যখন দীর্ঘ নিদ্রা ভেঙে জেগে উঠল, তখন তারা জ্ঞানের আলোকবর্তিকা খুঁজে পেল ইসলামী বিশ্বের দিগন্তে। আন্দালুস ও সিসিলির পথ ধরে তারা এগিয়ে আসে সেই উৎসের দিকে, যেখান থেকে অবিরাম জ্ঞান প্রবাহিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে ফরাসী শিক্ষাবিদ অ্যামেলি সেডিলোট (১৮০৮-১৮৭৫ খ্রি.) বলেন, "মুসলিম মনীষীগণই ছিলেন বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপের জ্ঞানের পথপ্রদর্শক।" জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে ফরাসী ঐতিহাসিক আর্নেস্ট রেনান (১৮২৩-১৮৯২ খ্রি.) বলেন, "বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশে ছয় শতাব্দী ধরে মুসলমানদের অবদানই ছিল প্রধান।" আরেক ফরাসী ইতিহাসবেত্তা ও চিকিৎসক চার্লস মেরি গুস্তাভ লে বন (১৮৪১-১৯৩১ খ্রি.) লিখেছেন-"পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পাঁচশ বছর ধরে আরবদের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের বিকাশ ঘটিয়েছে।"[৩৯৩]

ইসলামী সভ্যতার বৌদ্ধিক ইতিহাসে বায়তুল হিকমার ধ্বংস ও অবক্ষয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যা মূলত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গোল আক্রমণের বিস্তৃত ভূরাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল শাসক সেনাপতি হালাকু খাঁনের (১২১৮-১২৬৫ খ্রি.) নেতৃত্বে বাগদাদ আক্রমণ আব্বাসী খেলাফতের ইতিহাসে এক চরম সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। আক্রমণের সময় মঙ্গোল সৈন্যরা খলিফাদের প্রাসাদ, ধন-সম্পদ, বাদশাহদের উপহার এবং গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্র ধ্বংস ও লুণ্ঠন করে। বিশেষভাবে বাগদাদের 'বায়তুল হিকমাহ' এবং অন্যান্য সরকারি ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও মঙ্গোলদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়। পাঠাগারে সংরক্ষিত সংগ্রহগুলোর কিছু অংশ আগুনে পুড়িয়ে এবং অবশিষ্টাংশ টাইগ্রিস নদীতে ফেলে ধ্বংস করা হয়। এ ঘটনা ইসলামী বিশ্বের ইতিহাসে আব্বাসী খেলাফতের শতাধিক বছরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলোর ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতির এক মর্মান্তিক অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি শুধু রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাবের কারণে নয়, বরং বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসের কারণে সমগ্র মধ্যযুগীয় ইসলামী সভ্যতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

---

৩৯৩. প্রাগুক্ত, ৪৪২

৯. ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

আব্বাসী যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও বিকাশে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার এক অনন্য ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রনির্ভর শিক্ষাকেন্দ্র ও গ্রন্থাগারের পাশাপাশি বহু পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিজেদের অর্থ ও অনুরাগে প্রাসাদ ও গৃহে গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন যাতে তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। তবে এসব গ্রন্থাগার ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হলেও এগুলোর কার্যকারিতা ব্যক্তিগত ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং লেখক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায়শই উন্মুক্ত থাকত। ফলে এগুলো বাস্তবিক অর্থে আধা-সরকারি গ্রন্থাগারের মর্যাদা লাভ করে–যেখানে জ্ঞান ছিল সামাজিক সম্পদ এবং পাঠাগার ছিল বৌদ্ধিক বিনিময়ের প্রাণকেন্দ্র।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাগদাদ ও অন্যান্য ইরাকী নগরকেন্দ্রে যে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সঞ্চার ঘটে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে তা পূর্ণতা লাভ করে। এ বৌদ্ধিক উন্মেষের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে বহু পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রনায়ক তাঁদের প্রাসাদ ও বাসভবনে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। গ্রন্থ সংগ্রহ তখন কেবল জ্ঞানার্জনের মাধ্যম ছিল না; বরং তা সামাজিক মর্যাদা, রুচিবোধ ও বিদ্যাপ্রীতির প্রতীক হয়ে উঠে। জ্ঞানের মূল্য উপলব্ধি করে তাঁরা দেশ-বিদেশ থেকে দুর্লভ ও মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহে বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন এবং এমন কোনো খ্যাতিমান পণ্ডিত বা লেখক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল যার গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য নিজস্ব গ্রন্থভাণ্ডার ছিল না।[৩৯৪] এ ধরণের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থাগার হলো-

১. مكتبة اسحق بن إبراهيم الموصلي (ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম আল-মাওসিলীর গ্রন্থাগার)

কবিতা ও সংগীতে অসামান্য অবদান রাখার পাশাপাশি ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম আল-মাওসিলী (মৃ. ২৩৫ হি./৮৪৯ খ্রি.) ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জ্ঞান, সততা ও বিশ্বস্ততায় তিনি ছিলেন অনন্য। খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) সর্বদা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা

---

৩৯৪. হামিদ হাসান আদ-দামুর, *আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত তা'লিমি ফিল ইরাকী ফিল আসরিল আব্বাসীল আওয়াল* (জর্ডান: জামিয়াতু মু'তাহ, ১৯৯৬ খ্রি.), ২৯৩

করতেন। আল-মাওসিলী সম্পর্কে খলিফার নিম্নোক্ত মন্তব্য তাঁর ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রদর্শনের এক গভীর ইঙ্গিত বহন করে। খলিফা বলেন, "যদি ইসহাক আল-মাওসিলী পূর্বে মানুষের মধ্যে যেভাবে পরিচিত ছিলেন এবং ইসলামী সংগীতচর্চায় তাঁর যে খ্যাতি ছিল তা না থাকত, তবে আমি তাঁকে আমার সভায় বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতাম; কারণ তিনি অধিক যোগ্য, পবিত্র এবং অধিক সত্যবাদী।" গ্রন্থসংগ্রহে তাঁর গভীর অনুরাগের প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে, যেখানে আরবী ভাষার সহস্রাধিক গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। তাঁর এ গ্রন্থাগারে জ্ঞানপিপাসুগণ অবাধে জ্ঞান আহরণ করত।[৩৯৫] তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন লেখকের একাধিক গ্রন্থ ছিল। এ প্রসঙ্গে ইবনে নাদীম উল্লেখ করেন, "ইসহাক আল-মাওসিলির গ্রন্থাগারটি ছিল একটি গণ গ্রন্থাগার, যেখানে বিভিন্ন গ্রন্থের সংগ্রহ ছিল।" আবুল-হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উবাদ ইবনে আল-জুবায়ের আল-কুফী আল-আসাদির (৮৬৭-৯৫৭ খ্রি.) এক বর্ণনায় ইবনে নাদিমের এ তাৎপর্যময় মন্তব্যটি প্রতিফলিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন, ফযল ইবনে মুহাম্মদ আল-ইয়াজিদী তাঁর কাছে বর্ণনা করেছিলেন যে, একদিন তিনি ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম আল-মাওসিলীর (মৃ. ২৩৫ হি./৮৪৯ খ্রি.) সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলেন। এমনসময় এক ব্যক্তি এসে অনুরোধ করল, "হে আবু মুহাম্মদ! আমাকে গজলের গ্রন্থটি দিন।" ইসহাক শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "তুমি কি সেই সংকলনটি চাইছো, যা আমি নিজে প্রস্তুত করেছি–নাকি সেই গ্রন্থ, যা আমার জন্য সংকলিত হয়েছিল?"[৩৯৬]

২. مكتبة أبو عمرو بن العلاء (আবু আমর বিন আলাউয়ের গ্রন্থাগার)

আবু আমর বিন আলাউ (মৃ. ১৫৪ হি./৭৭০ খ্রি.) সাতজন প্রসিদ্ধ কিরায়াতকারীদের অন্যতম। এ মহাপণ্ডিত সম্পর্কে আবু উবাইদাহ (মৃ. ৮২৫ খ্রি.) মন্তব্য করেন, "আবু আমর ছিলেন পবিত্র কুরআন, আরবী ভাষা, কবিতা ও আরব ইতিহাস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী; সংগৃহীত গ্রন্থে তাঁর ঘরের ছাদ পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে থাকত।"[৩৯৭] এ বর্ণনা তাঁর গ্রন্থসংগ্রহের ব্যাপ্তি যেমন নির্দেশ করে তেমনি তাঁর জ্ঞানানুরাগের গভীরতাও তুলে ধরে।

---

৩৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০-৩১১

৩৯৬. ইবনে নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৩৯৭. হামিদ হাসান আদ-দামুর, *আত-তারবিয়াতু ওয়াত তা'লিমি ফিল ইরাকী ফিল আসরিল আব্বাসীল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

৩. مكتبة سفيان الثورى (সুফিয়ান আস-সাওরীর গ্রন্থাগার)

আব্বাসী যুগে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকারীদের মধ্যে সুফিয়ান আস-সাওরী (মৃ. ১৬১ হি./৭৭৭ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য একটি নাম। ইতিহাসে তাঁর জীবনাবসানের প্রাক্কালের একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা উল্লেখ আছে। মানব সম্পর্কে লিখিত কিছু বিষয়ে অনুতপ্ত হয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহ দাফন করার অসিয়ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবু আবদুর রহমান আল-হারিসী (মৃ. ৮০৫ খ্রি.) কিছু কিতাব দাফন করে এ অসিয়ত পূরণে সহায়তা করেন। অন্যদিকে ইসা ইবনে ইউনুস আল-কুফী আল-হাফিজ (মৃ. ৮০৩ খ্রি.) বলেন: "সুফিয়ান যখন মৃত্যুবরণ করেন; তখন দেখা যায় যে, তাঁর পরিহিত পোশাকটি এক প্রতীকী গ্রন্থাগারে রূপ নিয়েছিল; যা তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ দিয়ে পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন।"[৩৯৮]

৪. مكتبة معاذ بن هشام (মুয়ায ইবনে হিশাম গ্রন্থাগার)

মুয়ায ইবনে হিশাম ইবনে আবি আব্দুল্লাহ (মৃ. ২০০ হি./৮১৫ খ্রি.) ছিলেন বসরার ইমাম, হাদীসের নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত ও বিজ্ঞ আইনজ্ঞ। নিজের জ্ঞানসাধনার নীরব সাক্ষ্য হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন এক সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। হাদীস বিশারদ ও ইতিহাসবিদ আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আল-মাদিনী আল-বাসরী (মৃ. ২৩৪ হি./৮৪৮ খ্রি.) তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেন, মক্কায় মুয়ায ইবনে হিশামকে যখন একজন প্রশ্ন করেছিল, "আপনার সংগ্রহে কী পরিমাণ গ্রন্থ আছে?" মুয়ায তখন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমার সংগ্রহে প্রায় দশ হাজার গ্রন্থ আছে।" এ কথা অনেকে অবিশ্বাস করল, কেউ অস্বীকার করল, কেউ আবার বিদ্রুপ করল। আল-মাদানী স্বীকার করেন, সেই মুহূর্তে তাঁরাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। কথাটি যেন অতিরঞ্জিত দাবি বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু সময়ের প্রবাহে সত্য নিজেই মুখ খুলে দেয়। যখন আমরা বসরায় পৌঁছলাম, তখন মুয়ায ইবনে হিশাম আমাদের সামনে তাঁর গ্রন্থাগার থেকে একের পর এক গ্রন্থ বের করে দেখালেন। তখন স্পষ্ট হয়ে উঠে মক্কার সেই সংক্ষিপ্ত উক্তি যা কোনো অলঙ্কারময় ছিল না; বরং ছিল জ্ঞানসংগ্রহের নিরাভরণ সত্য। সেদিন উপহাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর জ্ঞানের ভারে নত হয়েছিল সন্দেহ।[৩৯৯]

---

৩৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪
৩৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

৫. خزانة الواقدي (আল-ওয়াকিদির কোষাগার)

সামরিক অভিযান, সীরাত ও বিজয়ের ইতিহাস চর্চায় মুহাম্মদ ইবনে ওমর আল-ওয়াকিদী (১৩০-২০৭ হি.)[৪০০] এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর জ্ঞানের প্রকৃত পরিধি অনুধাবন করা যায় তাঁর গ্রন্থাগারের বিস্ময়কর নীরব প্রাচুর্য থেকে। বলা যায় তাঁর গ্রন্থগুলো ছিল কেবল কাগজে লেখা শব্দ নয়; সেগুলো ছিল চলমান ইতিহাস ও স্মৃতির আঁধার। যখন তিনি বাগদাদের পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তে স্থানান্তরিত হন, তখন তাঁর গ্রন্থসম্ভার পরিবহনের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ১২০টি উট। প্রতিটি উট যেন ইতিহাসের একেকটি অধ্যায় বহন করছিল। আবার তাঁর মৃত্যুর পর দেখা যায়-তিনি যে গ্রন্থসম্ভার রেখে গেছেন তা বহন করতে ৬০০টি উটের প্রয়োজন হয় এবং প্রতিটি বোঝা এমন ভারী ছিল একেকটি উটের বোঝা নামাতে দু'জন মানুষের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন হতো। এ যেন জ্ঞানের এক চলমান কোষাগার, যা মানুষের সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তবু আল-ওয়াকিদী (মৃ. ২০৭ হি./৮২২ খ্রি.) বিনয়ী কণ্ঠে বলতেন,

ما من احد الا وكتبه اكثر من حفظه، وحفظي اكثر من كتبي.

"প্রত্যেকের বই তার স্মৃতির চেয়ে বেশি, আর আমার স্মৃতি আমার বইয়ের চেয়ে বেশি।"

এ উক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর আত্মবিশ্বাস, স্মৃতিশক্তি ও বৌদ্ধিক স্বাতন্ত্র্য–যেখানে লিখিত জ্ঞানও তাঁর মানসিক ভাণ্ডারের তুলনায় গৌণ বলে প্রতীয়মান।[৪০১] তাঁর ঘরে দিন-রাত কলমের শব্দ থামত না। দু'জন সহকারী সর্বদা লিখে যেতেন, যেন সময়কে ধরে রাখার এক নিরন্তর প্রয়াস। এ লেখনীর ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেন মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.)-যিনি পরবর্তীতে আল-ওয়াকিদির কলম ও তাঁর চিন্তার বিশ্বস্ত বাহক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৪০২]

---

৪০০. মুহাম্মদ ইবনে উমর আল-ওয়াকিদী (১৩০-২০৭ হি.) আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আসলামের বংশধর। তিনি মদীনায় ১৩০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে চলে যান এবং খলিফা আল-মামুন (১৯৮-২১৮ হি./৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) তাঁকে সেনাবাহিনীর বিচারক নিযুক্ত করেন। তিনি যুদ্ধ, জীবনী, হাদীসশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিখ্যাত এ জ্ঞানী ২০৭ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের ১১ তারিখ সোমবার ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে বাগদাদের আল-খায়জুরান কবরস্থানে দাফন করা হয়। দ্র. ইবনে নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৪০১. হামিদ হাসান আদ-দামুর, *আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত তা'লিমি ফিল ইরাকী ফিল আসরিল আব্বাসীল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫; ইবনে নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৪০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

৬. مكتبة ابن بسطام (ইবনে বাস্তামের গ্রন্থাগার)

ইয়াহইয়া ইবনে আউন ইবনে জিয়াদ ইবনে বুস্তাম (মৃ. ২৩৩ হি./৮৪৭ খ্রি.) রেখে গিয়েছিলেন এক বিস্ময়কর জ্ঞানভাণ্ডার। তাঁর উত্তরাধিকারে ছিল বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১১৪টি গ্রন্থ। সংখ্যার পরিমাণ যেমন চমকপ্রদ তেমনি সংরক্ষণপদ্ধতিও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন গ্রন্থ দ্বারা চারটি বৃহৎ মদের পাত্র পরিপূর্ণ ছিল। পাত্রগুলো যেন আর মদের ধারক ছিল না; সেগুলো রূপ নিয়েছিল জ্ঞানের আঁধারে।[৪০৩]

৭. مكتبة الكندي (আল-কিন্দীর গ্রন্থাগার)

ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার নির্মাণে অনন্যতা অর্জনকারী পণ্ডিতদের অগ্রভাগে ছিলেন ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দী (মৃ. ২৪৬ হি./৮৬০ খ্রি.)। গ্রীক দর্শন, প্রাচীন বিজ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের গ্রন্থ সংগ্রহের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অসাধারণ। তবে জ্ঞানের এ নিবেদন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত ছিল না। তাঁকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক ক্ষমতার বলয়ে ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্ম নেয়। বিশেষত মুসা ইবনে শাকিরের পুত্র মুহাম্মদ ও আহমদের মধ্যে, যারা খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহের (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) শাসনামলে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। অবশেষে তাদের এ ঈর্ষা ষড়যন্ত্রে রূপ নেয়। খলিফার নির্দেশে আল-কিন্দীকে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়; তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে সংগৃহীত গ্রন্থসমূহ জব্দ করে রাখা হয় পৃথক এক স্থানে, যা মূলত পরিচিত হয় 'আল-কিন্দীয়াহ' নামে। তাঁর গ্রন্থতালিকা ১২ পৃষ্ঠার অধিক বিস্তৃত ছিল। এ দীর্ঘ তালিকা কেবল গ্রন্থসংখ্যার পরিমাণ নির্দেশ করে না; বরং এটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ক্যাটালগ ব্যবহারের প্রথা ও সে-সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অগ্রগতির নিদর্শনকে স্পষ্ট করে তোলে।[৪০৪]

৮. خزانة الجاحظ (আল-জাহিজের গ্রন্থাগার)

গ্রন্থের প্রতি আব্বাসী যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ আল-জাহিজের (মৃ. ২৫৫ হি./৮৬৮ খ্রি.) ভালাবাসার তুলনা বিরল। তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধি ছিল-তিনি এমন কোনো গ্রন্থ দেখেননি, যা সম্পূর্ণ না পড়ে রেখে দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডার এতটাই সমৃদ্ধ ছিল যে তা প্রায় কিংবদন্তির ন্যায় শোনা যায়-দেয়ালের মতো সারিবদ্ধ করে রাখা বইয়ের স্তূপ ভেঙে পড়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। সত্য

---

৪০৩. হামিদ হাসান আদ-দামুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫
৪০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

হোক বা রূপক হোক-এ ঘটনা তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহের বিপুলতা যেমন নির্দেশ করে, তেমনি জ্ঞানচর্চার প্রতি তাঁর নিবিড় আসক্তির ইঙ্গিতও বহন করে।[৪০৫]

৯. مكتبة حنين بن اسحاق (হুনাইন বিন ইসহাকের গ্রন্থাগার)

হুনাইন বিন ইসহাক আল-ইবাদী (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) হিরার খ্রিস্টান পণ্ডিত ও প্রখ্যাত চিকিৎসক যিনি গ্রীক, সুরিয়ানী ও আরবী ভাষায় ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী।[৪০৬] গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন, গ্রন্থ সংগ্রহ, অনুবাদ ও সংরক্ষণের জন্য তিনি রোমসহ বিভিন্ন ভূখণ্ড ভ্রমণ করেন। তাঁর গ্রন্থাগারে চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থের আধিক্য ছিল, যা তাঁর পেশাগত আগ্রহের প্রতিফলন। একই সঙ্গে বহুভাষিক দক্ষতার কারণে তাঁর গ্রন্থের তাকগুলো ভরে উঠেছিল বিভিন্ন ভাষায় রচিত জ্ঞানভাণ্ডারে।[৪০৭]

১০. مكتبة أبو حاتم السجستاني (আবু হাতিম আল-সিজিস্তানির গ্রন্থাগার)

আবু হাতিম আল-সিজিস্তানী নামে খ্যাত বসরার অধিবাসী সাহল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উসমান (মৃ. ২৫৫ হি.) ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ, কবি, কুরআন বিশারদ ও গ্রন্থ অনুরাগী। গ্রন্থাগারের প্রতি তাঁর গভীর সম্পৃক্ততা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি প্রায় বাগদাদে যেতেন এবং সেখানকার সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারসমূহে অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন। তৎকালীন বসরায় তাঁর মতো গ্রন্থের সংগ্রহ কোনো ব্যক্তির ছিল না। মৃত্যুকালে তাঁর গ্রন্থসম্ভারের মূল্য দাঁড়ায় ১৪ হাজার দিনার-যা কেবল অর্থমূল্য নয়, জ্ঞানমূল্যেরও এক বড় সূচক। পরবর্তীতে ইয়াকুব ইবনে আল-লাইস আল-খারিজী (মৃ. ৮৭৯ খ্রি.) মহামূল্যবান এ সংগ্রহশালা ক্রয় করে নিজ তত্ত্বাবধানে নেন।[৪০৮]

১১. مكتبة أبو اسحاق إبراهيم الحربي (আবু ইসহাক ইব্রাহিম আল-হারাবির গ্রন্থাগার)

আবু ইসহাক ইব্রাহিম আল-হারবী (মৃ. ২৮৫ হি./৮৯৮ খ্রি.) ছিলেন আব্বাসীয় শাসনামলের একজন বিখ্যাত জ্ঞানসাধক। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল এক বিশাল গ্রন্থাগার, যা তিনি নিজ বাড়ির বারান্দায় সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলেন। এ বারান্দায় ছিল তাঁর নিরিবিলি আশ্রয়-যেখানে তিনি বসে বই পড়ে

---

৪০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭

৪০৬. ইবনে নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯

৪০৭. আল-কিফাতী, *আখবারুল উলামাউ বি আখবারিল হুকামাউ* (মিশর : দারুল কুতুবুল খুদাইবিয়্যাহ, ১৩২৬ হি.), পৃ. ১১৯; হামিদ হাসান আদ-দামুর, *আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত তা'লিমি ফিল ইরাকী ফিল আসরিল আব্বাসীল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭-৩১৮

৪০৮. ইবনে নাদীম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬; হামিদ হাসান আদ-দামুর, *আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত তা'লিমি ফিল ইরাকী ফিল আসরিল আব্বাসীল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭-৩১৮

জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতেন। একদা তিনি অসুস্থ হলে তাঁর কন্যা ভবিষ্যতের কথা ভেবে দারিদ্রের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এসময় তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমার মেয়ে! তুমি কি দারিদ্রের ভয় পাও?" মেয়েটি নীরবে বলল, "হ্যাঁ।" তখন তিনি মেয়েকে বললেন, "ওই কোণে তাকাও।" মেয়েটি তাকিয়ে দেখল-সেখানে সারি সারি গ্রন্থ সাঁজানো। তখন তিনি বললেন, "এখানে ভাষার ১২ হাজার দুর্লভ শব্দ রয়েছে; যেগুলো আমি নিজ হাতে ব্যাখাসহ লিখেছি। আমি যদি মারা যাই, প্রতিদিন একটি অংশ এক দিরহামে বিক্রি করবে। যার কাছে ১২ হাজার দিরহাম আছে, সে কখনো দরিদ্র নয়।"[৪০৯]

এছাড়াও আব্বাসী যুগের যেসকল গ্রন্থপ্রেমী মনীষীদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছে। ১. আব্দুল মালিক ইবনে কুরাইব আল-আসমায়ী (মৃ. ২১৬ হি./৮৩১ খ্রি.), ২. মুহাম্মদ ইবনে জিয়াদ ইবনে আল-আরাবী (মৃ. ২৩১ হি./৮৪৫ খ্রি), ৩. আল-হাসান ইবনে উসমান আল-জিয়াদী (মৃ. ২৪৩ হি.), ৪. মুহাম্মদ ইবনে আল-হুসাইন ইবনে আবি বা'রা, ৫. ইসহাক ইবনে সুলাইমান আল-আব্বাসী (মৃ. ১৭৮ হি./৭৯৪ খ্রি.) প্রমুখ।

৪০৯. হামিদ হাসান আদ-দামুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮

চতুর্থ অধ্যায়

আব্বাসী যুগের খ্যাতিমান অনুবাদকগণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (মৃ. ২০০ হি./৮১৫ খ্রি.)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.)

চতুর্থ অধ্যায়

আব্বাসী যুগের খ্যাতিমান অনুবাদকগণ

আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট ও তাঁর উত্তরসূরীদের সময়ে সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় যে সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে তা পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাইজেন্টাইন শাসিত সিরিয়ায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার সংরক্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠে; এখানে ধর্মতত্ত্ব ছিল মুখ্য, তবে দর্শনশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যাও উপেক্ষিত ছিল না। অপরদিকে সাসানীয় সাম্রাজ্যে ৫৩১ খ্রিস্টাব্দে খসরু নাওসিরওয়ানের (মৃ. ৫৭৯ খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত 'জুন্দিশাপুর বিদ্যালয়' গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র বিকাশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে, যার প্রভাব আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেসোপটেমিয়ার 'হার্‌রান' শহরও গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল, যেটি গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও প্রাচীন ঐতিহ্য চর্চার প্রভাবের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হয়। এ তিন উৎসই অনুবাদ আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম জগতে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান উপস্থাপন করেছিল। উমাইয়্যা যুগ থেকেই জ্যোতিষশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অনুবাদের প্রমাণ মেলে। পরবর্তীতে আব্বাসীয় খলিফা আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.), হারুন-অর-রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) এবং আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) অনুবাদচর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। বাগদাদের 'বায়তুল হিকমা'র মাধ্যমে তাঁরা মৌলিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ, পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও জ্যোতির্বিদ্যা পর্যবেক্ষণকে একত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এসময়ে যে ব্যাপক অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালিত হয়, তা পূর্ববর্তী শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর সীমা অতিক্রম করে ইসলামী সভ্যতাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রধান ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।[৪১০] আব্বাসী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তির জোয়ার শুরু হলে আরবী, ফারসী, সুরিয়ানী ও গ্রীক ভাষায় দক্ষ একদল পণ্ডিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। এসময় অনুবাদকগণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যভাণ্ডার থেকে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অধ্যায়ে আব্বাসী যুগের প্রথিতযশা কয়েকজন সাহিত্যিকের অবদান সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো।

---

৪১০. কার্ল ব্রুকালম্যান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, অনু. ড. আব্দুল হালিম আন-নাজ্জা (কায়রো: দারুল মায়ারিফ, তা.বি), ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৮৯-৯১

প্রথম পরিচ্ছেদ

আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.)

ক্ষণজন্মা অনুবাদক আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা আব্বাসী যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিক, অনুবাদক ও সমাজসংস্কারক। অল্প সময়ে আরবী গদ্য সাহিত্য সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও বিভিন্ন ভাষার মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি আরবী ও অনারবী সাহিত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেছেন শাসক, শাসিত ও শাসন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা। সামাজিক অবক্ষয়ের কথা যেমন তিনি বলেছেন, তেমনি বলেছেন সমসাময়িক শাসকদের জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা। ধর্ম ও বুদ্ধির সংঘাতের প্রতি যেমন ইঙ্গিত করেছেন তেমনি অংগুলি নির্দেশ করেছেন আবেগ ও বিবেকের টানাপোড়নের প্রতি।[৪১১] তিনি ছিলেন অকুতোভয় কলমসৈনিক। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও সত্য প্রকাশই ছিল তাঁর ব্রত। সমাজ ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে যিনি ডাক দিয়েছিলেন পারসিক সমাজ ব্যবস্থাপনার উত্তমকে গ্রহণের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের। তাঁর প্রতিবাদী লেখা ও মনোভাবের কারণে তৎকালীন খলিফার নির্দেশে তাকে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

তাঁর নাম রূযবেহ। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উপনাম ছিল আবু আমর, ইসলাম গ্রহণের পর নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ এবং উপনাম দেওয়া হয় মুহাম্মাদ।[৪১২] পূর্ণ নাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ রূযবেহ ইবনে দাযুবিয়্যাহ।[৪১৩] তিনি ১০২ হি./৭২০ খ্রি.[৪১৪] বা ১০৬ হি./৭২৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে পারস্যের 'জুর' (বর্তমান ইরানের ফিরোজাবাদ) শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৪১৫] তাঁর পিতার নাম

---

৪১১. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২

৪১২. খলিল মিরদান, *ইবনুল মুকাফ্ফা আয়িম্মাতিল আদাব* (কায়রো: হিনদাভী ফাউন্ডেশন, তা.বি), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫

৪১৩. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল বুলসিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৪৩৬

৪১৪. *The Encyclopepeadia of Islam* (London: Luzac & Co. and Leiden: E.J.Brill, 1986), New Edition, Vol. 03 (Totall Vol. 12), P. 883

৪১৫. মুহাম্মাদ সালিম আল-জুন্দী, *আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা* (দামেস্ক: মাকতাবাতুল আরাবীয়্যাহ, ১৩৫৫ হি.), পৃ. ০৬; বাত্রুস আল-বুস্তানী, *উদাবাউল আরাব* (বৈরুত: দারুল জিল, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ১৩৬; আহ্মাদ হাসান আয্-যাইয়াত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৬৩

'দায়ুবেহ' এবং পিতামহের নাম 'মুবারক'। পিতা 'দায়ুবেহ' আরবীয় একজন যাদুকর ছিলেন; যিনি পরবর্তীতে আল-মুকাফফা নামে অধিক পরিচিতি লাভ করেন।[৪১৬] বসরার শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৬৬১-৭১৩ খ্রি.) কর্তৃক তিনি 'জুর' অঞ্চলের তহসিলদার বা কর কর্মকর্তা পদে নিযুক্ত হন। উক্ত পদে নিযুক্ত থাকাকালীন প্রজাদের নিপীড়ন করে অর্থ উপার্জন ও সরকারি কোষাগারের অর্থ আত্মসাতের শাস্তিস্বরূপ বেদম প্রহার করে তাঁর হাত কেটে দেওয়া হয়; ফলে তিনি চিরতরে পংঙ্গু হয়ে যান। তখন থেকেই তিনি আল-মুকাফ্ফা (কর্তিত হাত বিশিষ্ট) উপাধিতে অভিহিত হন।[৪১৭] এরপর থেকে তাঁর পুত্র রূয্বেহ 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৪১৮] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা বসরা নগরীতে আল-আহতাম পরিবারে তথা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের কর্ণধরদের মাঝেই বেড়ে উঠেন। বসরার শিক্ষা ও সাহিত্য কেন্দ্র এবং আল-আহতাম পরিবারের বাগ্মী শায়েখদের সাহচর্যে ও দীক্ষায় শিশুকালেই তিনি আরবী ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। আরবী ভাষা ও বাগ্মীতা শিক্ষার উদ্দেশ্যে সেসময়ের প্রখ্যাত বাগ্মী সুলাইমান বিন আলীর (৭০২-৭৫৯ খ্রি.)[৪১৯] সাথে প্রায় সাক্ষাত করতে যেতেন।[৪২০] তাছাড়াও তৎকালীন বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ আল-আসমায়ীর (৭৩৯-৮৩১ খ্রি.)[৪২১] কাছেও তিনি আরবী ব্যাকরণ শিক্ষালাভ করেন। ফলে অল্পসময়ে এ যুবক আরবী ভাষা, সাহিত্য ও বুদ্ধিমত্তায়

---

৪১৬. খলিল মিরদান, *ইবনুল মুকাফ্ফা আয়িম্মাতিল আদাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪১৭. ড. ওমর ফার্‌রুখ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী, আল-আ'সরুল আব্বাসীয়্যাহ* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৫১; কার্ল ব্রুকালম্যান, অনু. ড. আব্দুল হালিম নাজ্জার, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (কায়রো: দারুল মা'য়ারিফ, তা.বি), ৩য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৯২

৪১৮. খলিল মিরদান, *ইবনুল মুকাফ্ফা আয়িম্মাতিল আদাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫; ড. ওমর ফার্‌রুখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৪১৯. তার নাম আবু আইয়ুব সুলাইমান বিন আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আল-আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাইশী (أَبُوأَيُّوب سُلَيمان بن عَلِيُّ بن عبد الله بن العبَّاس بن عبد المُطَّلب الهاشِميُّ القُرشيُّ)। তিনি ছিলেন প্রথম আব্বাসীয় রাজপুত্রদের একজন। তার ভাগনে খলিফা আবু আব্বাস আস-সাফ্ফাহ (১৩২-১৩৬ হি./৭৫০-৭৫৪ খ্রি.) তাকে ১৩৩ হিজরী/৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বসরা এবং বসরার পার্শ্ববর্তী শহর টাইগ্রিস, বাহরাইন এবং ওমান-এর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। খলিফা আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মানসুর ১৩৯ হিজরী/৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

৪২০. খলিল মিরদান, *ইবনুল মুকাফ্ফা আয়িম্মাতিল আদাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৪২১. আল-আসমায়ী ছিলেন একজন কবি, কাব্য সংকলক ও আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ। তার পুরো নাম হলো, 'আব্দুল মালিক বিন কুরাইব আল-আসমায়ী। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রভূমি ইরাকের বসরা নগরীতে ১২২ হিজরী মোতাবেক ৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১৬ হিজরী মোতাবেক ৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল-মামুনের (১৯৮-২১৮ হি./৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) খেলাফতকালে বসরা নগরীতে ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ৪৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার রচনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো الأصمعيات (আল-আসমাইয়্যাত), كتاب خلق الانسان (কিতাবু খল্‌কিল ইংসান), كتاب الفرق (কিতাবুল ফারক্), كتاب الابل (কিতাবুল ইবল), كتاب الخيل (কিতাবুল খইল), كتاب الوحوش (কিতাবুল উহুশ), كتاب جزيرة العرب (কিতাবু জাজিরাতিল আরাব), كتاب المصادر (কিতাবুল মাসাদির) ইত্যাদি। দ্র. আহমাদ আল-ইসকান্দারী ও মুস্তাফা আনানী, *আল-ওয়াসিত ফিল আদাবিল আরাবী ওয়া তারিখিহী* (মিশর : দারুল মায়ারিফ, তা.বি), পৃ. ২৮৭; ড. ওমার ফাররুখ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৬*

আরবদের মাঝে পরিচিত হয়ে উঠেন।[৪২২] তিনি গ্রীক ভাষা থেকে ফারসী ভাষায় অনূদিত বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থগুলো অধ্যায়নের মাধ্যমে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হন। এছাড়াও তিনি পারসিক-সংস্কৃতি ও জরথুস্ত্র মতবাদ আত্মস্থ করার জন্য কয়েক বছর অতিবাহিত করেন।[৪২৩]

শিশুকাল থেকেই তিনি ইসলামী রীতিতে বেড়ে উঠলেও মূলত পরিণত বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আহ্মাদ হাসান আয্-যাইয়াত (১৮৮৫-১৯৬৮ খ্রি.) বলেন, আব্বাসীয় শাসনামলে খলিফা আল-মানসুরের (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.) চাচা ইসা ইবনে আলীর নিকট গমন করে তিনি বলেন,[৪২৪] "قد دخل الإسلام في قلبي وأريد أن أسلم على يدك" অর্থাৎ "আমার হৃদয়ে ইসলাম প্রবেশ করেছে, তাই আমি আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করতে চাই।" অতঃপর ঐ দিন রাতে এক প্রীতিভোজ সভায় তাঁর ইসলাম গ্রহণের সাক্ষী হিসেবে সেনাপতি ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সামনে তাকে উপস্থিত করা হয়। খাবার টেবিলে উপস্থিত হয়ে তিনি পারসিক প্রথার চিরাচরিত অভ্যাস ও প্রথানুযায়ী বিশেষ ধ্বনি করে খেতে শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে ইসা ইবনে আলী তাঁর সাথে কথা বললে তিনি বলেন,"كرهت أن أبيت على غير دين" অর্থাৎ "আমি বে-দ্বীন অবস্থায় রাত কাটাতে অপছন্দ করতাম।" এরপর পরদিন প্রত্যুষে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় 'আব্দুল্লাহ' এবং উপনাম রাখা হয় 'আবু মুহাম্মাদ'।[৪২৫]

আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এবং আরবী ও ফারসী সাহিত্যের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ইলমে বালাগাত, ভাষাতত্ত্ব ও অনুবাদসহ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। মৌলিক গ্রন্থ এবং গ্রীক ভাষা থেকে ফারসী ভাষায় অনূদিত বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থগুলো অধ্যায়নের মাধ্যমে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হন। তাছাড়া তিনি পারসিক-সংস্কৃতি ও জরথুস্ত্র মতবাদ আত্মস্থ করার জন্য কয়েক বছর অতিবাহিত করেন।[৪২৬]

বলা হয় যে, মুহাম্মাদ (স.)-এর সাহাবাদের পরে আরবদের মধ্যে খলিল এবং অনারবীদের মধ্যে ইবনুল মুকাফ্ফার চেয়ে অধিক মেধাবী আর কেউ ছিলেন না। এ দুই বন্ধু শুধু একবার একত্রে মিলিত

---

৪২২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৬ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩২

৪২৩. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল বুলসিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৪৩৭

৪২৪. আহ্মাদ রিফায়াত আল-বাদাভী ব্যাখ্যাকৃত, *আদ-দুররাতুল ইয়াতিমাহ* (বৈরুত: দারুন নাজাহ, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ১১

৪২৫. আহ্মাদ হাসান আয্-যাইয়াত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

৪২৬. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল বুলসিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৪৩৭; ড. শাওকি দায়িফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭।

হয়ে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলোচনার মধ্য দিয়ে একসাথে তিন দিন অতিবাহিত করেন এবং এরপর তাঁরা আলাদা হয়ে যান। অতঃপর খলিলকে জিজ্ঞেস করা হয় كيف رأيت عبد الله؟ অর্থাৎ "আপনি আব্দুল্লাহকে কেমন দেখলেন?" উত্তরে তিনি বলেন, ما شئت من علم و أدب ! إلا أن علمه أكثر من عقله. অর্থাৎ "আমি তাঁর সাহিত্যিক শিক্ষা ও জ্ঞান সম্পর্কে যতটা অবগত হয়েছি তাতে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তাঁর জ্ঞান হতে বুদ্ধি (বোধশক্তি) অধিক।" অপরদিকে আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফাকে খলিল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় كيف رأيت الخليل؟ অর্থাৎ "আপনি খলিলকে কেমন দেখলেন?" তদুত্তরে তিনি বলেন, ما شئت من علم وأدب ! إلا أن عقله أكثر من علمه অর্থাৎ "আমি তাঁর সাহিত্যিক শিক্ষা ও জ্ঞান সম্পর্কে যতটা অবগত হয়েছি তাতে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, নিশ্চয় তাঁর বুদ্ধি (বোধশক্তি) তাঁর জ্ঞানের চেয়ে অধিক।"[৪২৭] তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় من أدبك؟ অর্থাৎ "আপনাকে কে শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিয়েছেন?" উত্তরে তিনি বলেন, كنت إذا نفسي : رأيت من غيري حسنا أتيته' وإن رأيت قبيحا أبيته. অর্থাৎ "আমার অন্তর (আমাকে শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিয়েছে): যেহেতু যখন আমি অন্য কারো মধ্যে কোনো ভালো গুণাবলি লক্ষ্য করি তখন তা গ্রহণ করি। আর যখন কোনো খারাপ গুণাবলি লক্ষ্য করি তা পরিহার করি।" ভদ্রতা, মহত্ত্ব, সহানুভূতি, দুস্থের সেবা, কঠোর আত্মসমালোচনা এবং যে-কোনো মূল্যে বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করা ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। নৈতিক ও সামাজিক আলোকে শাসক ও প্রজা সাধারণের সংশোধনে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল । তাছাড়া শিষ্টাচার পালনেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট যত্নবান।[৪২৮]

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জনের পর তিনি 'কিরমান' অঞ্চলে গমন করেন এবং উমাইয়্যা শাসক দাউদ ইব্ন ইয়াযীদ ইবনে উমার ইব্ন হুবায়রার (৭২৬ খ্রি.) দরবারে মাত্র বিশ বছর বয়সে كاتب (সচিব)-এর দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের সূচনা করেন। পরবর্তীতে ইরাকের শাসক ইয়াযিদ ইব্ন উমার (মৃ. ৭৫০ খ্রি.) অতঃপর তাঁর ভাই দাউদের (মৃ. ৮২০ খ্রি.) দরবারে একই দায়িত্ব পালন করেন।[৪২৯] উমাইয়্যাদের পতনের পর আব্বাসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন

---

৪২৭. আহ্মাদ হাসান আয্-যাইয়াত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪; হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯

৪২৮. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

৪২৯. ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

মুহাম্মাদ আল-মানসুরের পিতৃব্য মুসলের শাসক ইসমাঈল ইবনে আলী (মৃ. ৮০২ খ্রি.) ও বসরার শাসক সুলাইমান বিন আলীর (৭০২-৭৫৯ খ্রি.) অধীনে كاتب (সচিব) পদে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর জীবনের উত্তম সময়গুলো কুফা ও বসরায় অতিবাহিত করেন। বাগদাদ নগরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইরাকের এ দু'টি শহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।[৪৩০]

কথিত আছে, আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) পবিত্র কুরআনের বিপরীত ' معارضة للقرآن' (কুরআনে বিপক্ষতা) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু বর্ণনাটিকে সঠিক বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে এ দাবিটি বিভিন্ন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা এই যে, তিনি নিজ জ্ঞান ও উচ্চ চিন্তা-ভাবনার কারণে স্বীয় রচনাবলিতে এমন মতবাদ ব্যক্ত করেছেন, যা অনুধাবন করতে অক্ষম ব্যক্তিগণ তাঁর ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছেন। এটিও চিন্তার বিষয় যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এমন কোনো কাজ করেননি, যার ফলাফল সম্পর্কে তিনি অনবহিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি যদি 'معارضة للقرآن'-এর ন্যায় কোনো গ্রন্থ রচনা কয়রতেন, তাহলে বসরার গভর্নর সুফিয়ান বিন মুয়াবিয়ার (মৃ. ৭৮০ খ্রি.) ন্যায় দুশমনের জন্য তাকে হত্যা করার অন্যকোন কারণ খুঁজতে হতো না এবং খলিফা তাঁকে হত্যার জন্য তিরস্কারও করতেন না। অতএব প্রমাণিত হয় যে, তিনি কুরআন মাজিদের বিপরীতে কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তবে এটা সম্ভব যে, তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে জ্ঞাত কোনো ব্যক্তি উক্ত নামে একটি গ্রন্থ রচনা করে তাঁর নামের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন।[৪৩১] তাছাড়া ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মাত্র কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন। সুতরাং এটা সন্দেহাতীত যে ইসলামপূর্ব জীবনের যিন্দিকবাদী চিন্তা ও সাহিত্য রচনা তাঁর অপরাধ হতে পারে না। কারণ ইসলাম পূর্ববর্তী অন্যায় সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়। অথচ সুফিয়ান বিন মুয়াবিয়া (মৃ. ৭৮০ খ্রি.) ছাড়া অন্য কেউ তাঁর ইসলাম পরবর্তী জীবনে যিন্দিকতাঁর সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ করেননি। অধিকন্তু এ অভিযোগ ছিল ব্যক্তিগত পূর্ব শত্রুতার কারণে। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত এ অভিযোগ আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৩২] এ প্রসঙ্গে আল-জাহশিয়্যারী (মৃ. ৩৩১ হি/৯৪৩ খ্রি.) বলেন, খলিফা আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ

---

৪৩০. ড. ফাকতুর আল-কাক, *ইবনুল মুকাফ্ফা, আদিবুল আ'কলি* (বৈরুত: দারুল কুত্তাব আল-লুবনানী, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ০৬

৪৩১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩

৪৩২. মুহাম্মাদ সালিম আল-জুন্দী, *আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

আল-মানসুর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)-এর ইঙ্গিত পেয়ে আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফার পূর্ব শত্রু সুফিয়ান বিন মুয়াবিয়া (মৃ. ৭৮০ খ্রি.) তাঁকে পাকড়াও করে বলেছিল-[৪৩৩]

والله يا ابن الزنديقة لأحقرك بنار الدنيا قبل نار الآخرة !

অর্থাৎ "আল্লাহর কসম, হে যিন্দিক রমণীর পুত্র ! জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে অবশ্যই দুনিয়ার আগুনে তোকে জ্বালাবো আমি।"

মূলত তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক উদার মানসিকতা সম্পন্ন ও উঁচুমানের সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যের সেবা করাই ছিল তাঁর ব্রত। আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করাই ছিল তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য।[৪৩৪] তবে তাঁর বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগ এনে তাঁকে যিনদিক বা ধর্মদ্রোহী বলে আখ্যা দেওয়া যথার্থ মনে হয় না। কারণ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি তিনি মেনে চলতেন এবং আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যার প্রমাণ তাঁর মৌলিক ও অনূদিত অনেক গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। যেমন আল-আদাবুল-কাবির গ্রন্থে ঈমানের মৌলিক বিষয়াবলি ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন[৪৩৫] فاصل الأمر في الدين أن تعتقد الإيمان على الصواب ، وتجتنب الكبائر وتؤدى الفريضة. فالزم ذلك لزوم من لا غنى له عنه طَرْفَةَ عَيْنٍ ، ومن يعلم أنه إن حُرمه هَلَكَ.

"ধর্মের মূলনীতি হলো: সঠিকভাবে ঈমানের বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করা, বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও অবশ্য করণীয় কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করা, অতপর দৃঢ়ভাবে সেগুলোকে ধারণ করে ক্ষণিকের জন্যও তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে না। আর তা থেকে যে বঞ্চিত হবে তাঁর ধ্বংস অনিবার্য।"

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা মাত্র ৩৬ বছর বয়সে বসরায় নিহত হন।[৪৩৬] তাঁর নিহত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

---

৪৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

৪৩৪. মুহাম্মাদ হাসান নায়িল আল-মারসাফী শুদ্ধিকৃত, *কালিলা ওয়া দিমনা*-এর ভূমিকাংশ (বৈরুত: দারুল মাসিরা, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১৭

৪৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৫

৪৩৬. ড. শাওকি দায়িফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী, আল-আসরুল আব্বাসিল আওয়াল* (কায়রো: দারুল মা'য়ারিফ, তা.বি), ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৫০৯

ক. 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থ রচনার পর তাঁর প্রতিবাদী মনোভাবের কারণে তৎকালীন খলিফার সাথে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। ফলে খলিফার নির্দেশনা অনুযায়ী সুফিয়ান বিন মুয়াবিয়া (মৃ. ৭৮০ খ্রি.) তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।[৪৩৭]

খ. কুরআন মাজিদের বিপরীত মনগড়া বক্তব্য রচনা করার কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়।[৪৩৮]

গ. রাজনৈতিক বিষয়ে লেখা 'রিসালাতুস সাহাবা' গ্রন্থ রচনাকে তাঁর হত্যার কারণ হিসেবেও মনে করা হয়। এটি ছিল খলিফা আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মানসুরকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি বিপ্লবী কর্মসূচী, যেখানে তিনি খোরাসানের সৈন্যদের জীবন-যাত্রার মান উন্নতি করতে এবং আইনশাস্ত্রীয় বিষয়ে একটি বিস্তৃত গ্রন্থ সংকলনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৪৩৯]

ঘ. তাঁর অকাল মৃত্যুর পশ্চাতে ধর্মীয় কোনো কারণ ছিল না; বরং ব্যক্তিগত আক্রোশ ও রাজনৈতিক কারণেই তাঁকে হত্যা করা হয়।[৪৪০]

আহ্মাদ হাসান আয্-যাইয়াত (১৮৮৫-১৯৬৮ খ্রি.) তাঁর হত্যার কারণ সম্পর্কে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফার পৃষ্ঠপোষক ইসা ইব্ন আলীর (৮৩-১৬৪ হি.) ভ্রাতা আব্দুল্লাহ, ভ্রাতুষ্পুত্র আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মানসুরের খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু খলিফা তাকে পরাজিত করেন। পরবর্তীতে ইসা ইব্ন আলীর সমঝোতায় উভয়ের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত হয়। এ শান্তিচুক্তি সম্পাদনের দায়িত্ব আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফার ওপর পড়লে তিনি এমন আবেগময়ী ভাষায় শান্তিচুক্তি রচনা করেন যে, খলিফা বিদ্রোহীকে ক্ষমা করার অঙ্গিকার করতে বাধ্য হন এবং শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এতে আবু জাফর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-মানসুরের সন্দেহপ্রবণ মন বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠে এবং তাঁকে كاتب (সচিব) পদ থেকে অপসারণের জন্য বসরার গভর্নর সুফিয়ান বিন মুয়াবিয়াকে (মৃ. ৭৮০ খ্রি.) নির্দেশ দেন। খলিফার নির্দেশ পেয়ে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন।[৪৪১] তাঁর মৃত্যুসন নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

---

৪৩৭. ড. শাওকি দায়িফ, *আল-ফান্নু ওয়া মাজাহিবুহু ফিন্ নাসরিল আরাবী* (মিশর: *দারুল আওয়াজী, তা.বি)*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৩৫-১৩৬

৪৩৮. ড. ফাকতুর আল-কাক, *ইবনুল মুকাফ্ফা, আদিবুল আ'কলি* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪৩৯. ড. শাওকি দায়িফ, *আল-ফান্নু ওয়া মাজাহিবুহু ফিন্ নাসরিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬; ড. ফাকতুর আল-কাক, *ইবনুল মুকাফ্ফা, আদিবুল আ'কলি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪৪০. আহ্মাদ হাসান আয্-যাইয়াত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৪৪১. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪

তিনি ৭৫৭ খ্রি.[৪৪২] ১৪৪ হি./৭৬১ খ্রি.[৪৪৩], ১৪৩ হি./৭৬০ খ্রি.[৪৪৪] মতান্তরে ১৩৯ হি./৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তবে অধিকাংশের মতে ক্ষণজন্মা এ অনুবাদক ১৪২ হি./৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে বসরায় শেষ নিঃশাষ ত্যাগ করেন।[৪৪৫]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফার সাহিত্যকর্ম

প্রাচীন ইরানের অন্যতম স্মৃতিস্তম্ভ এবং ইরানী জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা কর্মব্যস্ততার মাঝেও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার মানসে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।[৪৪৬] তিনি অল্পবয়সে নিহত হলেও অনেক মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করে আরবী সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়: ক. মৌলিক গ্রন্থ খ. অনূদিত গ্রন্থ।

ক. মৌলিক গ্রন্থ

আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফার (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) মৌলিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

١. الادب الصغير

ছোট এ গ্রন্থটি শিষ্টাচার ও নৈতিক উপদেশ বিষয়ক কিছু সারগর্ভ নীতিবাক্যের সংকলন। এসব নীতিবাক্য বহু মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সার নির্যাস। তবে গ্রন্থটি বিষয়গতভাবে বিন্যস্ত নয়। এটি একটি সামাজিক ও শিক্ষামূলক গ্রন্থ; যা জ্ঞান অন্বেষণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং একজন শিক্ষার্থীকে বিনয় শিক্ষা দেয়।[৪৪৭]

٢. الادب الكبير

এ গ্রন্থটিও নীতিবাক্যের সংকলন। তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থটি 'আল-আদাবুস স'গীর' এর চেয়ে বড় এবং বিষয়গতভাবে মোটামুটি বিন্যস্ত। দু'টি বিষয়কে কেন্দ্রকরে আবর্তিত হয়েছে পুরো গ্রন্থের

---

৪৪২. Philip K Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan Publishers Ltd, 1970), Tenth Edition, p. 308

৪৪৩. ইবনুল যাওজী, *আল-মুন্তাযামু ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম* (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৫২

৪৪৪. ড. শাওকি দায়িফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, *আল-আসরুল আব্বাসিল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৯; জুরজি যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবীয়্যাহ* (মিশর: মাতবায়া'তুল হিলাল, তা.বি), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১

৪৪৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩৩

৪৪৬. মুহাম্মাদ হাসান আয়াতুল্লাহ, *তারজামাতু আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা* (বৈরুত: জামিয়াতুল অ্যামেরিকিয়্যাহ, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ০৮

৪৪৭. কার্ল ব্রকালম্যান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

আলোচনা। মহান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী এ সাহিত্যিক তাঁর সুক্ষ্ম বিচার শক্তি ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার দ্বারা আলোচ্য বিষয়ে পূর্ববর্তীদের উপদেশাবলী ও সমসাময়িকদের মূল্যবান অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এটি আসীর আফিন্দীর পাণ্ডুলিপি হতে লেবাননের বিখ্যাত সাহিত্যিক শাকীর আরসালান (১৮৬৯-১৯৪৬ খ্রি.) ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কায়রো এবং ১৮৯৭ সালে বৈরুত থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। অতঃপর আহমদ যাকী পাশা (১৮৬৭-১৯৩৪ খ্রি.) ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এটি পুনঃপ্রকাশ করেন।[৪৪৮]

৩. الدرة اليتيمة فى إطاعة الملك

ইবনুল মুকাফফার 'আল-আদাবুল-কাবীর' গ্রন্থটি 'আল-ইয়াতীমাহ' নামে মুদ্রিত হয়েছিল। যে কারণে অনেকেই الادب الكبير ও الدرة اليتيمة فى إطاعة الملك গ্রন্থ দু'টিকে একটি গ্রন্থ মনে করেন। গ্রন্থটি দু'ভাগে বিভক্ত, ক. প্রবাদ-প্রবচন ও খ. ধর্মীয় আলোচনা সম্বলিত। তবে الادب الكبير গ্রন্থে উক্ত দু'টি বিষয়ের কোনোটি নিয়ে আলোচনা হয়নি। সুতরাং الدرة اليتيمة ও الادب الكبير দু'টি আলাদা গ্রন্থ, একই নয় ।[৪৪৯]

৪. رسالة الصحابة

ইবনুল-মুকাফ্ফা তাঁর رسالة الصحابة গ্রন্থে রাজনীতি বিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং আব্বাসীয় খালীফা আল-মানসুরকে কিছু উপদেশ দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে সমসাময়িক শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি নির্ণয় ও সংশোধনের পন্থা নির্দেশ করে তা খলিফার নিকট পেশ করেছিলেন। গ্রন্থের শুরুতে খলিফার প্রশংসা করেছিলেন এভাবে, "অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েও জানার আগ্রহে তাঁর ভাটা পড়েনি এবং পরামর্শ শ্রবণের সদিচ্ছারও অভাব নেই।" তিনি আরো বলেন, "অস্তিত্ব ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজনেই আব্বাসীয় খেলাফতে সেনাবাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম।" সেনাবাহিনী বিষয়ক আলোচনা এ গ্রন্থের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে।[৪৫০]

---

৪৪৮. হান্না আল ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, পাগুক্ত, ৪৩৯
৪৪৯. ড. শাওকী দায়িফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২
৪৫০. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২১

৫. حكم لابن المقفع

এটি ছোট ছোট জ্ঞানগর্ভ প্রবাদ সংবলিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি হিজরী ১৩২৪ সালে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মদ কুর্দ আলী (১৮৭৬-১৯১৯ খ্রি.) রচিত رسائل البلغاء গ্রন্থে এটি বিদ্যমান রয়েছে।[৪৫১]

৬. رسائل

এটি ইবনুল মুকাফফার পত্র সংকলন যা মুহাম্মদ কুরদ আলীর (১৮৭৬-১৯১৯ খ্রি.) তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত ছিল। এ সংকলনটিতে বিভিন্ন দেশের গ্রুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দূর্লভ চিঠিপত্র স্থান পেয়েছে।[৪৫২]

৭. الأدب الوجيز للولد الصغير

এটি উপদেশ সম্বলিত একটি পুস্তিকা। ধারণা করা হয় গ্রন্থটি স্বীয় পুত্রদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য রচনা করেন। এ পুস্তিকায় যেসকল গুণাবলি অর্জনের জন্য তিনি তাঁর পুত্রকে উৎসাহিত করেছিলেন তা হল, কৃতজ্ঞতা, কর্মমূখী হওয়া, সত্যবাদিতার ওপর সুদৃঢ় থাকা, সদালাপী হওয়া, ধৈর্যশীল হওয়া, অস্থির না হওয়া ইত্যাদি।

৮. اليتيمة الثانية

এতে উত্তম শাসক ও মন্দ শাসিতের পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা বিধৃত হয়েছে। গ্রন্থটির কিছু অংশ ইতিহাসবেত্তা ও ভূগোলবিদ আবুল ফযল্ আহমাদ বিন আবি তাহির আল-মারুজী বিন তাইফুর (২০৪-২৮০ হি./৮১৯-৮৯৩ খ্রি.) রচিত আল-মানজুম ওয়াল মানসূর গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৪৫৩]

৯. مرثية

এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়স্পর্শী একটি গ্রন্থ। ইয়াহয়া বিন যিয়াদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হারিসীর (মৃ. ১৬০ হি.) উদ্দেশ্যে এটি রচিত হয়। আবূ তাম্মাম (১৮৮-২৩১ হি./৮০৩-৮৪৫ খ্রি.) তাঁর ديوان

৪৫১. ড. শাওকী দায়িফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২
৪৫২. জুরজি যায়দান, *তারিখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫
৪৫৩. কার্ল ব্রকালম্যান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯; জুরজি যায়দান, *তারিখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

الحماسة গ্রন্থে এ শোকগাথাগুলোর স্থান দিয়েছেন।[৪৫৪] উপরিউক্ত মৌলিক গ্রন্থগুলো ছাড়াও তাঁর بعض رسائل إخوانية নামে আরেকটি গ্রন্থ রয়েছে।[৪৫৫]

شعر ابن المقفع (ইবনুল মুকালফার কবিতা)

আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (১০৬-১৪২ হি./৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) একজন মর্যাদাবান ও প্রতিভাবান গদ্য লেখক হিসেবেই পরিচিত। তবে তিনি যখন কোনো বিষয় কবিতাকারে বলতে চাইতেন তখন তা বলে দিতেন, কিন্তু তাঁর কবিতার মান কাব্যিক মানের পর্যায়ে পৌঁছেনি। তাঁকে একবার বলা হলো, কি ব্যাপার আপনি কবিতা বলছেন না কেন? প্রতিউত্তরে কাব্যাকারেই তখন তিনি বললেন-[৪৫৬]

الذي أرضاه لا يجيئني

و الذي يجيئني لا أرضاه

''আমি যা বলতে ভালোবাসি তা তো মনে আসে না।

আর যা আমার কাছে আসে তা তো বলতে ভালোবাসি না।''

আল-জাহিজ (৭৭৬-৮৬৮ খ্রি.) তাঁর 'আল-হাইয়ান ওয়াল বায়ান ওয়াত তাবয়িন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফকে যখন বলা হলো আপনি কেন এক, দুই অথবা তিন পংক্তি রচনা করেননি ? উত্তরে তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই পংক্তির মর্মার্থ পংক্তি রচয়িতায় বুঝে (এজন্য আমি পংক্তি রচনা করিনি।)।"[৪৫৭] তাঁর পংক্তি রচনাার ব্যাপারে ' الوساطة ' গ্রন্থের লেখক আল-মুতানাব্বী (৩০৩-৩৫৪ হি./৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) বলেন, সুফিয়ান বিন মুয়াবিয়া (মৃ. ৭৮০ খ্রি.) যখন তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যাকরার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তিনি তা জানতে পারেন তখন তিনি নিম্নোক্ত কবিতাংশটুকু বলেন[৪৫৮]

ويقتلني فيقتل بي كريما + يموت بموته بشر كثير

"সে আমাকে হত্যা করবে, আর আমার হত্যার দ্বারা সে হত্যা করবে সম্মানিত জনে।

যার মৃত্যুর দ্বারাই মৃত্যু মুখে পতিত হবে বহুজনে।"

---

৪৫৪. ড. শাওকী দায়িফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫১৩

৪৫৫. মুহাম্মাদ সালিম আল-জুন্দী, *আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৪৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৪৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৪৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

আল-জাহিজ (৭৭৬-৮৬৮খ্রি.) তাঁর 'আল-বায়ান ওয়াত তাবয়িন' গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেন, আব্দুল হামিদ আকবার এবং আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (১০৬-১৪২ হি./৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) তাঁরা উভয়েই তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী ও অবর্ণনীয় বাকপটুতা সত্ত্বেও কবিতা লেখায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারেননি। আর এটিই ছিল তাঁর কবিতা এবং কাব্যিক মনোভাবের ব্যাপারে বিজ্ঞজনের মন্তব্য।[৪৫৯]

খ. অনুবাদ সাহিত্যে অবদান

মূলত সাহিতাঙ্গনে তাঁর খ্যাতির ভিত্তি হলো অনুবাদ সাহিত্য। তিনি পাহলভী, গ্রীক ও ফারসী ভাষা থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। নিম্নে তাঁর অনুবাদ সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

অনুবাদকর্মের প্রকৃতি, কৌশল ও বৈশিষ্ট্য

আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা তাঁর রচনায় সহজ-সরল, পূর্ণ অর্থ-জ্ঞাপক, পরিচিত, সুবিন্যস্ত, শ্রুতিমধুর ও সর্বসাধারণের জন্য বোধগম্য চিত্তাকর্ষক ও বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেন: "অপিরিচিত ও দুর্বোধ্য শব্দ এবং বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে, কেননা এটা বড় ভুল।" তিনি বাক্যের শাব্দিক সৌন্দর্যের পরিবর্তে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের দিকেই বেশি দৃষ্টিপাত করেছেন। যেমন তিনি বলেন; "প্রথমে আমার অন্তরে শব্দমালার সৃষ্টি হয়, এরপর আমি আমার লেখনীকে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ দেই।" এ প্রসঙ্গে জামালুদ্দীন আবিল হাসান আলী বিন ইউসুফ আল-কিফাতী (৫৬৮-৬৪৬ হি./১১৭২-১২৪৮ খ্রি.) বলেন, "তিনি ছিলেন দক্ষ ও বিজ্ঞ লেখক; তাঁর শব্দ সঞ্চয়ন ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যসমূহ প্রকাশে তিনি ছিলেন ত্রুটিমুক্ত।"[৪৬০] তাঁর রচনায় স্পষ্টভাবে আরব সংস্কৃতির প্রভাব থাকলেও তিনি খুব কমই আরবী কবিতা, প্রবাদ ও উপদেশবাণী উদ্ধৃতি করতেন। আল-জাহিজ (৭৭৫-৮৬৮ খ্রি.) এবং অন্যদের রচনায় যেমনটি পরিলক্ষিত হয় তাঁর রচনায় তেমনটি দেখা যায় না।[৪৬১] তবে অনুবাদকরণের সময় তিনি ইসলামী সমাজে গ্রহণযোগ্যতা

---

৪৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

৪৬০. *আন্ নাসরুল আব্বাসী*, সাহিত্য পত্রিকা (সউদি আরব: ভাষা অনুষদ; আরবী বিভাগ, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২ খ্রি.), ২য় অধ্যায়, পৃ. ২১ এবং ১৫৮

৪৬১. খলিল মিরদান, *ইবনুল মুকাফ্ফা আয়িম্মাতিল আদাব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯

লাভের উদ্দেশ্যে অনূদিত গ্রন্থসমূহে জরথুস্ত্রীয় মতবাদ ও বিষয়বস্তু পরিহার করে কুরআন মাজিদের আয়াত, হাদীসের উদ্ধৃতি এবং ইসলামী পরিভাষা অন্তর্ভূক্ত করেন।[৪৬২]

পারস্য সংস্কৃতি ছিল তৎকালীন যুগের অন্যতম সামাজিক উপাদান। কাব্যে, সাহিত্যে, বিনোদনে, গল্পে, রূপ-কাহিনীতে, চালচলনে, শাসন ব্যবস্থায়, সংস্কার প্রয়াসে, ধর্মে, নীতিবাক্যে, খলিফার প্রাসাদে, সাধারণ ও অভিজাত সমাজে এক কথায় জীবনের সর্বত্র পারস্য সংস্কৃতির প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য।[৪৬৩] আর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা আরব ও পারস্য সংস্কৃতির সুবিস্তৃত জ্ঞান ছায়ায় প্রতিপালিত হন। পারসিক স্বজাতির প্রতি ছিল যার গভীর মমত্ববোধ এবং পারস্যের সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ইতিহাস পুনরুজ্জীবনে যার প্রয়াস ছিল অবিস্মরণীয়। সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি চিহ্নিত করে যিনি ডাক দিয়েছিলেন পারসিক সমাজ ব্যবস্থার উত্তমকে গ্রহণের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের।[৪৬৪] তাই পারসিকদের সংস্কৃতি মনে অঙ্কন করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। যারফলে তাঁর রচনায় পারস্য সংস্কৃতির প্রভাবও সুস্পষ্ট।[৪৬৫] পারসিক সংস্কৃতির এ সাহসী নেতা এবং কুশলী যোদ্ধা 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে তৎকালীন শাসকবর্গ ও শাসনব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাদের কাহিনী প্রাণীকুলের প্রতীকী ভাষায় চিত্রায়ণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। স্বেচ্ছাচারী শাসকবর্গ যখন মানুষের কণ্ঠরোধ করে প্রতিবাদ ও সমালোচনার সকল পথ বন্ধ করে দেয়, আকার-ইঙ্গিতেও যখন তাদেরকে সদুপদেশ দেওয়া সম্ভব হয়না, তখনই এধরণের কাহিনী রচনার বিশেষ প্রয়োজন হয়। মূলত স্বৈরশাসনের এরূপ দুর্বিসহ অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যই প্রাণীকুলের প্রতীকী ভাষায় এধরণের কাহিনীর জন্ম দেওয়া হয়েছে, যাতে শাসকদের কর্ণকুহরে সদুপদেশ বর্ষণের একটা পথ খোলা থাকে। প্রকারান্তরে তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, পশুকুল যদি জুলুম ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে এমন সোচ্চার এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হতে পারে তাহলে মানুষেরতো আরো বেশি সোচ্চার হওয়া উচিত। কিন্তু ক্ষমতার নেশায় মত্ত শাসকবর্গ যখন (মানুষের মুখে) উপদেশ ও

৪৬২. ইয়াহইয়া আল-খাশ্‌শাব, *কিতাবু তানসার* (কায়রো: মিতবায়াতু মিশর, তা.বি), পৃ. ০৩
৪৬৩. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬
৪৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭-২২৮
৪৬৫. খলিল মিরদান, *ইবনুল মুকাফ্ফা আয়িম্মাতিল আদাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

সমালোচনা শুনতে চায় না তখন ইতর প্রাণীকুলের মুখ থেকেই তাদের শোনানো সমীচীন। স্পষ্ট ভাষণে যখন জীবনের ঝুঁকি তখন ইঙ্গিত ও পরোক্ষ ভাষণই শ্রেয়।[৪৬৬]

অনূদিত গ্রন্থের তালিকা

আব্বাসীয় শাসনামলে জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জোয়ার শুরু হলে আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষ যেসকল পণ্ডিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদকরণে আত্মনিয়োগ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন; আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গ্রীক, পাহলভী ও ফারসী ভাষার দুষ্প্রাপ্য অনেক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. كليلة و دمنة

হিতোপদেশ ও নীতিকথা সমৃদ্ধ 'কালীলা ওয়া দিমনা' অনুবাদ গ্রন্থটি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ভারতীয় দার্শনিক বায়দাবা (বিষ্ণুশর্মা) (জন্ম. ৪র্থ-৬ষ্ঠ খ্রি.পূ.) গ্রন্থটির মূল রচয়িতা। রাজা দাবশালীম ভারত বর্ষের অধিকর্তা হয়ে অত্যাচার বাড়িয়ে দিলে পশু-পাখির কাহিনীর নীতিগল্পের মাধ্যমে তাকে উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষায় এ গ্রন্থটি রচিত হয়।[৪৬৭] সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থটির নাম ছিল 'পঞ্চতন্ত্র' পারস্য সম্রাট নাওসিরওয়ান (মৃ. ৫৭৯ খ্রি.)-এর শাসনামলে দাবা খেলার সঙ্গে এ কাহিনীও ভারতীয় ভাষা থেকে পারসিকরা অনুবাদ করেন।[৪৬৮] অতঃপর তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক বুরযো (Burzoe) এটি সংস্কৃত ভাষা থেকে পাহলভী ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি তিব্বতীয় ভাষা থেকে সুরিয়ানী ভাষা এবং পরবর্তীতে সুরিয়ানী ভাষা থেকে পাহলভী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা গ্রন্থটি পাহলভী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে এর নামকরণ করেন كليلة و دمنة (কালীলা ওয়া দিমনা)।[৪৬৯] ভারতীয় রূপকথার উপদেশমূলক একাদশ শতকের বিখ্যাত এ গল্পগ্রন্থের মুখ্য চরিত্রে রয়েছে 'কারাতাদা' ও 'দামানাকা' নামক দু'টি খেঁকশিয়াল; ঘটনা বর্ণনায় যারা মূখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ।[৪৭০] গ্রন্থটিতে আলোচনা করা হয়েছে শাসকবর্গ কোন পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা

---

৪৬৬. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

৪৬৭. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, ibid, p. 308; আহ্মাদ হাসান আয্-যাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

৪৬৮. Philip K Hitti, ibid, p. 308

৪৬৯. জুরজি যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ* (মিশর: মাতবায়া'তুল হিলাল, তা.বি), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; Philip K Hitti, ibid, p. 308

৪৭০. জুরজি যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ*. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১

করবে, একজন অপরজনের ফাঁদ থেকে কীভাবে বেঁচে থাকবে, মানুষের সাথে কীভাবে জীবন যাপন করবে, আর কীভাবে শাসকবর্গের অধীনে প্রজা সাধারণ প্রফুল্লচিত্তে তাদের আনুগত্য মেনে নিবে।[৪৭১]

كليلة و دمنة গ্রন্থটি অনূদিত নাকি মৌলিক

'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা কর্তৃক আরবীতে অনূদিত, নাকি এটা তাঁর মৌলিক রচনা? এবিষয়েও মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তারিখুল আদাবিল আরাবী গ্রন্থের প্রণেতা উ'মার ফার্‌রুখ এ প্রসঙ্গে তিনটি মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৪৭২]

১. 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটি একটি অনূদিত গ্রন্থ। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (১০৬-১৪২ হি./৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) গ্রন্থটি উপস্থাপনের বিষয়ে একটি অধ্যায়ে তাঁর নিজের লেখা ভূমিকায় ঘোষণা করেছিলেন, বইটি মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সংস্কৃত ভাষা থেকে পারসিকরা অনুবাদ করেন এবং এরপর গ্রন্থটি পাহলভী (পুরাতন ফারসী) ভাষায় অনুবাদ করা হয়। পরবর্তীতে তিনি গ্রন্থটি পাহলভী ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

২. অনেকে মনে করেন প্রাচীন সাহিত্যে এ ধরণের কোনো সাহিত্যকর্ম ছিল বলে জানা যায় না। 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটি ইবনুল-মুকাফ্ফা নিজেই রচনা করে সেটিকে ভারতীয় পৌরনিক কাহিনী বলে চালিয়ে দিয়েছেন। মূলত প্রাচীন সাহিত্য, রাজা দাবশালীম, দার্শনিক বাইদাবা বা ভারতীয় রাজা বলতে কোনো কিছু বা কারের অস্তিত্ব ছিল না। উক্ত গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতি, মহৎ ভবিষ্যদ্বাণী এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত এ ইঙ্গিত বহণ করে যে, নিঃসন্দেহে এটি ইসলামী আইনশাস্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি ইসলামী পরিবেশে রচিত হয়েছিল।

৩. তবে কিছু কিছু গবেষক প্রমাণ করেছেন যে, 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থে যে গল্পগুলো রয়েছে তা গ্রীক, পারস্য, ভারতীয় এবং জাপানিদের কৃষ্টির সাথে সুনির্দিষ্ট বা বেশ মিল রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (১০৬-১৪২ হি./৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) আরব পরিবেশের সাথে মানানসই করে ফারসী এবং ভারতীয় সাহিত্যের উৎস নিয়ে গল্পগুলোর কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন।

---

৪৭১. ওমার ফাররুখ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী, আল-আ'সরুল আব্বাসীয়্যাহ* (কায়রো: দারুল ইল্‌ম লিল মালায়িন, ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৩

৪৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

ইবনে নাদীম (মৃ. ৯৯৫/৯৯৮ খ্রি.) বলেন, সময় ও পরিবেশের চাহিদা অনুযায়ী ইবনুল-মুকাফ্ফা মূল পাহলভী থেকে বহু বাক্য ছাঁটাই করে নতুন বাক্য সংযোজন করেছেন। এমনকি তিনি কিছু অনুচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদ সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। সম্ভবত এ কারণেই ইবনে খাল্লিকান (১২১১-১২৮২ খ্রি.) বলেছেন, কারো কারো মতে গ্রন্থটি অনূদিত নয়; বরং এটি ইবনুল মুকাফ্ফার মৌলিক রচনা।[৪৭৩]

'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটিকে যারা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফার অনূদিত গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত না করে মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেন তাদের বক্তব্যের জবাবে আহমদ হাসান আয-যায়্যাত (১৮৮৫-১৯৬৮ খ্রি.) বলেন:[৪৭৪]

ومن الناس من يميل به الظن إلى أنه من وضع عبد الله بن المقفع ، وما نسبه إلى علماء الهند إلا أملا في رواجه وانتشاره ؛ ولكنه في اعتقادنا ظن بعيد الاحتمال لأن حظ النقل والاحتذاء فى كل ما كتب ابن المقفع من حظ الإنشاء والابتكار. وقد نظمه كثير من شعراء العرب كأبان اللاحقي وابن الهبارية ' وعاوضه سهل بن هارون بكتاب سماه (ثعلبة وعفرة).

অর্থাৎ "কিছু লোক ধারণা পোষণ করেন যে, এটি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফার বানোয়াট রচনা। তারা ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে এ প্রত্যাশায় দাবি উপাস্থাপন করেন যে, তাদের এ দাবিটি জনপ্রিয় হবে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এটি একটি অসম্ভাব্য ধারণা। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফার অনুবাদ তাঁর মৌলিক রচনার চেয়ে অধিক শক্তিধর। কেননা অনেক আরব কবি যেমন- আবান আল-লাহিকী (৭৫০-৮১৫ খ্রি.)[৪৭৫] এবং ইবনে হাবারিয়াহ (মৃ. ৫০৪ হি.)[৪৭৬] চমৎকার প্রাঞ্জল

---

৪৭৩. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯ ।

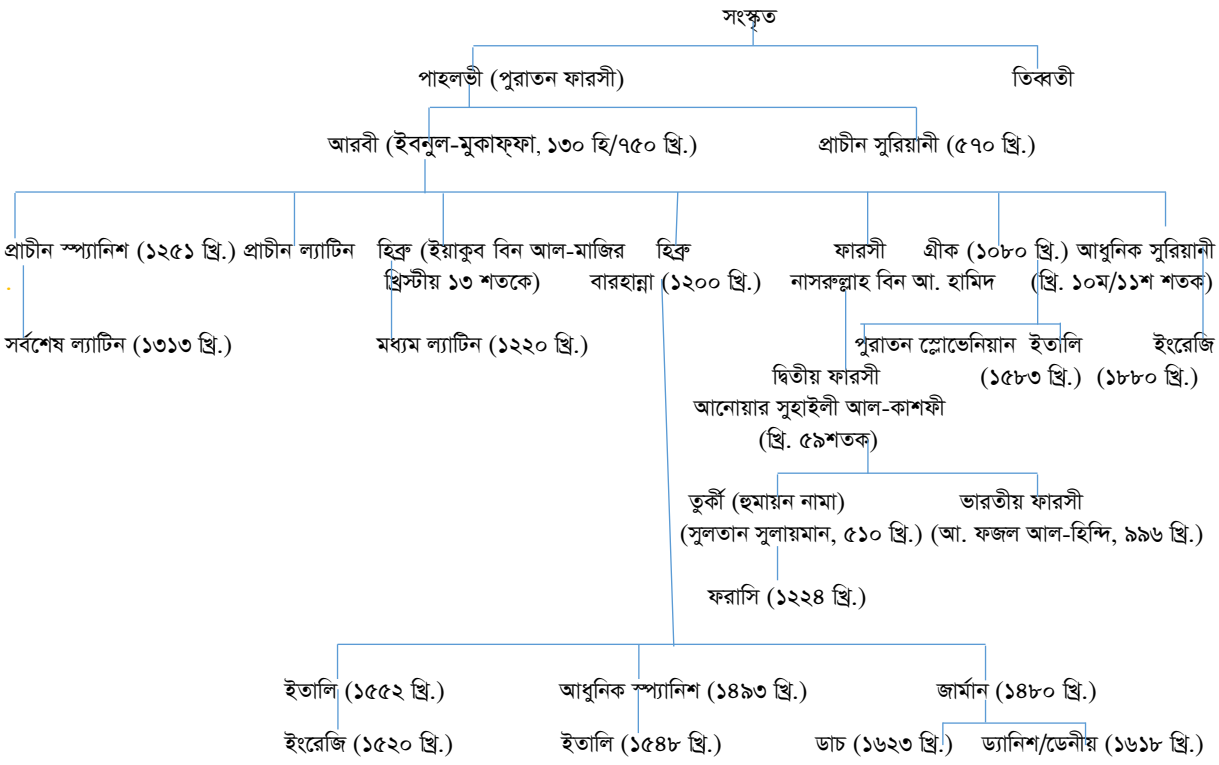
৪৭৪. আহ্মাদ হাসান আয্-যাইয়াত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (কায়রো: দারুন নাহ্দা, তা.বি.) পৃ. ৩৯৭

৪৭৫. হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্যতম কবি হলেন আবান বিন আব্দুল হামিদ বিন লাহিক বিন আফির আর-রাকাশী আল-লাহিকী (أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي اللاحقي)। তিনি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের বসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি বিভিন্ন লেখক ও কবিদের সহযোগিতায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো সাজানোর ব্যাপারে মনযোগী ছিলেন। যেমন রাজা আরদাশির জীবনী, সিন্দাবাদ, কিতাবু মাযদাকসহ অন্যান্য অনেক জীবনীমূলক গ্রন্থ সংকলন করেন। খালিদ বিন ইয়াহিয়া আাল-মারমাকী 'কালিলা ও দিমনা' গ্রন্থটি পূনঃঅনুবাদ করার কথা বলেন। আবান আল-লাহিকী কবি আবু নাওয়াসকে (৭৬২-৮১৩ খ্রি.) সাথে নিয়ে গ্রন্থটি অনুবাদ করার কথা থাকলেও গোপনে আবু নাওয়াসকে (৭৬২-৮১৩ খ্রি.) বাদ দিয়ে চার মাসে পাঁচ হাজার শ্লোক রচনা করেন। অবশেষে তিনি যখন 'কালিলা ও দিমনা' গ্রন্থটি প্রায় চৌদ্দ হাজার শ্লোকে কাব্যানুবাদ করে ইয়াহিয়া বিন খালিদ সারিহীর নিকট নিয়ে আসলে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে এক লাখ দিরহাম পুরস্কার প্রদান করেন। এতে আবু নাওয়াস অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং বন্ধু আবান আল-লাহিকীর সাথে তার মনোমালিন্য হয়। দ্র. মুহাম্মাদ হাসান আয়াতুল্লাহ, *তারজামাতু আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২

৪৭৬. 'কালিলা ওয়া দিমনা'-এর রচনাশৈলী অনুসরণে একহাজার শ্লোকে ইবনে হাবারিয়াহ (মৃ. ৫০৪ হি.) الصادح والباغم (সৎ ও বোবা) নামে একটি গল্পগ্রন্থ সংস্করণ করেন। দ্র. আহ্মাদ হাসান আয্-যাইয়াত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (কায়রো: দারুন নাহ্দা, তা.বি) পৃ. ৩৯৭-৩৯৮

ভাষায় গ্রন্থটির কাব্য সংস্করণ করেছেন, সাহাল বিন হারুন (মৃ. ৮৩০ খ্রি.) উক্ত গ্রন্থের স্থলাভিষিক্ত ثعلة وعفرة বা 'খেঁকশিয়াল ও কেশরী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।" তাছাড়াও 'কালিলা ওয়া দিমনা'-এর রচনাশৈলী অনুসরণে একহাজার শ্লোকে ইবনে হাবারিয়াহ (মৃ. ৫০৪ হি.) الصادح والباغم (সৎ ও বোবা) নামে একটি গ্রন্থ সংস্করণ করেছেন।[৪৭৭]

'কালিলা ওয়া দিমনা'-গ্রন্থের অনুবাদ চিত্র[৪৭৮]



'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটি এতই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল যে, ফারসী অনুবাদটি মূল সংস্কৃতের মতো হারিয়ে গেলেও আরবী সংস্করণ থেকেই হিব্রু, তুর্কী, ইথিওপিয়ান, মালয় ও ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষাসহ বিশ্বের ৪০টিরও অধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে।[৪৭৯] আরবী ভাষায় অনূদিত অনন্য বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষণীয় 'কালিলা ও দিমনা' গল্পগ্রন্থটি অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। বাংলা ভাষায় যারা

---

৪৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮

৪৭৮. ড. আব্দুল ওহাব আযযাম (সম্পা.), *কালিলা ওয়া দিমনা* লি আব্দিল্লাহিবনুল মুকাফ্ফা (বৈরুত: দারুল শুরুক/আলজেরিয়া: আশ-শারকাতুল ওতানিয়্যাহ ১৪০১ হি./১৯৮১ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৫; হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১

৪৭৯. Philip K Hitti, ibid, p. 308

অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কাজী মুহাম্মদ হানিফ, যিনি 'কালিলা ও দিমনা বা বুদ্ধির গল্প' শিরোনামে আল-এছহাক প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এছাড়াও মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক গ্রন্থটি 'কালিলা ও দিমনার বুদ্ধির গল্প' শিরোনামে গ্রন্থটি অনুবাদ করেন; যেটি মাকতাবাতুল হেরা, ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটি অনুবাদের উদ্দেশ্য

সমাজসংস্কারক ও বিরল প্রতিভার প্রতীক আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা কালজয়ী এ গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করার চারটি মহৎ উদ্দেশ্য গ্রন্থটির ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, পাঠকদের মনে রাখতে হবে যে, চারটি উদ্দেশ্য গ্রন্থটি অনুবাদের পেছনে কাজ করেছে। সেগুলো হলো-[৪৮০]

১. উঠতি বয়সের আনন্দ-প্রেমী যুবসমাজ সাগ্রহে গ্রন্থটি যেন হাতে নেয় সেজন্য প্রাণিকুলের প্রতীকী ভাষায় কাহিনী রূপায়ণ করা হয়েছে।

২. রাজপুরুষদের বিনোদনমুখী মনের আকর্ষণ ধরে রাখার জন্য তাতে পশু-পাখীর চিন্তা ও অনুভূতিকে শব্দের গাঁথুনী দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৩. একটি কালোত্তীর্ণ সাহিত্যিক কীর্তিরূপে গ্রন্থটিকে তুলেধরা, যাতে করে জ্ঞানপিপাসু শিল্পী-সাহিত্যিকরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

৪. চতুর্থ ও প্রধানতম উদ্দেশ্যটি হলো শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পর্কিত।

'কালিলা ওয়া দিমনা'-এর অধ্যায়সমূহ

কালজয়ী গ্রন্থটিতে মোট কতটি অধ্যায় ছিল এবিষয়ে বিভিন্ন মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন; মুহাম্মাদ সালিম আল-জুন্দির (১৮৮১-১৯৫৫ খ্রি.) মতে ১৫টি, ইতিহাসবেত্তা ইবনে নাদিমের (মৃ. ৩৮৪ হি/৯৯৪ খ্রি.) মতে ১৭টি অধ্যায় ছিল। আবার কারো কারো মতে গ্রন্থটিতে ভূমিকাসহ মোট ১৮টি অধ্যায় ছিল।[৪৮১] তবে অধিকাংশের মতে হিন্দি ভাষায় যখন গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল তখন এতে ১২টি অধ্যায় ছিল।[৪৮২] কালক্রমে এতে ফারসী ৩টি অধ্যায় এবং অজ্ঞাত ভাষার আরো ৬টি অধ্যায় যুক্ত হয়ে মূলগ্রন্থ

৪৮০. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯
৪৮১. মুহাম্মাদ সালিম আল-জুন্দী, *আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৪৮২. খলিল মিরদান, *ইবনুল মুকাফ্ফা আয়িম্মাতিল আদাব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩

মোট ২১টি অধ্যায়ে রূপ পরিগ্রহ করে যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফার একটি নাতিদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[৪৮৩] মূল হিন্দি ভাষায় নিম্নোল্লিখিত ১২টি অধ্যায় ছিল;

১. باب الأسد والثور (সিংহ ও ষাঁড় অধ্যায়)

২. باب الحمامة المطوقة (শৃঙ্খলিত কবুতর অধ্যায়)

৩. باب البوم والغربان (পেঁচা ও কাক অধ্যায়)

৪. باب القرد والغيلم (বানর ও ব্যাঙ অধ্যায়)

৫. باب الناسك وابن عرس (সাধক ও বেজি অধ্যায়)

৬. باب الجرذ والسنور (ইঁদুর ও বিড়াল অধ্যায়)

৭. باب الملك والطائر فنزة (রাজা ও ময়না অধ্যায়)

৮. باب الأسد وابن آوى (সিংহ ও শৃগাল অধ্যায়)

৯. باب اللبؤة والأسوار والشغبر (সিংহী, বাজুবন্ধ ও শৃগাল অধ্যায়)

১০. باب إيلاذ وبلاذ وإيراخت (রাজা, রানি ও মন্ত্রী অধ্যায়)

১১. باب السائح والصائغ (পর্যটক ও জহুরী অধ্যায়) ও

১২. باب ابن الملك وأصحابه (যুবরাজ ও তাঁর সহযাত্রী অধ্যায়)

ফারসী ভাষায় অতিরিক্ত যে ৩টি অধ্যায় ছিল সেগুলো হলো-

১৩. باب مقدمة برزوية (বারযুবেহ-এর আগমন অধ্যায়)

১৪. باب بعثة برزوية (বারযুবেহকে প্রেরণ অধ্যায়)

১৫. باب ملك الجرذان (ইঁদুরের রাজা অধ্যায়)।

অতিরিক্ত বাকি ৬টি অধ্যায় আরবী অনুবাদের পূর্বে জানা ছিল না। অতিরিক্ত অধ্যায়গুলো হলো-

১৬. مقدمة الكتاب ترجمة بهنود بن سحوان (বেহনুদ বিন সাহওয়ান কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকা)

১৭. باب عرض الكتاب لابن المقفع (ইবনুল মুকাফ্ফা কর্তৃক উপস্থাপিত গ্রন্থের ভূমিকা)

১৮. باب الفحص عن أمردمنة (দিমনার বিষয় অনুসন্ধান অধ্যায়)

---

৪৮৩. ড. শাওকি দায়িফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১২; জুরজি যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ* প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২

১৯. باب الناسك والضيف (সন্ন্যাসী ও অতিথি অধ্যায়)

২০. باب مالك الحزين والبطة (বক ও হাঁস অধ্যায়)

২১. باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين (কপোত, শৃগাল ও বক অধ্যায়)।[৪৮৪]

‘ كليلة و دمنة ’ গ্রন্থের রচনাশৈলী

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ‘কালিলা ওয়া দিমনা’ গ্রন্থ অনুবাদের সময় اللفظة المفردة বা একক অর্থজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন- باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين অধ্যায়ে ‘...لطول النخلة وسحقها’ বাক্যে طول ও سحق শব্দদ্বয়কে المترادف (সমার্থক) বা التكرار (পুনরাবৃত্তি) বলা যায়। কেননা سحق শব্দটি এখানে طول বা দূরত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; যা বাক্যের অর্থকে জোরালো করেছে। অনুরূপভাবে বাক্যে অলংকারিত্ব সৃষ্টির জন্য ‘... فتعهد ذلك منها ’ বাক্যে تعهد শব্দটি عهد ক্রিয়াপদের স্থলে ব্যবহার করেছেন। যেহেতু تفعل এর ওজনে تعهد শব্দটির অর্থকে একত্রি ও সীমাবদ্ধ করে তাই এখানে একাধিক অর্থজ্ঞাপনের অবকাশ নেই। تعهد শব্দে ‘ت’ বর্ণটি শৃগালের অন্তরস্থিত ভাব ব্যক্ত করছে, যা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়াও تعهد শব্দটি اعتاد শব্দের চেয়ে উত্তম। কেননা تعهد শব্দটি المثابرة (জিদ), الاختبار (পরীক্ষা), تجربة الأمر (বিষয়ের অভিজ্ঞতা) ও الضلو (পার্শ্ব) অর্থজ্ঞাপক, এগুলো তাঁর সংক্ষিপ্ত অলংকারপূর্ণ বক্তব্যের রচনাশৈলীর নিদর্শন।[৪৮৫] আলোচ্য গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি বিশুদ্ধ শব্দ চয়নে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে যে ধরণের শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন সেখানে তিনি সেই উপযুক্ত শব্দ (اللفظة الفصيحة) ব্যবহার করেছেন। যেমন- فإذا انقاض ، ثم حضنت البيض এখানে حضن ও انقاض শব্দদ্বয় যে অর্থ প্রকাশের জন্য সৃষ্ট হয়েছে ঠিক তা সে অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে তিনি اللفظة المنطوية (প্যাঁচালো শব্দ) প্রয়োগ করেছেন। যেমন باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين অধ্যায়ে البلوغ (পৌঁছানো) ও النمو (বৃদ্ধি পাওয়া) উভয় অর্থ প্রকাশ করে, তাছাড়া শব্দটি نهض এখানে ريثما تنهض فراخه ও السمو ও الارتفاع অর্থেরও দাবি রাখে। আবার কখনো তিনি

৪৮৪. মুহাম্মাদ সালিম আল-জুন্দী, *আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২

৪৮৫. ইলিয়া আল-হাভি, *ফিন-নাক্বদী ওয়াল আদাবী* (বৈরুত: দারুল কুত্তাব আল-লুবাতানী, ১৯৮৬ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩০৮-৩০৯

নির্দ্বিধচিত্তে অসাধারণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন-...يرقي إليها توعدها أن يرقي এ বাক্যে يرقي শব্দটি يصعد শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি কখনো কখনো সরাসরি কোনো শব্দ ব্যবহার না করে সংক্ষিপ্তাকারে ইঙ্গিতবাচক শব্দ ব্যবহার করতেন। যেমন...إن ثعلب دهيت به এ বাক্যটিতে دهيت ক্রিয়াপদটি বাক্যকে সংক্ষিপ্তকরণের পাশাপাশি গভীর অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে।[৪৮৬]

‘ كليلة و دمنة ’ গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যায়ন

ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা কর্তৃক আরবী ভাষায় অনূদিত ‘কালিলা ওয়া দিমনা’ নামক মূল্যবান এ গ্রন্থটি সাহিত্যিক মানের কারণে আব্বাসীয় যুগ থেকে জ্ঞানপিপাসুদের মাঝে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। অতীব তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণে গদ্যানুবাদের পাশাপাশি অনেক বিখ্যাত কবি গ্রন্থটির কাব্যানুবাদও করেন। শিক্ষামূলক এ অনুবাদ গ্রন্থটিকে সাহিত্যিকগণ বিভিন্নভাবে মূল্যায়িত করেছেন। যেমন হান্না আল-ফাখুরী (১৯১৪-২০১১ খ্রি.) বলেন,“বেশ কয়েকজন কবি গ্রন্থটির কাব্যানুবাদ করেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবান আল-লাহিকী (৭৫০-৮১৫ খ্রি.); যিনি প্রাঞ্জল ভাষায় প্রায় ১৪ হাজার শ্লোকে এটির কাব্যানুবাদ করে ইয়াহিয়া বিন খালিদ আল-বারমাকীর (মৃ. ১৯০ হি.) কাছে উপস্থাপন করেন। এ অনুবাদটির কেবল ৮০টি শ্লোক আল-বারমাকীর (মৃ. ১৯০ হি.) الأوراق গ্রন্থের الاسد والثور অধ্যায়ে পাওয়া যায়; অবশিষ্ট শ্লোকগুলোর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।[৪৮৭]

গ্রন্থটির সাহিত্যিকমান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা পি.কে হিট্টি (১৮৮৬-১৯৭৮ খ্রি.) বলেন,[৪৮৮] “Ibn-al-Muqaffa’s translation was in itself a stylistic work of art, and ever since the Abbasid age Arabic prose has borne the impress of Persian style in its extravagant elegance, colourful imagery and flowery expression.”

৪৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০
৪৮৭. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, পাগুক্ত, ৪৫০
৪৮৮. Philip K Hitti, *History of the Arabs,* ibid, p. 308

অর্থাৎ "ইবনুল মুকাফ্ফার এ অনুবাদটি ছিল বেশ সুচারু এক সাহিত্যকর্ম। এর পূর্বে আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে আরবী গদ্য সাহিত্য পারসিক সাহিত্যের যথাযথ সুরভিত, রঙিন রূপকল্প এবং সাবলীল বিবরণের স্বাদ পায়নি।"

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটির সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

২. رسالة تنسر

এটি প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এর মাধ্যমে সেসময়ের প্রশাসনিক, ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাবারিস্থানের তৎকালীন রাজা জাশানসেফ শাহ (جشنسف شاه) যখন দেখেন যে, সাসানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা আরদাশিরের (২১২-২৪১ খি.) শাসন মেনে নেওয়ার বিকল্প নেয়, তখন তিনি পারস্যের পুরোহিত তানসারকে[৪৮৯] উক্ত রাজার কিছু কাজ ও নীতির সমালোচনা করে পারস্যের পুরোহিত তানসারকে পত্র লিখেন। পুরোহিত তানসার প্রাঞ্জল ভাষায় উত্তর লিখে রাজা জাশানসেফ শাহকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাই মূলত رسالة تنسر (তানসারের চিঠি) নামে পরিচিত।[৪৯০] গ্রন্থটির লেখক তানসার; যিনি সাসানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাজা আরদাশির শাসনামলের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। অবশ্য কারো কারো মতে তিনি বরং নাওসিরওয়ানের (মৃ. ৫৭৯ খ্রি.) সময়ের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। রাজা আরদাশির তানসারকে 'هربدان هربدط' (পুরোহিত প্রধান) নিয়োগ করে অগ্নি উপাসানালয়ের প্রধান, পাণ্ডলিপি সংগ্রহকারী এবং ইরানের জরথুস্ত্রীয় লেখকদের লেখা সংগ্রহ করে তা পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব দেন। তানসার যখন উক্ত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন তখন রাজা আরদাশির তাকে 'يوريوتكيش' 'ইওরিওতেকিশ' (حافظ دين الأقدمين বা পূর্ববর্তীদের ধর্মের রক্ষক) উপাধিতে ভূষিত করেন।[৪৯১] পাহলভী ভাষা থেকে ইবনুল-মুকাফ্ফা হিজরী দ্বিতীয় শতকে رسالة تنسر নামক গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদকরণের সময় তিনি 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থের ন্যায় কিছু নতুন বিষয়

---

৪৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা তার ভূমিকায় উদ্ধৃত করে বলেছেন: তার নামকরণ করা হয়েছিল তানসার, কারণ তার শরীরে প্রচুর পরিমাণে চুল গজিয়েছিল। এমনকি সমস্ত শরীরে তার মাথার ন্যায় চুল ছিল। দ্র. ইয়াহইয়া আল-খাশ্‌শাব, *কিতাবু তানসার* (কায়রো: মিতবায়াতু মিশর, তা.বি), পৃ. ০৪

৪৯০. মুহাম্মাদ হাসান আয়াতুল্লাহ, *তারজামাতু আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

৪৯১. ইয়াহইয়া আল-খাশ্‌শাব, ইয়াহইয়া আল-খাশ্‌শাব, *কিতাবু তানসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪

সংযোজন-বিয়োজন করেন। ইসলামী সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে জরথুস্ত্রীয় বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে পবিত্র কুরআন মাজিদের আয়াত, হাদীসের উদ্ধৃতি এবং প্রবাদবাক্যও এতে অন্তর্ভূক্ত করেন। হিজরী ষষ্ঠ শতকে আদ-দ্বীন মুহাম্মাদ বিন ইসফান্দিয়ার (মৃ. ১২২০ খ্রি.) তাবারিস্তানের ইতিহাস লেখার সময় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের ওপর দৃষ্টিপাতকালে আরবী ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটি দেখতে পান, যা তাঁর কাছে জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্ঞানের শৈলী মনে হয়।[৪৯২] তিনি উক্ত অনুবাদটির সারসংক্ষেপ فی تاریخ طبرستان (তাবারিস্তানের ইতিহাস) নামে আধুনিক ফারসী ভাষায় ৬০৬-৬১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনুবাদ করেন। অনুবাদকরণের সময় তিনি যতটা সম্ভব আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফাকে অনুসরণ করে আরবী শব্দ সংরক্ষণ করেন এবং উক্ত গ্রন্থে কুরআন মাজিদের যেসমস্ত আয়াত, হাদীসের উদ্ধৃতি এবং প্রবাদবাক্যগুলো অন্তর্ভূক্ত ছিল ফারসী অনুবাদেও সেগুলো বহাল রাখেন।[৪৯৩] অতীব তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে প্রাচ্যবিদ দারমুস্তাতার (১৮৪৯-১৮৯৪ খ্রি.) গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ ফরাসী ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন এবং মুজতাবা মিনাউই (১৯০৩-১৯৭৭ খ্রি.) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সংকলনটি পুনঃপ্রকাশ করেন।[৪৯৪]

আলোচ্য গ্রন্থটির মূলঅংশ আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা অনুবাদ করেছেন, না এটি তাঁর নিজস্ব রচনা এ বিষয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করলেও মূলপাঠটি প্রকৃতপক্ষে তানসারের নিজস্ব রচনা। এটি আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফার নিজস্ব রচনা নয় এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বরং গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। কারণ গ্রন্থটির মৌলিকত্ব পাহলভী ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রাচীন ঐতিহ্যকে জানতে ও সংরক্ষণ করতে ভালোবাসতেন এবং এর থেকে বিভিন্ন বিষয় উদ্ধার করে সেগুলোর সাথে মুসলমানদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। একই ইচ্ছা যা তাকে 'খুদাইনামা', 'কালিলা ওয়া দিমনা' এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রাচীন নিদর্শনসমূহ অনুবাদ করতে প্ররোচিত করেছিল। আর এ ভালোবাসা ও ইচ্ছা থেকেই তিনি গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।[৪৯৫]

---

৪৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ০৩

৪৯৩. মুহাম্মাদ হাসান আয়াতুল্লাহ, *তারজামাতু আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪; ইয়াহইয়া আল-খাশ্‌শাব, *কিতাবু তানসার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৩

৪৯৪. ইয়াহইয়া আল-খাশ্‌শাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪

৪৯৫. মুহাম্মাদ হাসান আয়াতুল্লাহ, *তারজামাতু আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

رسالة تنسر গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়

এটি প্রধান পুরোহিত তানসার এবং তাবারিস্তানের রাজা জাশানসেফ শাহ-এর মধ্যে পত্রালাপের মাধ্যমে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিকতা বিষয়ে লিখিত একটি গ্রন্থ। লেখক তানসার এ গ্রন্থে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেগুলো ইরানের প্রাচীনতম রীতি-নীতি হিসেবে বিবেচিত ছিল। রাজা জাশানসেফ শাহ সাসানিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ছিলেন এবং রাজা আরদাশিরের (২১২-২৪১ খ্রি.) কাছে নতি স্বীকারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি তাঁর শাসনের অধিনে ইরানকে একীভূত করার জন্য এবং 'তাইফা রাজতন্ত্র'[৪৯৬] ব্যবস্থাকে নির্মূল করার জন্য কাজ করছিলেন। রাজা জাশানসেফ শাহ পত্র মাধ্যমে তানসারের কাছ থেকে পারস্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় জানতে চেয়েছিলেন। প্রশ্নগুলোর মধ্যে কিছু আপত্তিজনক প্রশ্ন থাকলেও পুরোহিত তানসার সেগুলোর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠান। অনূদিত গ্রন্থটিতে মুখবন্ধসহ মোট ১৯টি বিষয় স্থান পেয়েছে।[৪৯৭]

প্রথম অধ্যায়

১. ديباجة ابن المقفع (ইবনুল মুকাফার মুখবন্ধ)

২. رسالة الاسكندر إلى أرسطو (অ্যারিস্টটলের প্রতি আলেকজান্ডারের চিঠি)

৩. رسالة أرسطو إلى الاسكندر (আলেকজান্ডারের প্রতি অ্যারিস্টটলের চিঠি)

দ্বিতীয় অধ্যায়-বইয়ের মূলপাঠ

১. مطالبة الملك بحق الأولين (রাজার আহবান ও প্রথম দু'টি অধিকার)

২. نظام الطبقات (বর্ণপ্রথা)

৩. العقوبات (দণ্ডবিধি)

---

৪৯৬. 'তাইফা রাজ্যতন্ত্র' দ্বারা মুসলিম শাসিত স্পেনের ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যসমূহকে বোঝানো হয়। ১০৩১ সালে কর্ডোভার উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর এসব রাজ্যের উদ্ভব হয়। ১১শ শতাব্দীতে প্রথম ক্রুসেড শুরু হওয়ার পর জেরুজালেম অঞ্চল খ্রিষ্টানদের হস্তগত হয়। এসময় ইবেরিয়ান উপদ্বীপের উত্তরের খ্রিষ্টানরা মুসলিম অঞ্চল দখল শুরু করে। কর্ডোভা ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে ইউরোপের সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হলেও সেখানেও গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। ফলে খিলাফাত ভেঙ্গে গিয়ে 'তাইফা' নামক শত্রুভাবাপন্ন বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হয়। তবে এ রাজনৈতিক বিভক্তির ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেনি বরং বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড এসব রাজ্যগুলোতে চালু ছিল। দ্র. John Tolan and others, *Europe and the Islamic World* (USA: Princiton University Press, 2013), p. 39-40

৪৯৭. ইয়াহইয়া আল-খাশ্‌শাব, *কিতাবু তানসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৪. الجرائم (অপরাধ)

৫. نظام البيوتات (অধিবাসী ব্যবস্থাপনা)

৬. نظام الأبدال (প্রতিস্থাপননীতি)

৭. بيوت النار (অগ্নি উপাসনালয়)

৮. تعذيب السحر وقطاع الطرق وأصحاب البدعة (ডাইনি, দস্যু এবং বিধর্মীদের নির্যাতন)

৯. منع الناس من البذخ والإسراف (মানুষকে বিলাসিতা ও অপচয় থেকে বিরতকরণ)

১০. الجواسيس (গুপ্তচর)

১১. استيلاء الملك على مال الأغنياء والتجار (রাজা কর্তৃক ধনী ও বণিকদের অর্থ-সম্পদ জবরদখল)

১২. تعيين ولى العهد وفيه قصة القرد منقولة عن بينج تنترا (যুবরাজ নিয়োগ এবং পঞ্চতন্ত্র থেকে বর্ণিত বানরের গল্প প্রেরণ)

১৩. مجالس الملك ومعاركه وصلحه وحربه (রাজপরিষদ, যুদ্ধক্ষেত্র, শান্তি ও যুদ্ধ)

১৪. أحوال ملك طبرستان (তাবারিস্তানের রাজার রাজত্বকাল)

১৫. قرابة ملك طبرستان بأردشير (রাজা আরদাশিরের সাথে তাবারিস্তনের রাজার ঘনিষ্ঠতা)

১৬. حكاية الملك جهنل (রাজা জাহ্নেলের কাহিনী)

৩. سير ملوك العجم

এটি ফারসী ভাষায় রচিত خداى نامه (খোদায়নামা) গ্রন্থের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটির অন্যতম উৎস হলো হাকিম আবুল কাসিম ফেরদৌসী তুসী (৯৪০/৪১-১০২০ খ্রি.) কর্তৃক রচিত شاه نامه (রাজা-বাদশাহদের কাহিনী সম্পর্কৃত মহাকাব্য) গ্রন্থটি।[৪৯৮] ইতিহাসবেত্তা অধ্যাপক রেনল্ড অ্যালেইন নিকোলসন (১৮৬৮-১৯৪৫ খ্রি.)-এর মতে গ্রন্থটি আরবদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত বহন করে।[৪৯৯]

৪৯৮. ড. শাওকি দায়িফ, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১

৪৯৯. খলিল মিরদান, *ইবনুল মুকাফ্ফা আয়িম্মাতিল আদাব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫

৪. كتاب المزدك

সাসানী[৫০০] শাসনামলে সমাজতন্ত্রের সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 'মাযদাক' (মৃ. ৫২৪/৫২৮ খ্রি.)[৫০১]-এর জীবনী আলোচনা করা হয়েছে; যা প্রথম কুবায-এর শাসনামলের সাথে সম্পর্কিত ছিল। গ্রন্থটিতে 'মাযদাক'-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরের আলোচনা স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে নিযামুল মূলক (১০১৮-১০৯২ খ্রি.) তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এসব বিষয়ের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।[৫০২]

৫. كتاب الصغرسان

এ গ্রন্থে তুর্কী ও ইরানীদের প্রাচীন যুদ্ধ-বিগ্রহ, سياوس (সিয়াওস)-এর মৃত্যু ও রুস্তমের কাহিনী ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়াও خداى نامه (খোদাইনামা) গ্রন্থে পাওয়া যায় না এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীও এ গ্রন্থে উল্লেখ আছে বলে এটি ইরানীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল।[৫০৩]

৬. آئين نامه

এ গ্রন্থটি كتاب الرسوم (প্রচলিত রীতি-নীতির গ্রন্থ) নামেও অভিহিত। গ্রন্থটিতে সাসানীদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। পাহলভী ভাষায় রচিত গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করে آئين نامه (আইন নামা) নামে নামকরণ করা

---

৫০০. ইসলাম আগমনের পূর্বে ইরানের সর্বশেষ সাম্রাজ্য ছিল 'সাসানীয় সাম্রাজ্য'। খ্রিস্টপূর্ব ৬৫১-২২৪ পর্যন্ত প্রায় ৪২৭ বছর ধরে এটি পশ্চিম ইউরোপের দু'টি শক্তিধর সাম্রাজ্যের একটি ছিল। এ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এলাকার মধ্যে ছিল বর্তমান ইরান, ইরাক, আর্মেনিয়া, দক্ষিণ ককেশাস, দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্য এশিয়া, পশ্চিম আফগানিস্তান, তুরস্ক ও সিরিয়ার অংশবিশেষ, পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং আরব উপদ্বীপের কিছু উপকূলীয় এলাকা। সাসানিয়ানরা তাদের সাম্রাজ্যকে 'ইরানশাহর' বা 'ইরানীয় সাম্রাজ্য' বলে ডাকত। দ্র. *The Encyclopaedia of Islam (*Netherlands: Koninklijke Brill, Leiden, 1997), New Edition, V. 10th, P. 70

৫০১. মাজদাক (মৃ. ৫২৪/৫২৮ খ্রি.) ছিলেন ইরানের সাসানীয় সাম্রাজ্যের ফিরোজের পুত্র কুবাদের রাজত্বকালে (৪৮৮-৪৯৬, ৪৯৮/৯-৫৩১ খ্রি.) ধর্মীয় আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা, একজন জরথুস্ত্রীয় পুরোহিত ও ধর্মসংস্কারক। সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি 'মাজদাকিজম' নামে একটি ধর্মীয় ও দার্শনিক আন্দোলন শুরু করেন এবং তা পারস্যের সর্বত্রে ছড়িয়ে পড়ে। তার সম্প্রদায়ের অনুসারীদের সেসময় বলা হতো darist-denan/ those of the right religion বা সঠিক ধর্মের লোক। দ্র. The Encyclopepeadia of Islam (Netherlands: Brill Leiden: E.J.Brill, 1991), New Edition, Vol. 06, p. 949

৫০২. কার্ল ব্রুকালম্যান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, ৩য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ৯৭-৯৮; *The Encyclopepeadia of Islam*, ibid,Vol. 06, p. 949

৫০৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৩

হয়।[৫০৪] ইতিহাসবেত্তা আল-মাসউদীর (২৮৩-৩৪৬ হি./৮৯৬-৯৫৭ খ্রি.) মতে গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল কয়েক হাজার।[৫০৫]

৭. كتاب البيكر

কিয়ানী বংশ ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সুশিক্ষিত এবং তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ছিল সমৃদ্ধশালী। গ্রন্থটিতে কিয়ানী বংশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[৫০৬]

৯. كتاب التاج في سيرة نوشروان

পাহলভী ভাষায় রচিত বাদশাহ নাওসিরওয়ান (মৃ. ৫৭৯ খ্রি.)[৫০৭]-এর জীবনচরিতমূলক গ্রন্থের আরবী অনুবাদ।[৫০৮]

৯. الرسالة القلمية

ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত শিষ্টাচার, উপদেশ ও নৈতিকতা বিষয়ক একটি পুস্তিকা। আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা তাঁর ছেলেকে শিষ্টাচারিতা ও শৃঙ্খলাবোধ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এটি অনুবাদ করেন। অনুবাদের সময় তিনি কিছু আরবী এবং ফারসী কবিতা ও প্রবাদবাক্য অন্তর্ভূক্ত করেছেন, যেগুলো তাঁর অনুবাদকে অলঙ্কৃত করেছে। পরবর্তীতে এটি আরবী ভাষা থেকে ফারসী ভাষায় পুন:অনুবাদ করেন নাসিরুদ্দীন আব্দুর রহিম বিন আবি মানসুর।[৫০৯]

---

৫০৪. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯; কার্ল ব্রুকালম্যান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭

৫০৫. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

৫০৬. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯

৫০৭. নাওসিরওয়ান হলো খসরু প্রথম-এর উপাধির আরবী রূপ; যার অর্থ 'অমর আত্মার অধিকারী'। তিনি ৫৩১ থেকে ৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরানের সাসানীয় সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। তার মৃত্যুর সময়, সাসানীয় সাম্রাজ্য দ্বিতীয় শাপুরের সময়কালের পর থেকে পশ্চিমে ইয়েমেন থেকে পূর্বে গান্ধারা পর্যন্ত সর্বোচ্চ সীমানায় পৌঁছেছিল। এরপর তার পুত্র চতুর্থ হোর্মিজদ্ তার উত্তরসূরী হন। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫৫২

৫০৮. কার্ল ব্রুকালম্যান, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭; খলিল মিরদান, *ইবনুল মুকাফ্ফা আয়িম্মাতিল আদাব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৫

৫০৯. মুহাম্মাদ হাসান আয়াতুল্লাহ, *তারজামাতু আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬২

১০. الكيكيين

ইতিহাসবেত্তা আল-মাসউদীর (৮৯৬-৯৫৭ খ্রি.) মতে গ্রন্থটি প্রাচীন ফারসী ভাষা থেকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা অনুবাদ করেছেন। পূর্বপুরুষ ও সম্রাটদের ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থটি পারসিকদের কাছে খুবই মর্যাদাপূর্ণ ছিল।[৫১০]

১১. خرابناسة

সাসানী সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় থেকে পতন কালের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বলিত خرابناسة (খরাবনাসা) গ্রন্থটি تاريخ ملوك الفرس (পারস্য সম্রাটদের ইতিহাস) নামে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা অনুবাদ করেন।[৫১১]

১২. كتاب قاطيغورياس

এটি গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) যুক্তিবিদ্যা, প্রকৃতিবাদ, ধর্মতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রবিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ 'Kategorias'-এর আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটি আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা বিভিন্ন বিষয়ের প্রামাণিক ও যুক্তিমূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করেননি; বরং সংক্ষেপে ভাবানুবাদ করেছেন।[৫১২] এছাড়াও তিনি অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত Peri Ilermenaias-গ্রন্থটি كتاب باري أرمنياس , Analytica-গ্রন্থটি كتاب أناليطيقا এবং গ্রীক দার্শনিক পোরফারির/Porphyry (২৩৪-৩০৫ খ্রি.) Eisagoge-গ্রন্থটি إيساغوجى শিরোনামে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৫১৩]

অনুবাদশৈলী

আব্দুল্লাহ ইব্নুল-মুকাফ্ফার (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) অনুবাদশৈলীর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো-

تركيب الكلمات والجمال (শব্দ ও বাক্য বিন্যাস)

আব্দুল্লাহ ইব্নুল-মুকাফ্ফা মনের ভাব প্রকাশের জন্য অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতেন। তবে তিনি কোনো শব্দ বিলুপ্ত বা উহ্য না করেই অর্থ প্রকাশের জন্য পরিমিত শব্দের ব্যবহার

---

৫১০. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

৫১১. ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৫১২. খলিল মিরদান, *ইবনুল মুকাফ্ফা আয়িম্মাতিল আদাব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬

৫১৩. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯; ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

করতেন।[৫১৪] তাঁর বাক্য ছিল সহজ-সরল, ছোট, সহজ বোধগম্য, সুবিন্যস্ত, সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অতিরঞ্জনমুক্ত।[৫১৫] তবে তিনি আরবী সাহিত্যের তৎকালীন সাধারণ রচনাশৈলীর গণ্ডির বাইরে যাননি। আর তিনি সহজ-সরল শব্দচয়ন, সাদামাটা রচনাশৈলী ও বাক্যের পূর্বাপর মসৃণ সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা এ কাজ সম্ভব করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. শাওকি দায়িফ (১৯০৫-২০০৫ খ্রি.) বলেন ইবনুল-মুকাফ্ফা-এর রচনাশৈলীতে সূক্ষ্ম কোনো ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ নেই। তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো। সুক্ষ্ম অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি মূলভাব ঠিক রেখে কিছুটা নতুনত্ব নিয়ে আসতেন। একারণে তাঁর রচনাশৈলী শ্রুতিমধুর আওয়াজ, উচ্চারণ ও রূপায়ণ মাধুর্যে পরিপূর্ণ। এ মাধুর্য সৃষ্টির কারণ হলো, তিনি তাঁর রচনাশৈলীতে বাহ্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির চিন্তা না করে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের চিন্তা করতেন।[৫১৬]

اقتباس من القرآن (কুরআনের উদ্ধৃতি)

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফার চিন্তা ও চেতনায় ধর্মীয় অনুভূতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অনুবাদকরণের সময় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মূল বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত, আয়াতাংশ বা শব্দ সংযোজন করেছেন। যেমন তাঁর বিখ্যাত অনুবাদগ্রন্থ 'কালিলা ওয়া দিমনা'-এর الاسد وابن آوى (সিংহ ও শৃগাল) অধ্যায়ে ব্যবহৃত পবিত্র কুরআনের শব্দ ও আয়াতাংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বাক্য হলো[৫১৭]

وليس ينبغي للعاقل أن يقنط وييأس من رحمة الله.

(আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ ও বিচ্ছিন্ন হওয়া জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত নয়।)

وقد يكون من يتول ذلك لا تأخذه في الله لومة لائم.

(এমন হতে পারে যে এধরণের কাজ করবে, আল্লাহর কাছে নিন্দুকের নিন্দা গ্রহণ হবে না।)

وهوالذي يعلم سرائر العباد وماتكون صدورهم.

(আর তিনিই তাঁর বান্দাদের গোপনীয়তা এবং তাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন।)

وقالوا :من اقترف خطيئة أو إثما... (এবং তাঁরা বলল: কে অন্যায় বা গুনাহ করেছে?...)

صالحي القضاة لا يقطعون بالظن. (প্রকৃতপক্ষে বিচারকদের বিচার সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে নয়।)

---

৫১৪. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

৫১৫. হাসান নায়িল মারসাফী (সম্পা.), *কালিলা ওয়া দিমনা*, *ইবনুল মুকাফ্ফা* (বৈরুত: দারুল মাসিরা, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ.০৯

৫১৬. আন্ নাসরুল আব্বাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৫১৭. মুহাম্মাদ সালিম আল-জুন্দী, *আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

لعلهم أن الظن لا يغني من الحق شيئا. (সম্ভবত তাঁরা মনে করে যে, সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে সন্দেহপোষণ করে কোনো লাভ নেই।)।

اقتباس من الحديث (হাদীসের উদ্ধৃতি)

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা অনূদিত গ্রন্থাবলিতে হাদীস এবং হাদীসের ভাবার্থের সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন 'কালিলা ওয়া দিমনা'-এর الحمامة المطوقة (শৃঙ্খলিত কবুতর) অধ্যায়ে তিনি নিম্নোক্ত অংশটুকু ব্যবহার করেছেন,

لاعقل كالتدبير، ولا ورع ككف الأذى ، ولا حسب كحسن الخلق. (পরিকল্পনার সদৃশ কোনো বুদ্ধি নেই, মানবকষ্ট দূরীভূত করার মতো কোনো তাকওয়া নেই এবং উত্তম চরিত্র সদৃশ কোনো বংশ মর্যাদা নেই।); যা মূলত নিম্নোক্ত হাদীস থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।[৫১৮] عن أبي ذر، قال : قال رسول الله ﷺ لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق.[৫১৯]

استعمال المصطلحات الإسلامية (ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার)

তাঁর অনূদিত গ্রন্থে অনেক ইসলামী পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'কালিলা ওয়া দিমনা' অনুবাদ গ্রন্থের الاسد والثور (সিংহ ও ষাঁড়) অধ্যায়ে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য ইসলামী পরিভাষা হলো[৫২০]- فلم تكن له حجة (তাঁর কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না...), فأمر القاضي أن يقتص منه. (বিচারক সেবিষয়ে বর্ণনা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।), لتزداد علما بوخامة عاقبة الشهادة بالكذب في الدنيا والآخرة... (যাতে আপনি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে গুরুতর জ্ঞান বাড়াতে পারেন; দুনিয়া ও আখেরাতে...), قد علمت أن شهادة الواحد لا توجب حكما... (আমি শিখেছি যে, একক সাক্ষ্যের দ্বারা হুকুম সাবস্ত হয় না।) ইত্যাদি।

التثقيف (উন্নতিকরণ)

আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফফা আলঙ্কারিক ও বিনয় প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করে বাক্যকে সুশোভিত করেছেন। যেমন الاسد والثور (সিংহ ও ষাঁড়) অধ্যায়ে তিনি বলেন-[৫২১]

---

৫১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

৫১৯. সুনানে ইবনে মাজাহ, হা. নং: ৪২১৮

৫২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

৫২১. ইলিয়া আল-হাভি, *ফিন-নাকদী ওয়াল আদাবী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩২৫

فقال الأسد من أين أقبلت؟ قال: من موضع كذا. قال: فما حاجتك؟ قال: ما يأمرني به الملك.

উক্ত বাক্যের শব্দগুলো ছকবদ্ধ, মার্জিত ও উপযুক্ত চয়ন এবং এক শব্দ দ্বারা অন্য শব্দকে পরিবর্তন করা হয়েছে। লেখক এখানে من أين أتيت؟ বা جئت ,قدمت না বলে أقبلت শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা উল্লিখিত তিনটি শব্দের মধ্যে বিশুদ্ধ, কম ব্যবহৃত অথচ বেশি উপযোগী, দিকনির্দেশনার অর্থ অন্তর্ভুক্ত এবং এ শব্দের মধ্যে দু'টি অর্থ একত্রিত করেছে; একটি হলো جاء , قدم অথবা أتي অর্থে এবং অন্যটি হলো القبلة অথবা الجهة বা দিক নির্দেশক অর্থে।[৫২২]

الموافقة لمقتضى الحال (অবস্থার সাথে সংগতি রেখে বক্তব্য প্রদান)

তিনি বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বক্তব্য তুলে ধরতেন। যেমন: সিংহের তাৎক্ষণিক প্রশ্নের উত্তরে বলেন **'حاجة'** শব্দটি ব্যবহার করেন; যা স্থান-কাল ও অবস্থার সাথে সুস্পষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। আবার এ গল্পে তিনি সিংহ অর্থাৎ রাজা এবং তাঁর কাছে যারা আসে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত কথোপকোথনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন: সিংহের কাছে একজন অভাবী আগমণ করলে তিনি ما حاجتك؟ বাক্য ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে তিনি ما غايتك ؟ বা ما مأربك ؟ অথবা এ ধরণের কোনো বাক্য ব্যবহার করেননি।[৫২৩]

تضمين الامثال (প্রবাদবাক্য প্রবিষ্টকরণ)

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফার অনুবাদকর্মে বেশকিছু প্রবাদ-প্রবচন সন্নিবেশিত হয়েছে; যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর কথামালা শোভিত হয়েছে ও রচনাশৈলীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বিখ্যাত বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন। যেমন 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থের الملك والطائرفنزة (রাজা ও ময়না) অধ্যায়ে ব্যবহৃত কিছু প্রবাদ হলো-[৫২৪]

১. شر الملوك الذي يخافه البرئ.

অর্থাৎ "বাদশাহদের মধ্যে নিকৃষ্ট সেই যাকে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী ভয় পায়।" উক্ত প্রবাদটি আকসাম বিন সাইফী আত-তামিমীর (মৃ. ৪৪ হি.) যা তিনি প্রাচীন পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর (৫৯০-৬২৮ খ্রি.)

---

৫২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫-৩২৬
৫২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬
৫২৪. মুহাম্মাদ সালিম আল-জুন্দী, *আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

বক্তব্য উদ্ধৃতিকালে উল্লেখ করেছিলেন। মূল প্রবাদের শব্দগুলো ছিল নিম্নরূপ, شر الملوك من خافه البرئ অর্থাৎ "বাদশাহদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ সেই ব্যক্তি যাকে প্রতিযোগিতাকারী ভয় করে।"

২. فرب ملوم ولم يذنب.

অর্থাৎ "তিরস্কৃত কর্তা কোনো অন্যায় করেনি।" উক্ত প্রবাদের ভাব ও শব্দগুলো তিনি আল-আহনাফ বিন কায়সের (৬০২-৬৯১ খ্রি.) প্রবাদ থেকে নিয়েছেন। মূল প্রবাদের শব্দগুলো ছিল নিম্নরূপ رب ملوم لا ذنب له. অর্থাৎ "একজন নিন্দনীয় কর্তা যার কোনো অপরাধ নেই।"

التوقيع النفسي (আতিশয্য পরিহার)

আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফফা তাঁর রচনাশৈলীতে আতিশয্য বর্জন করেছেন। আপতদৃষ্টে তাঁর কিছু রচনায় কোনো কোনো শব্দ অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অপ্রয়োজনীয় নয়। যেমন মেষশাবক ও সিংহ সম্পর্কে তাঁর একটি বাক্য "فأقام الجمل مع الأسد زمانا طويلا" এ বাক্যে 'زمانا' শব্দটি বাস্তবিক অর্থে দীর্ঘ সময় বুঝানোর জন্য উপযুক্ত। তবুও 'زمانا' শব্দের পরে 'طويلا' শব্দ ব্যবহার করেছেন বিশ্বাসঘাতকা ও নিষ্ঠুরতার প্রভাবকে বড় করে দেখানোর জন্য; যা বাক্যের শৈল্পিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।[৫২৫]

الموازنة بين اللفظ والمعنى (শব্দ ও অর্থের মাঝে তুলনা)

আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা (১০৬-১৪২ হি./৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) শব্দ ও অর্থের মাঝে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে উভয়টিকে সমান্তরালে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। অল্প শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমেই তিনি পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক বাক্য রচনা করতেন। ফলে বাক্যাংশগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করার সময় বাক্যের ইবারত দীর্ঘ হতো। যেমন-[৫২৬] و كانت إذا فرغت من النقل، باضت، ثم حضنت بيضها، فإذا أنقاض و أدرك فراخها، جاءها ثعلب قد تعهد ذلك منها، لوقت قد علمه، ريثما ينهض فراخها، فوقف بأصل النخلة، فصاح بها و توعدها أن يرقي إليها، أو بلقي اليه فراخها، فتلقيها إليه."

উপরোল্লিখিত দীর্ঘ বাক্যটি ছোট ছোট বাক্যের সমন্বয়ে গঠিত হলেও বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পৃথক ছোট ছোট বাক্যগুলো আবার নতুন নতুন ঘটনার বর্ণনা দেয়।[৫২৭]

---

৫২৫. ইলিয়া আল-হাভি, *ফিন-নাকদী ওয়াল আদাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬-৩২৭
৫২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০
৫২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

استعمال حرف الجر (অব্যয়-এর ব্যবহার)

অব্যয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। الحرف الجر এমন এক সূক্ষ্ম উপাদান যেগুলোর সঠিক ব্যবহার অভিজ্ঞ ও সচেতন ব্যক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। فعل لازم -কে তিনি حرف দ্বারা فعل متعدي অর্থে ব্যবহার করেছেন। আবার বাক্যের অর্থ স্পষ্ট, মজবুত ও বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে অন্য حرف দিয়ে তা ভেঙ্গে দিতেন। যেমন তাঁর কথায়: وقف بأصل الشجرة বাক্যে 'ب' বর্ণটি স্থান নির্দেশক নির্দিষ্ট স্থাপক। 'ب' এর স্থলে যদি إلى বর্ণ ব্যবহৃত হত তবে তা প্রশস্ত অর্থ প্রকাশ করত, ফলে বাক্যের এবারাত আরো সহজ হত। কিন্তু 'ب' বর্ণের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি রূপায়ণের শক্তি যদিও প্রকৃতপক্ষে একটি শিয়ালের পক্ষে বৃক্ষমূলে অবস্থান অসম্ভব। যদি এখানে 'ب' এর স্থলে إلى শব্দ ব্যবহৃত হত, তবে এর অর্থ সাধারণের বোধগম্যের বাইরে একধরণের كناية এর অর্থ প্রকাশ করত, যা তিনি পছন্দ করতেন না।[৫২৮]

يكثر من حرف الفاء ('ف' হরফের অধিক ব্যবহার)

তাঁর লেখার মধ্যে অধিক পরিমাণে 'ف' অক্ষর ব্যবহার করেছেন। এ 'ف' বর্ণটি সাধারণত পৃথকীকরণ অর্থ প্রকাশক যা পূর্ববর্তী অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের অলংকারিক দৃঢ়তা নির্দেশ করে। যেমন- كليلة و دمنة গ্রন্থের الأسد والذئب অধ্যায়ের الأسد والثور والغراب و ابن آوى গল্পে ব্যবহৃত কিছু শব্দ হলো-[৫২৯]

فتخلف - فدخل - فقال - فما حاجتك - فأقام - فلقي - فقاتله - فلما- فلبث- فأصابهم - فقالوا - فليتنا - فانتشروا - فيصيبني - فخرج ، فتنحوا - فيأكله - فلا - فلما سمع - فسكت الأسد - فلما عرف - فنذكر - فيرد - فإذا - فهلك - ففعلوا ذلك - فإذا بك - فإذا هلكت - فليأكلني - فقر - فأجابه - فلا خير - فقد رضيت - فرد عليه - فقد سمحت - فاعترضه - فليأكل - فإنه - فيسلم - فقال الذئب .

'ف' অক্ষরের অধিক ব্যবহার ছিল তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি। একঘেয়েমি কাটিয়ে পরিশীলিতা ও সৃজনশীলাঁর অন্যতম স্বভাবজাত কারণে তিনি 'ف' অক্ষরটি পুনঃরাবৃত্তি থেকে

৫২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০
৫২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

বিরত হননি; যা স্পষ্টভাবে রচনার নান্দনিক রূপকে প্রভাবিত করেছে এবং বাহ্যিক বিধি নিষেধের সাথে অর্থকে সীমাবদ্ধ করেছে।

النعوت ضرورة داخلية (প্রয়োজনীয় গুণবাচক পদের ব্যবহার)

তিনি বিভিন্ন ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি অনুবাদ করার সময় প্রয়োজনীয় বিশেষণ পদের যথোপোযুক্ত ব্যবহার করেছেন যেমন- فلقي فيلا عظيما ، فقاتله قتالا شديدا ، و أفلت منه ، مثخنا بالجراح ، يسيل منه الدم ، وقد خدشه الفيل بأنياب.

উক্ত বাক্যসমূহে লেখক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে হাতীর বিশেষণে عظيما শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা শক্তিমত্তা, বর্বরতা ও অত্যাচার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে قتالا شديدا এবং أفلت শব্দগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। এখানে সিংহ ও হাতীর সাথে প্রচণ্ড লড়াই সম্পর্কে যে বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছেন সেখানে তিনি বনের রাজা সিংহের প্রতিপত্তিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৫৩০]

التقيد بالواقع (বাস্তবতার সাথে শর্তযুক্ত)

ইবনুল মুকাফফার রচনাগুলো বাস্তব সম্মত হওয়ার ফলে তাঁর লেখা পড়ে পাঠক কখনো ঘাবড়ে পড়তেন না। কারণ তিনি পাঠক সমাজের চাহিদা ও রুচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথোপযুক্ত শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাস করতেন। যেমন-

"فلما وصل إلى مكانه وقع لا يستطيع حراكا" ، و ليس الذئب و الغراب و ابن آوى أياما لا يجدون طعاما" ، " فأصاهم و أصابه جوع شديد و هزال ، " لقد جهدتم واحتجتم...

উপরোল্লিখিত বাক্যসমূহে 'وقع' 'أيام' ও ' 'هزال' শব্দগুলো পাঠক মহলে চাহিদা ও রুচির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং উপযুক্ত স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫৩১]

الحشد اللفظي و المعنوي (শব্দ ও অর্থ একত্রিতকরণ)

পাঠক সমাজের গতিবিধি লক্ষ্য রেখে তাদের মনের খোরাক মেটানোর জন্য ইবনুল মুকাফফা বাক্যের শব্দগুলো বিভিন্ন বিষয় ও অবস্থার সাথে সংগতি রেখে ব্যবহার করেছেন। যেমন-

وأفلت منه مثقلا، مثخنا با لجراح ، يسيل منه الدم.

---

৫৩০. ইলিয়া আল-হাভি, *ফিন-নাকদী ওয়াল আদাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

৫৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭-৩২৮

উদ্ধৃতাংশে যেসব শব্দগুলো একত্রিত করা হয়েছে সেগুলো হলো- يسيل - الجراح - مثخن - مثقل - أفلت এবং الدم। অনেক সময় তিনি কোনো বিষয় বা চিত্রকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য এবং পাঠককে মজা দেওয়ার জন্য শব্দের পূনরাবৃত্তি করতেন। যেমন উটের ঘাস খাওয়ার ব্যাপারে তিনি লিখেছেন- هذا الجمل الآكل العشب ، المتمرغ بيننا من غير منفعة منه ، ولا رد عائدة ولا عمل يعقب مصلحة.

এখানে তিনি শব্দ ও অর্থের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রথমে متمرغ শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং ولا عمل يعقب مصلحة ولا رد عائدة ও من غير منفعة منه বাক্যাংশ দু'টির মাধ্যমে তা পূনরাবৃত্ত করেছেন।[৫৩২]

অনুবাদকর্মের সাহিত্যিক মূল্যায়ন

আব্বাসী যুগের অনুবাদ সাহিত্য ছিল সেসময়ের সামাজিক দর্পণস্বরূপ। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন মানব অবয়বের সর্বাংশ বাহ্যিকরূপে প্রস্ফুটিত হয়, তদ্রূপ আব্বাসী যুগের অনুবাদ সাহিত্যও তৎকালীন আরব, গ্রীক, পারস্য এবং ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সামাজিক চিত্র প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়। আরবীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, পরোপকারিতা, বদান্যতা, সাহসিকতা, রূঢ়তা, প্রতিশোধপরায়ণতা, যুদ্ধাংদেহী মানসিকতা, হিংস্রতা, পরশ্রিকাতরতা প্রভৃতি দোষ-গুণ এ সময়ের অনুবাদ সাহিত্যের প্রধানতম অনুসঙ্গ হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। তবে বুননে, গাঁথুনিতে, শৈল্পিক নিপূণতায়, রূপ-অলংকারে, শব্দচয়নে, সাহিত্য-শিল্পগুণে তা অনিন্দ্যসুন্দর শ্রেষ্ঠকীর্তি হিসেবে মর্যাদার দাবিদার। আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফা একজন উঁচুমানের গদ্য সাহিত্যিক হলেও মূলত অনুবাদক হিসেবেই তাঁর সাফল্য ও খ্যাতি সর্বাধিক। মহান আল্লাহ তাঁকে সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা গুণ দান করেছিলেন। যার সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তবে প্রত্যেক সুন্দরেরও একটি অসুন্দর মাত্রা রয়েছে। তাঁর অনুবাদকর্মের ক্ষেত্রেও একথা একইভাবে প্রযোজ্য। তাঁর অনুবাদকর্মের যেমন অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু নেতিবাচক দিক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

---

৫৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

অনুবাদক হিসেবে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা ছিলেন বিখ্যাত। তিনি গ্রন্থাকারের বক্তব্য আরবীতে ভাষান্তর করেছেন দক্ষতার সাথে। স্বীয় মেধা ও দক্ষতাকে নিজ রচনাশৈলীতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি পারস্যের প্রবাদ-প্রবচন ও গ্রীক দর্শনকে আরবী অলংকারিত্বের সাথে সংমিশ্রণ করেছেন। নতুন নতুন উপাদান সংযোজন করে অনুবাদ সাহিত্যেকে করেছেন সমৃদ্ধশালী। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ কবি আবুল আইনা (১৯১-২৮৩ হি./৭৯১-৮৯৬ খ্রি.) আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফার কিছু বক্তব্য শুনে মন্তব্য করে বলেন-

"كلامه صريح ، ولسانه فصيح ، وطبعه صحيح ، كأن بيانه لؤلؤ منثور ، وروض ممطور."

অর্থাৎ "তাঁর বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট, ভাষা ছিল আকর্ষণীয়, বক্তব্যের ধারা ছিল বিশুদ্ধ, তাঁর বর্ণনা ছিল যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তার মতো ও বৃষ্টি ভেজা কাননের মত।"[৫৩৩]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহমাদ আমীন (১৮৮৬-১৯৫৪ খ্রি.) তাঁকে মূল্যায়ন করে বলেন, "তাঁর জ্ঞান ও জানা-শোনার পরিধি ছিল সুবিস্তৃত। আরবী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। পাহলভী ভাষার যা কিছু অনবদ্য সৃষ্টি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে সেগুলোর তিনি আরবী অনুবাদ করেছেন। তাঁর রচনা অনেকের মতো অন্তঃসারশূন্য ছিল না। চিন্তা ও প্রকাশ দু'টোই ছিল বস্তুনিষ্ঠ ও সারগর্ভ। ভাব নিবেদনে ও শব্দ চয়নে তিনি ছিলেন সমান যত্নবান।"[৫৩৪]

মূলত অনুবাদশাস্ত্রের প্রতি গভীর আগ্রহ ও সাধনা তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছে। অনুবাদকরণের সময় তিনি মূলভাব ও অর্থ সঠিক রাখার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ এক্ষেত্রে তাঁর সমুদয় শক্তি-সামর্থ্য বিনিয়োগে প্রভাবিত করেছে।[৫৩৫] ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করে তিনি সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অনুবাদ এমন নিপূণ ও যথার্থ ছিল যে, তাঁর মৌলিক রচনা ও অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন।[৫৩৬]

তাঁর রচনাশৈলতে কিছু নেতিবাচক দিক ছিল। যেমন, ড. ত্বহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর 'মিন হাদিসিশ শি'রি ওয়ান নাস্‌রি' গ্রন্থে আব্দুল হামিদ বিন ইয়াহয়া (৭৫-১৩২ হি.) এবং ইবনুল-মুকাফ্ফা (৭২৪-৭৫৯ খ্রি.) এর রচনাশৈলী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আব্দুল হামিদের ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সম্ভবত তাঁর বাগ্মিতা, অন্তর্নিহিত অর্থের মাধুর্যতা ও শৈলী সমতুল্য

---

৫৩৩. মুহাম্মাদ সালিম আল-জুন্দী, *আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৫৩৪. আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

৫৩৫. *আন-নাসরুল আব্বাসী*, প্রাগুক্ত, প্র. ৭৫

৫৩৬. ইবনুল মুকাফ্ফা, ভূমিকাংশ, *আল-আদাবুস সগির* (মিশর: মাকতাবাতু মুহাম্মাদ আলী, ১৯৬১ খ্রি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

কোনো লেখক নেই। অপরদিকে ইবনুল-মুকাফ্ফা সূক্ষ্ম অর্থ জ্ঞাপক বর্ণনা দিতে অপারগ ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁকে খুব ক্লেশ করতে হত। তিনি 'ال ' শব্দের যথেচ্ছা ব্যবহার করতেন। ফলে অর্থপ্রকাশের নির্ভুলতার প্রয়োজনে তা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নিজের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করে।[৫৩৭] অবশ্য ড. শাওকি দায়িফ (১৯১০-২০০৫ খ্রি.) উক্ত মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, সম্ভবত এটি ইবনুল-মুকাফ্ফার বিরুদ্ধে অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদ প্রসঙ্গে আল-জাহিজের (১৪৯-২৫৫ হি.) পক্ষালোম্বন করে ড. ত্বহা হুসাইন হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে প্ররোচিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইবনুল মুকাফ্ফার বর্ণনারীতিতে কোনো অস্থিরতা নেই। তিনি ইবনুল মুকাফ্ফাকে প্রাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের মধ্যে গণ্য করে অতিরঞ্জন করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়।[৫৩৮] তবে কিছু কিছু স্থানে বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষা না করার কারণে তিনি জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। আর এ অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় সাধারণত তাঁর অনুবাদ গ্রন্থসমূহে। যেমন কোনো-কোনো সময় তিনি বাক্যে ضمير (সর্বনাম) ব্যবহারের ক্ষেত্রে একবচনের স্থলে বহুবচন ব্যবহার করেছেন।[৫৩৯] আবার কখনো কখনো তিনি শাব্দিক অর্থের পরিবর্তে বাক্যের ভাবার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে ضمير বা সর্বনামের পূনরাবৃত্তি করেছেন।[৫৪০] অনুরূপভাবে কখনও কখনও তিনি একটি শব্দকে تقديم (প্রবর্তন) অন্যটিকে تأخير (বিলম্বিত) এবং তৃতীয়টিকে حذف (বিলুপ্ত) করার কারণে বাক্য জটিল করেছেন। অথবা মৌলিক একটি বাক্যের স্থলে সহায়ক বা অন্তর্বর্তীবাক্য ব্যবহার করে 'أن'-এর ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্যকে দুর্বোধ্য করেছেন।[৫৪১] তাছাড়াও অনুবাদকরণের সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি সংযোজন-বিয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পরিশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিরল প্রতিভার অধিকারী আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফার অনুবাদশৈলীকে নেতিবাচক দিকগুলো ম্লান করতে পারেনি। বরং তাঁর অনুবাদশৈলীর সহজ-সরলতা, গণতান্ত্রিকতা, বাক্যের গাঁথুনি, শব্দের মিষ্টতা ও কোমলতা গুপ্তধন হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। ভাষা ও ছন্দের

---

৫৩৭. ড. ত্বহা হুসাইন, *মিন হাদিসিশ শি'রি ওয়ান নাস্‌রি* (মিশর: দারুল মায়া'রিফ, ১৯৩৬ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৯

৫৩৮. ড.শাওকি দায়িফ দায়িফ, *আল-ফাননু ওয়া মাজাহিবুহু ফিন নাসরিল আরাবি* (কায়রো: দারুল মা'য়ারিফ, তা.বি), সং. ১০ম, পৃ. ১৪১

৫৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭-৪৬৮

৫৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮

৫৪১. হান্না আল-ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮

অনুপম রচনাশৈলী তাঁকে আব্বাসী যুগের অনুবাদকদের নেতা বানিয়েছে এবং সাহিত্যাঙ্গনে স্মরণীয় করে রেখেছে। যেমনটি ড. শাওকি দায়িফ (১৯০৫-২০০৫ খ্রি.) বলেন, "তাঁর বর্ণনারীতিতে কোনো অস্থিরতা নেই। কেননা তিনি আরব পরিবেশে আল-আহতাম পরিবারের (آل الأهتم) মাঝেই বেড়ে উঠেছেন। তিনি নিজের বর্ণনার মধ্যে এমন শক্তি ও দৃঢ়তা খুঁজে পেয়েছিলেন যা তাঁকে তাঁর সময়ের إمام المترجمين বা শীর্ষস্থানীয় অনুবাদকদের নেতা বানিয়েছিল।"[৫৪২]

আব্বাসী যুগ ছিল জ্ঞানের জাগরণ, জ্ঞানান্বেষণ এবং শিক্ষা ও সভ্যতা বিকাশের যুগ। খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ যুগের স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় আরবী অনুবাদ সাহিত্যে নবদিগন্তের সূচনা করেন। এসময় তাঁরা মৌলিক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের সাহিত্যভাণ্ডার থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। আর এ সমৃদ্ধকরণে আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষ জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকাফ্ফার অবদান অবিস্মরণীয়। বিভিন্ন ভাষার যা কিছু অনবদ্য সৃষ্টি তাঁর চোখে পড়েছে সেগুলো তিনি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল সুবিস্তৃত। আরবী সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করাই ছিল তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য। এ জন্য তিনি গোড়ামী ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে গিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। মাত্র ৩৬ বছরের জীবনকালে মৌলিক রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি তাঁর রচনাবলিতে সহজ-সরল, অর্থজ্ঞাপক ও বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন। নীতিবাক্য সংকলন, প্রশাসনিক উপদেশ, দর্শন ও সামাজিক বিষয়াবলির ওপর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে সাহিত্য সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শাসক ও শাসিতকে নিজ নিজ বৃত্তে দূরদর্শী হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর রচনাগুলো অনুকরণীয়। সাহিত্যের জন্য যা কিছু কল্যাণ তা তিনি গ্রহণ করেছেন। আর এজন্যই তাঁকে জ্ঞান বৃক্ষের ফল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমনটি খলিফা হারুন অর রশিদের উজির জাফর বিন ইয়াহয়া (৭৬৭-৮০৩ খ্রি.) বলেন-[৫৪৩]

"عبد الحميد أصل ، وسهل بن هارون فرع ، وابن المقفع ثمر وأحمد بن يوسف زهر."

---

৫৪২. ড. শাওকি দায়িফ, *আল-ফাননু ওয়া মাজাহিবুহু ফিন নাসরিল আরাবী* (কায়রো: দারুল মা'য়ারিফ, তা.বি), ১০ম সংস্করণ, পৃ. ১৪১

৫৪৩. মুহাম্মাদ সালিম আল-জুন্দী, *আব্দুল্লাহ বিন আল-মুকাফ্ফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯; আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৮

অর্থাৎ "আব্দুল হামিদ (মৃ. ১৩২ হি/৭৫০ খ্রি.)[৫৪৪] হলেন (জ্ঞান বৃক্ষের) কাণ্ড, সাহল বিন হারুন (১৪১-২১৫ হি./৭৫৮-৮৩০ খ্রি.) হলেন শাখা, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফ্ফা হলেন ফল এবং আহমাদ বিন ইউসুফ (মৃ. ২১৩ হি./৮২৮ খ্রি.) হলেন ফুল।"

৫৪৪. তার নাম আব্দুল হামিদ বিন ইয়াহয়া এবং উপাধি 'আল-কাতিব'। তার জন্মসন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না তবে ইবনে খাল্লিকানসহ অধিকাংশের মতে তিনি ৭ম শতাব্দীতে ইরাকের 'আল-আনবারা' শহরতলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আব্বাসীয় শাসনামলের একজন বিখ্যাত কবি ও গদ্য সাহিত্যিক ছিলেন। তার রচনাশৈলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- من رسالة إلى فرق العرب ، رسالة إلى السلامة ، من رسالة إلى الكتاب ، خطاب إلى الكتاب আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফফার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমনকি তাকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন আব্দুল হামিদ বিন ইয়াহয়াকেও গ্রেফতার করা হয়। অবশেষে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইবনুল-মুকাফ্ফার সঙ্গে তাকেও হত্যা করা হয়। দ্র. হামাদানী আল-জানকারী, *আব্দুল হামিদ আল-কাতিব* আসারুহু ওয়া হায়্যাতুহু (মিশর : দারুস সাহার, ২০০৭ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.)

তাঁর পূর্ণনাম আবু যায়েদ হুনাইন বিন ইসহাক আল-ইবাদী (ابو زيد حنين بن اسحاق العبادي)। তিনি ১৯৪ হিজরী মোতাবেক ৮১০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের 'আল-হিরা' নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন চিকিৎসক ছিলেন, যিনি ভেষজ ঔষধ তৈরী ও ভেষজ চিকিৎসার পাশাপাশি হুণ্ডি বিনিময় বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিলেন।[৫৪৫] হুনাইন 'আল-হিরা' অঞ্চলের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং সুরিয়ানী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হন। খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) শাসনামলে মাত্র ১২ বছর বয়সে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মিলনস্থল রাজধানী বাগদাদে চলে যান। তিনি প্রথমে খ্রিস্টান চিকিৎসক ও অনুবাদক ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহর (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) অধীনে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এরপর জুন্দিশাপুরের তৎকালীন বিখ্যাত চিকিৎসক ম্যাক্স মেয়ারহফ এর কাছে কিছুদিন চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ে পড়াশোনা করেন।[৫৪৬] প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি তাঁর পিতার কাছ থেকেও চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। ভাষা ও ব্যাকরণ অধ্যায়নের উদ্দেশ্যে তিনি বসরায় গমন করেন এবং সেখানে খলিল বিন আহমদ (৭১৮-৭৮৯ খ্রি.), ইবনে জুলজাল (মৃ. ৩৮৫ হি.), আলী আইয়ুব আস-সাখতিয়ানী (৬৮৫-৭৪৮ খ্রি.), আল-আসমায়ী (১৮০ হি/৭৮৮ খ্রি.) প্রমুখ বিখ্যাত ভাষাবিদ এবং ব্যাকরণবিদদের সহচর্যে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।[৫৪৭]

জুন্দিশাপুরে কিছুদিন অবস্থান করার পর তিনি গ্রীক ভাষা অধ্যায়নের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ তৎকালীন সময়ে চিকিৎসা ও দর্শন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য গ্রীক ভাষা শেখার বিকল্প ছিল না। তাই তিনি গ্রীক ভাষা অধ্যায়নের জন্য প্রায় দু'বছর লোকদৃষ্টির অন্তরালে ছিলেন।[৫৪৮] পরবর্তীতে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যায়ন, প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংগ্রহ ও বিভিন্ন ভাষার দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আলেকজান্দ্রিয়া, রোমান ও

---

৫৪৫. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল নাসির কা'দান ও মুহাম্মাদ নাজিম মাহরুশা, *হুনাইন বিন ইসহাক* (সিরিয়া: জামিয়াতুল হাল্ব, তা.বি), পৃ. ০৯

৫৪৬. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আদ-দিবয়্যান, *হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাহ* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল ফাহাদ আল-ওতানিয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫-৭৭

৫৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

৫৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

পারস্য ভ্রমণ করেন।[৫৪৯] আরবী, সুরিয়ানী, গ্রীক এবং ফারসী এ চারটি ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করে ২১১ হিজরী মোতাবেক ৮২৬ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী বাগদাদে ফিরে আসেন। এসময় তিনি ভাষাবিজ্ঞানের পাশাপাশি চিকিৎসাশ্রাস্ত্র ও অনুবাদের সমালোচনামূলক পদ্ধতিতেও যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠেন।[৫৫০]

ইতিহাসবেত্তাগণ গ্রীক ভাষায় তাঁর ভাষাগত দক্ষতার মূল্যায়ন করেছেন যথার্থভাবে। যেমন ইবনে জুলজাল বলেছেন-"হুনাইন বিন ইসহাক আরবী ও গ্রীক উভয় ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করার কারণে তিনি গ্রীকদের মতবাদ অনুসারে ধর্মতত্ত্বের ওপর একটি গ্রন্থ লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন।"[৫৫১]

কর্মজীবন

হুনাইন বিন ইসহাক ছিলেন আব্বাসী যুগের অন্যতম পণ্ডিত এবং একজন ইবাদি অর্থাৎ নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান (Nestorian Christian)। যুবক অবস্থায় তিনি চিকিৎসক ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.)-এর সহকারী হিসেবে কাজ করেন। কর্মরত অবস্থায় তিনি তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে মাঝে মাঝে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিতেন। তাছাড়া কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁর জন্য কঠিন হতো। একদিন ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলেন, 'আসলে হিরা' অঞ্চলের লোকজন চিকিৎসার বিন্দুবিসর্গ কিছুই বোঝে না। সহকারী হিসেবে কাজ না করে তুমি বরং বাজারে হুণ্ডির ব্যবসা কর।" এতে হুনাইন বিন ইসহাক অত্যন্ত অপমান করেন। এমনকি অশ্রুসিক্ত নয়নে শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত চাকরি থেকে অব্যহতি নেন এবং গ্রীক ভাষা শিখতে মনস্থ করেন। বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করে দেশে ফিরে এসে জানতে পারেন যে, বিখ্যাত অনুবাদক পরিবারের মূসা বিন-শাকিরের (৮০৩-৮৭৩ খ্রি.) তিনজন পুত্র নিজেদের গবেষণার কাজে সাহায্যের জন্য একজন যুবকের খোঁজ করছেন। হুনাইন তাদের উক্ত কাজে যোগ দেন। এখানে কাজ ছিল গ্রীকভাষী দেশের মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সেগুলো অনুবাদ করা।[৫৫২] এরপর তিনি খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) ব্যক্তিগত চিকিৎসক জিব্রিল বিন বখতিশুর (মৃ. ১৫২ হি./৭৬৯ খ্রি.) সহকারী নিযুক্ত হন। কাজে সন্তুষ্ট হয়ে খলিফা তাঁকে গ্রন্থাগারের প্রধান অধিকর্তা নিযুক্ত করেন। দায়িত্ব পেয়ে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের

---

৫৪৯. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান, *হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৫৫০. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল নাসির কা'দান ও মুহাম্মাদ নাজিম মাহরুশা, *হুনাইন বিন ইসহাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৫৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
৫৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; Philip K Hitti, *History of the Arabs,* ibid, p, 312

গ্রন্থাবলি অনুবাদকরণে উদ্যোগী হন। একাজে তাঁকে সাহায্য করেন স্বীয়পুত্র ইসহাক (৮৩০-৯১০ খ্রি.) এবং ভ্রাতুষ্পুত্র হুবাইশ বিন আল-আ'সাম-সহ (৮৭৮ খ্রি.) আরো অনেক শীষ্য। যেসব অসামান্য কাজ তিনি করেছেন তার পিছনে এ দু'জন সহকারীর অবদান ছিল অপরিসীম।[৫৫৩]

হুনাইন বিন ইসহাক খলিফা আল-মামুনের দরবারে প্রায় ৫ বছর চাকুরী করেন এবং এটিই ছিল তাঁর খ্যাতির সূচনা। এরপর খলিফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) তারপর খলিফা আল-মুতাওক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এসময়টি তাঁর কর্মকাণ্ডের একটি উত্তম সময় ছিল, কারণ খলিফা নিজেই তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হয়েছিলেন। খলিফার ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হয়ে তিনি সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। অবশ্য একবার সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এক শত্রুকে বিষ দেওয়ার জন্য তাঁকে বিষ তৈরির লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি নির্দ্বিধায় তা প্রত্যাখান করায় খলিফা তাঁকে এক বছরের জন্য কারাবাসে পাঠান। এরপর কারাগার থেকে মুক্ত করে খলিফার সম্মুখে তাঁকে হত্যার ভয় দেখানো হয়। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "যা মানুষের উপকারে লাগে, তাই আমি শিখেছি; অন্য কিছু আমি শিখিনি।" তখন খলিফা বলেন, "আমি কেবল তোমার সততা যাচাই করছি। কেন তুমি আমার নির্দেশ সত্ত্বেও বিষ বানাতে রাজি নও, তা জানতে চাই তোমার কাছ থেকে।" জবাবে অকুতোভয় এ সৈনিক বলেন, "আমার সামনে রয়েছে দু'টি জিনিস; আমার ধর্ম এবং আমার মহান পেশা। আমার ধর্ম বলছে, শত্রুর সঙ্গেও সদাচরণ করতে, ঠিক যেমন বন্ধুর সাথে করি। আর আমার পেশা মানবসমাজের উপকারের জন্যই উৎসর্গকৃত। শুধু রোগ উপশম এবং মুক্তিই আমার কাম্য। তাছাড়া প্রত্যেক চিকিৎসককেই শপথ নিতে হয় যে, সে কাউকে কখনও বিষাক্ত ঔষধ দেবে না।[৫৫৪]

হুনাইন বিন ইসহাকের ব্যস্তময় কর্মজীবন থেকে জানা যায় যে, তিনি খলিফা আল-মুতাওক্কিল বিল্লাহ-এর পরে নিম্নোক্ত আব্বাসীয় খলিফাদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে কৃতিত্বে সাথে দায়িত্ব পালন করেন-[৫৫৫]

১. আবু জা'ফর আহমাদ আল-মুনতাসির বিল্লাহ (৮৬১-৮৬২ খ্রি.)

---

৫৫৩. Philip K Hitti, *History of the Arabs,* ibid, p, 312

৫৫৪. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান, *হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫; Philip K Hitti, ibid, p, 313

৫৫৫. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২. আবুল আব্বাস আহমাদ আল-মুস্তাইন বিল্লাহ (৮৬২-৮৬৬ খ্রি.)

৩. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ আল-মু'তাজ বিল্লাহ (৮৬৬-৮৬৯ খ্রি.)

৪. আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ আল-মুহতাদী বিল্লাহ (৮৬৯-৮৭০ খ্রি.)

৫. আবুল আব্বাস আহমাদ আল- মু'তামিদ বিল্লাহ (৮৭০-৮৯২ খ্রি.)

সাহিত্যকর্ম

চিকিৎসক হিসেবে হুনাইন বিন ইসহাক যেমন দক্ষ ছিলেন তেমনি অনুবাদক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল আকাশচুম্বী। খলিফা আল-মুতাওক্কিল বিল্লাহ (৮৪৭-৮৬১ খ্রি.) তাঁকে গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রস্তুতকৃত অনুবাদগুলো তদারকির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য দক্ষ ও জ্ঞানী লেখকদের নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি নিজে অনুবাদ করার পাশাপাশি অনূদিত গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করতেন।[৫৫৬] অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজেই গ্রীক ভাষা থেকে প্রথমে সিরীয় ভাষায় এবং পরে তাঁর সহযোগীরা তা আরবী ভাষায় অনুবাদ করতেন।[৫৫৭] গ্রীক, ফারসী ও সুরিয়ানী গ্রন্থের আরবী অনুবাকরণেও নৈপূণ্য প্রদর্শন করেছেন। তিনি মৌলিক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.) ও গ্যালেন (১২৯-২১৬ খ্রি.)-এর অনেক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩২৪ এর অধিক। তিনি আরবী ভাষায় ১৩৮টি এবং সিরীয় ভাষায় ১৩টিসহ মোট ১৫১টি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে আরবী ভাষায় চিকিৎসা বিষয়ক ১০৩টি, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক ১৬টি, প্রকৃতিবিদ্যা সংক্রান্ত ০৮টি, জীবনচরিত ০৩টি, বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে ০৫টি এবং ধর্ম বিষয়ে ০৩টি। সিরীয় ভাষার ১৩টির মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ক ১১টি, জীবনচরিত ০১টি এবং ধর্ম বিষয়ে ০১টি।[৫৫৮]

অনুবাদ সাহিত্যে অবদান

আরবী, সিরীয়, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার পণ্ডিত হুনাইন বিন ইসহাক আব্বাসী যুগের একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক, লেখক ও অনুবাদক। 'বায়তুল হিকমা'-এর প্রথিতযশা এ অনুবাদক গ্যালেন (১২৯-২১৬ খ্রি.), প্লেটো (৪২৭-৩৪৮ খ্রি.পূ.), অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.), ইউক্লিড (মৃ. ৩০০-খ্রি. পূ.), হিপোক্রেটিস

---

৫৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৫৫৭. Philip K Hitti, ibid, p, 312

৫৫৮. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান, *হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১৭৪

(৪৬০-৩৭০ খ্রি.পূ.), টলেমি (১০০-১৭০ খ্রি.) প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি আরবী ও সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করার পাশাপাশি আব্বাসী যুগের অনেক অনূদিত গ্রন্থের পরিমার্জিত অনুবাদ করেন। অনুবাদকর্মে অসামান্য অবদানের কারণেই আরবদের নিকট তিনি شيخ المترجمين (The sheikh of the translators/অনুবাদকদের শেখ) হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান এর মতে হুনাইন বিন ইসহাকের অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৭৩টি। তন্মধ্যে আরবী ভাষায় ৮৬টি এবং সিরীয় ভাষায় ৮৭টি। তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। আরবী ভাষায় অনূদিত ৮৬টির মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ক ৫৮টি, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক ১৯টি, বিজ্ঞান বিষয়ে ০৯টি এবং ধর্মীয় গ্রন্থ ০১টি। সিরীয় ভাষায় অনূদিত ৮৭টির মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ক ৭৪টি, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক ১০টি, জীবনচরিতমূলক ০২টি এবং ধর্ম বিষয়ে ০৩টি গ্রন্থ রয়েছে।[৫৫৯] তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. كتاب فينكس لجالينوس

এটি গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের (১২৯-২১৬ খ্রি.) বিখ্যাত গ্রন্থ ফিনেক্স (Pinax)-এর আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটিতে দুটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থসম্ভার এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাঁর যুক্তিবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং ব্যাকরণশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে কিছু গ্রীক সংস্করণে এ দুটি প্রবন্ধকে একত্রকরে একটি প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল-গ্যালেন নিজে যেসমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলোর বিশদ বিবরণ প্রদান করা। পাশাপাশি তিনি প্রতিটি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, কোন প্রেক্ষাপটে ও কার জন্য তা রচিত হয়েছে, এমনকি জীবনের কোন পর্যায়ে তিনি সেগুলো লিখেছেন-এসব বিষয়ও এখানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হুনাইন এটি দাউদ আল-মুতাতাব্বিবের জন্য সিরীয় ভাষায় এবং আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুসার (৭৮১-৮৪৮ খ্রি.) জন্য আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। হুনাইনের মতে গ্যালেন তাঁর এ গ্রন্থে নিজ রচিত সকল গ্রন্থের উল্লেখ করেননি। তাই অনুবাদের সময় তিনি পূর্ববর্তী দুই প্রবন্ধের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত তৃতীয় প্রবন্ধ সংযোজন করেন, যাতে আলোচনার ধারাবাহিকতা ও বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণতা বজায় থাকে। এ অংশে তিনি ব্যাখ্যা করেন-গ্যালেন কেন কিছু

৫৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১৭৪

গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেননি? এবং তিনি নিজে যে গ্রন্থগুলো দেখেছেন ও অধ্যয়ন করেছেন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে সেগুলো বাদ পড়ার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য তাঁর পূর্বে আল-আব্‌রাশ নামে পরিচিত আইয়ুব আল-রাহাউয়ী (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রি.) এটি সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।[৫৬০]

২. كتاب الفراق

এটি শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের (১২৯-২১৬ খ্রি.) 'Book of Sects'-এর আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য হলো তিনটি; ভিন্ন চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্টিত চিন্তাধারার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন এবং ভিন্নমত পোষণকারীদের যুক্তি খণ্ডন। তবে হুনাইন কিছুটা ব্যতিক্রম করে গ্রন্থটি উপস্থাপন করেছে। তাঁর মতে উপরিউক্ত তিনটি চিন্তাধারার প্রত্যেকটির ভিতরেও অন্য চিন্তাধারা রয়েছে; যা ধরনে ভিন্ন। এ চিন্তাধারার অনুসারীগণ তাদের প্রবক্তাদের মতবাদগুলো মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করার মাধ্যমে প্রতিটি চিন্তাধারার মূল বিষয়গুলো বুঝতে ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে শিখবে।[৫৬১]

হুনাইনের পূর্বে আল-কারখ পরিবারের ইবনে সাহদা আল-কারখী (মৃ. ৩০০ হি./৯১২ খ্রি.) নামক এক ব্যক্তি এটি সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তবে সাহিত্যিক মানের দিক থেকে এটি দুর্বল ছিল। তারপর হুনাইন বিশ বা তার কিছু বেশি বয়সে জুন্দিশাপুরের শিরিশুয়া ইবনে কুতরুব নামক একজন চিকিৎসকের জন্য গ্রীক সংস্করণের কিছু অংশ বাদ দিয়ে গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। অতঃপর তাঁর বয়স যখন প্রায় চল্লিশ বছর, তখন স্বীয় ছাত্র হুবাইশ বিন হাসানের (মৃ. ৯১৩ খ্রি.) অনুরোধে গ্রন্থটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কয়েকটি গ্রীক সংস্করণ সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে সংগৃহীত গ্রীক ও সিরীয় সংস্করণের সাথে তুলনা করে তিনি গ্রন্থটির সংশোধনমূলক অনুবাদ করেন এবং অনূদিত সংস্করণটি আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসার (৭৮১-৮৪৮ খ্রি.) কাছে প্রেরণ করেন।[৫৬২]

---

৫৬০. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি* (লেবানন: দার ওয়া মাকতাবাতু বিল্লিয়ন, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১১; Kristian S. Heal (Edi.), *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation* (USA: Brigham Young University Press, Provo, Utah, 2016), pp. 7-8 (From next footnote editor's name will be used as K. S. Heal).

৫৬১. ibid, pp. 8-9

৫৬২. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩. الصناعة الطبية

এটি গ্রীক গ্যালেনের (১২৯-২১৬ খ্রি.) চিকিৎসাশৈলী সম্পর্কিত 'The Art of Medicine' প্রবন্ধের আরবী অনুবাদ। হুনাইন বিন ইসহাক ত্রিশ বছর বয়সে সেসময়ের প্রথিতযশা চিকিৎসক ও জ্ঞানপিপাসু পাঠক দাউদের জন্য প্রবন্ধটি অনুবাদ করেন এবং পরবর্তীতে আবু জাফর বিন মুসার (৭৮১-৮৪৮ খ্রি.) জন্য তা পুনঃঅনুবাদ করেন। অবশ্য তাঁর পূর্বে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি এটি সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন সার্জিয়াস আর-রাসী (মৃ. ৫৩৬ খ্রি.), ইবনে শাহদা আল-কারখী (মৃ. ৩০০ হি./৯১২ খ্রি.) এবং আইয়ুব আল-রাহাউয়ী (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রি.) উল্লেখযোগ্য।[৫৬৩]

গ্যালেন প্রবন্ধটি কেবল শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে লেখেননি। কারণ এ প্রবন্ধটি অধ্যয়নের উপকারিতা শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা চিকিৎসাবিজ্ঞানের পণ্ডিতদের জন্যও যথোপযুক্ত। প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্য হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত দিক সংক্ষেপে বর্ণনা করা, যা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের জন্যই উপকারী। শিক্ষার্থীদের সহজ পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমগ্র বিষয় উপলব্ধি করতে এটি সাহায্য করে এবং পরবর্তীতে বিশদভাবে আলোচিত প্রবন্ধ থেকে কোনো একটি অংশের ব্যাখ্যা, সারসংক্ষেপ এবং প্রমাণ জানার জন্য পুনরায় পাঠ করার সুযোগ করে দেয়। তবে শিক্ষকদের জন্য অন্যান্য বড় গ্রন্থ থেকে পঠিত ও অর্জিত জ্ঞানের সারসংক্ষেপ হিসেবে এটি সহায়ক গ্রন্থের ভূমিকা পালন করে। অতীব তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণে প্রাচীনকালে আলেকজান্দ্রিয়ায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ 'Book of Differencess'-এর আদলে আলোচ্য এ প্রবন্ধটি বিন্যস্ত করেছিলেন। তাঁরা এটিকে পাঁচটি প্রবন্ধে বিভক্ত করে 'For Learners' শিরোনামে একক গ্রন্থ হিসেবে শিক্ষার্থীদের জন্য উপস্থাপন করেন।[৫৬৪]

৪. كتاب فى النبض إلي طوثرن وإلى سائر المتعلمين

এটি শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে লেখা গ্যালেনের 'Pulse to Teuthras and the Rest of the Learners' শীর্ষক প্রবন্ধের আরবী অনুবাদ। প্রবন্ধটি লেখার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি বর্ণনা করা। এখানে তিনি 'Pulse' বা নাড়ি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস চালান।

---

৫৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩

৫৬৪. K. S. Heal, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation*, p. 12

প্রথমে নাড়ির প্রকারভেদগুলোর একটি তালিকা দেন; তবে তিনি সবগুলোর উল্লেখ না করে কেবল সেগুলোই উল্লেখ করেন যা শিক্ষার্থীরা বুঝতে সক্ষম। তারপর তিনি নাড়ি পরিবর্তনের কারণগুলো বর্ণনা করেন এবং পরিবর্তনের স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক ও প্রকৃতির বাইরের কারণগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন।[৫৬৫]

প্রবন্ধটি ইবনে সাহদা সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং এরপর হুনাইন বিন ইসহাক গ্রন্থপ্রেমিক সালমুওয়ীহ-এর জন্য আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে তিনি আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসার (৭৮১-৮৪৮ খ্রি.) জন্য এটি পুন:অনুবাদ করেন।[৫৬৬]

৫. كتاب إلى اغلوقن

এটি গ্যালেনের 'Treating Diseases to Glaucon' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটি রচনা সম্পর্কে জানা যায় যে, আলেকজান্দ্রিয়ার 'অ্যাগ্লোকিন' নামক একজন চিকিৎসক ও দার্শনিক গ্যালেনের চিকিৎসায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রোগের লক্ষণ বর্ণনা করে চিকিৎসা বিষয়ক একটি গ্রন্থ লিখতে অনুরোধ করলে তিনি এটি রচনা করেন। যেহেতু একজন চিকিৎসক রোগ শনাক্ত না করে তার যথাযোথ চিকিৎসা করতে পারেন না, তাই তিনি সেই লক্ষণগুলো শনাক্ত করে এগুলোর চিকিৎসা পদ্ধতি আলোচ্য গ্রন্থে উপস্থাপন করেন। গ্রন্থটি দুটি প্রবন্ধে বিভক্ত। প্রথম প্রবন্ধে তিনি জ্বরের লক্ষণ ও তার চিকিৎসা বর্ণনার পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে টিউমারের লক্ষণ ও চিকিৎসা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। হুনাইন প্রথমে এটি সিরীয় ভাষায় সালমুওয়ীহ-এর জন্য এবং পরবর্তীতে আরবী ভাষায় আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসার জন্য অনুবাদ করেন। তাঁর পূর্বে গ্রন্থটি সার্জিয়াস আর-রাসী (মৃ. ৫৩৬ খ্রি.) সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেননি।[৫৬৭]

---

৫৬৫. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

৫৬৬. K. S. Heal, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation*, ibid, p. 14

৫৬৭. ibid, pp. 14-16

৬. كتاب فى العظام

এটি গ্যালেনের 'Book of Bones' গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটিতে মানব দেহের প্রতিটি অস্থির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি একটি অস্থি কীভাবে অন্যান্য অস্থির সাথে যুক্ত তা শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রায়িত করা হয়েছে। অস্থিমজ্জা সম্পর্কিত বিখ্যাত এ গ্রন্থটি সার্জিয়াস আর-রাসী (মৃ. ৫৩৬ খ্রি.) সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং হুনাইন আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসার (৭৮১-৮৪৮ খ্রি.) জন্য সহজ-সরল ভাষায় এটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে তিনি গ্রন্থটি পুন:অনুবাদ করে ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.)-এর কাছে প্রেরণ করেন।[৫৬৮]

৭. كتاب فى العضل

এটি গ্যালেনের চিকিৎসামূলক প্রবন্ধ 'Muscles'-এর আরবী অনুবাদ। প্রবন্ধটিতে মানব শরীরে কতগুলো পেশী আছে? সেগুলো কোন কোন পেশী? প্রতিটি পেশী কোথায় শুরু ও শেষ হয় এবং প্রতিটি পেশীর কাজ কী? প্রভৃতি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিতগণ এ প্রবন্ধের সাথে গ্যালেনের লেখা 'Anotomy of Nerves, Anotomy of Veins and Anotomy of Arteries-প্রবন্ধগুলো একত্রিত করে 'Anotomy to Learners' শিরোনামে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। 'Muscles' প্রবন্ধটি হুনাইন বিন ইসহাকের পূর্বে আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুসার জন্য হুবাইশ বিন আল-হাসান আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।[৫৬৯]

৮. كتاب فى العصب

এটি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে লেখা গ্যালেনের 'Book of Nerves' গ্রন্থের অনুবাদ। এতে মস্তিষ্ক (Brain) এবং মেরুদণ্ড (Spinal Cord) থেকে কত জোড়া স্নায়ু (Nerves) উৎপন্ন হয় এবং সেগুলো কোন কোন স্নায়ু? প্রতিটি স্নায়ু কীভাবে ও কোথায় বিভক্ত হয়? আর এগুলো কী কাজ করে? প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।[৫৭০]

---

৫৬৮. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

৫৬৯. K. S. Heal, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation*, ibid, p. 18

৫৭০. ibid, p.18

৯. كتاب فى العروق

এটি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে গ্যালেনের 'Book of Veins' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটিতে লেখক স্পন্দনশীল এবং স্পন্দনহীন রক্তনালীগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। যকৃত থেকে কতগুলো রক্তনালীর উৎপত্তি হয়, সেগুলো কী কী এবং তাদের প্রত্যেকটি কীভাবে ও কোথায় বিভক্ত হয় ? ইত্যাদি বিষয় গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে।[৫৭১]

১০. كتاب فى ألاسطقسات على رأى ابقراط

'The Elements according to Hippocrates' শিরোনামে গ্যালেনের এ গ্রন্থটি হুনাইন كتاب فى ألاسطقسات على رأى ابقراط নামে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে যে, উৎপত্তি ও বিনাশের অধীন সকল বস্তু (অর্থাৎ পশু ও উদ্ভিদের দেহ এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে উৎপন্ন বস্তুসমূহ) কেবল চারটি উপাদান দ্বারা গঠিত; মাটি, পানি, বায়ু এবং অগ্নি; এগুলো হলো মানবদেহের প্রাথমিক ও দূরবর্তী উপাদান। পক্ষান্তরে মানুষ ও জন্ম নেয়া অন্যান্য প্রাণীর দেহ গঠনকারী প্রাথমিক ও নিকটবর্তী উপাদান হলো চারটি রস; রক্ত, শ্লেষ্মা এবং দুই প্রকার পিত্তরস।[৫৭২]

সার্জিয়াস আর-রাসী (মৃ. ৫৩৬ খ্রি.) সিরীয় ভাষায় এটি অনুবাদ করেন। কিন্তু তিনি গ্রন্থটির সঠিক অর্থ ভালোভাবে উপলব্ধি করতে না পারায় অর্থ বিকৃত করে ফেলেন। পরবর্তীতে হুনাইন অত্যন্ত যত্নসহকারে বখতিশু ইবনে জিব্রিলের (মৃ. ২৫৬/৮৭০ খ্রি.) জন্য গ্রন্থটি সিরীয় ভাষায় এবং আবু আল-হাসান আলী ইবনে ইয়াহিয়ার জন্য আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৫৭৩]

১১. كتاب فى المزاج

গ্যালেন রচিত 'Mixtures'-এর আরবী অনূদিত كتاب فى المزاج গ্রন্থটিতে মোট তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথম দুটি প্রবন্ধে তিনি প্রাণীর দেহের বিভিন্ন মিশ্রণ এবং তৃতীয় প্রবন্ধে ঔষধের বিভিন্ন মিশ্রণ সর্ম্পকে আলোচনাপূর্বক সেগুলো কীভাবে পরীক্ষা ও শনাক্ত করতে হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। হুনাইন

---

৫৭১. ibid, p. 20

৫৭২. ibid, p. 20; Dimitri Gutas, *Greek Thought, Arabic Culture* (London: Routledge, Rep. 1999) .p. 147-148.

৫৭৩. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

প্রথমে এটি সিরীয় ভাষায় এবং পরবর্তীতে সিন্ধুর গভর্নর ইসহাক ইবনে সুলায়মানের (মৃ. ২০০ হি.) জন্য আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৫৭৪]

১২. كتاب فى القوى الطبيعية

এটি গ্যালেনের চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ 'Faculties'-এর আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। হুনাইন বিন ইসহাক মাত্র সতেরো বছর বয়সে জিব্রিল ইবনে বখতিশুর জন্য প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে যে, মানব দেহ তিনটি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়; প্রজনন, বৃদ্ধি এবং পুষ্টির অসুষঙ্গ। প্রজনন অসুষঙ্গটি দুটি অসুষঙ্গ দ্বারা গঠিত; একটি যা শুক্রাণুকে রূপান্তরিত ও বিকশিত করে সমদলীয় দেহাঙ্গ গঠন করে এবং অন্যটি প্রতিটি যৌগিক অঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় আকার, অবস্থান, পরিমাণ ও সংখ্যা অনুযায়ী এ অঙ্গগুলোকে একত্রিত করে। পুষ্টি অসুষঙ্গ চারটি অসুষঙ্গ দ্বারা পরিচালিত হয়; আকর্ষণশক্তি, ধারণশক্তি, রূপান্তরশক্তি এবং নিষ্কাশনশক্তি।[৫৭৫]

১৩. كتاب فى العلل والأعراض

এটি গ্যালেনের ছয় খণ্ডে বিভক্ত 'Causes' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের শিরোনাম ছিল 'Different Kinds of Diseases' (রোগের শ্রেণিবিভাগ) যেখানে তিনি রোগের কতগুলো বিভাগ রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন এবং প্রতিটি বিভাগকে তার প্রকারভেদে বিভক্ত করেছেন। তিনি রোগের কারণ বিষয়ক দ্বিতীয় খণ্ডটির নাম দিয়েছিলেন 'Causes of Diseases' (রোগের কারণ ও লক্ষণ)। এ খণ্ডে তিনি রোগের কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তৃতীয় খণ্ডের শিরোনাম হলো 'Different Kinds of Symptoms' (উপসর্গের শ্রেণিবিভাগ)। এ খণ্ডে রোগের উপসর্গসমূহ আলোচিত হয়েছে। অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর শিরোনাম হলো 'Causes of Symptoms' (উপসর্গের কারণসমূহ)। এ খণ্ডগুলোতে ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি উপসর্গের সক্রিয় কারণসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।[৫৭৬]

---

৫৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮
৫৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৫৭৬ K. S. Heal, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation,* ibid, pp. 24-26

বিখ্যাত এ গ্রন্থটি হুনাইন বিন ইসহাক তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বখতিশু বিন জিবরিলের (মৃ. ২৫৬/৮৭০ খ্রি.) জন্য সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ছাড়াও গ্রন্থটি সার্জিয়াস আর-রাসী (মৃ. ৫৩৬ খ্রি.) সিরীয় ভাষায় দুইবার এবং হুবাইশ বিন আল-হাসান (মৃ. ৯১৩ খ্রি.) আলী ইবনে ইয়াহিয়ার (৮৫৫-৯১২ খ্রি.) জন্য আরবী ভাষায় একবার অনুবাদ করেন।[৫৭৭]

١٨. كتاب فى تعرف علل الأعضاء الباطنة

এটি গ্যালেনের আক্রান্ত অঙ্গের রোগ শনাক্তকরণ বিষয়ক ছয় খণ্ডের 'Diagnosis of Affected Places' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য হলো-রোগাক্রান্ত হলে অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থা কী কী লক্ষণ দ্বারা অনুমান করা যায় এবং কী কী রোগ হয় ?-তা বর্ণনা করা। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের কিছু অংশে তিনি রোগ শনাক্তকরণের সাধারণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনার পাশাপাশি প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক আর্কিজেনেসের অনুসৃত রোগ শনাক্তকরণ পদ্ধতির ভুল-ত্রুটি ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর দ্বিতীয় খণ্ডের বাকি অংশে এবং এর পরবর্তী চারটি খণ্ডে তিনি ক্রমান্বয়ে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রতঙ্গের প্রতিটি রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। মানব-অঙ্গ অসুস্থ হলে তার অবস্থা কী কী লক্ষণ দ্বারা অনুমান ও শনাক্ত করা যায় ? প্রভৃত বিষয় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেছেন।[৫৭৮]

সার্জিয়াস আর-রাসী (মৃ. ৫৩৬ খ্রি.) গ্রন্থটি দুইবার অনুবাদ করেন; প্রথমবার কারখ জুদ্দানের বিশপ থিওডোরের (Theodore) জন্য এবং পরবর্তীতে এলিশা (Elisha) নামক এক ব্যক্তির জন্য। বখতিশু বিন জিবরিল (মৃ. ২৫৬/৮৭০ খ্রি.) হুনাইন বিন ইসহাককে এ গ্রন্থটি পর্যালোচনা এবং এর বাদ পড়া অংশগুলো সংশোধনের পরামর্শ দিলে তিনি সহজ-সরল ভাষায় এটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত এ গ্রন্থটি নিজের কাছেই অসম্পূর্ণ মনে হলে তিনি এটি পুনরায় অনুবাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায়। অবশেষে আল-তাইফুরী নামে পরিচিত ইসরাইল ইবনে জাকারিয়া তাঁকে পুনরায় অনুবাদ করতে বললে হুবাইশ ইবনে আল-হাসানের মাধ্যমে (মৃ. ৯১৩ খ্রি.) এটি আরবী ভাষায় পুন:অনুবাদ করান।[৫৭৯]

---

৫৭৭ ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

৫৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৫৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; K. S. Heal, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation,* ibid, pp. 26-27

১৫. كتاب فى النبض الكبير

গ্যালেন ধমনীর স্পন্দন সম্পর্কিত 'Large Book of the Pulse' শীর্ষক গ্রন্থটিকে চার খণ্ডে বিভক্ত করেন, যার প্রতিটিতে চারটি করে মোট ১৬টি প্রবন্ধ রয়েছে। হুনাইন প্রথম খণ্ডের শিরোনাম দেন 'أصناف النبض' (ধমনীর প্রকারভেদ)। এ খণ্ডে তিনি ধমনীর প্রধান প্রকারভেদ, এগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং কীভাবে প্রতিটি প্রকারভেদ বিভিন্ন রূপে বিভক্ত করা যায়? এসমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করে পরিশেষে একটি পূর্ণাঙ্গ সারসংক্ষেপ প্রদান করেন। দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোনাম ' تعرف النبض ' (ধমনী শনাক্তকরণ), যেখানে তিনি স্পর্শের মাধ্যমে কীভাবে শিরার প্রতিটি ধীর ও দ্রুত স্পন্দন শনাক্ত করা যায় তা বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় খণ্ডের শিরোনাম দেন 'أسباب النبض ' (ধমনীজনিত সমস্যার কারণসমূহ) এ খণ্ডে তিনি শক্তিশালী ও দূর্বল ধমনীর বর্ণনাপূর্বক প্রত্যেক প্রকার ধমনী অসুস্থ হওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ডের শিরোনাম 'تقدمة المعرفة من النبض '(ধমনীর পূর্বাভাষ), যেখানে তিনি বিভিন্ন প্রকারের ধমনী-অর্থাৎ বড় ও ছোট, দ্রুত ও ধীর এবং অন্যান্য ধমনী থেকে কীভাবে পূর্বজ্ঞান আহরণ করা হয় ? তা বর্ণনা করেছেন।[৫৮০] হুনাইন বিন ইসহাক, ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহর (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) জন্য সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সিরীয় ভাষায় অত্যন্ত যত্নসহকারে অনুবাদ করেন। তবে পরবর্তীতে তিনি আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসার (৭৮১-৮৪৮ খ্রি.) জন্য গ্রন্থটির কেবল প্রথম খণ্ড আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং অবশিষ্ট খণ্ডসমূহ অনুবাদের দায়িত্ব হুবাইশ বিন আল-হাসানকে (মৃ. ৯১৩ খ্রি.) প্রদান করেন। হুবাইশ তাঁর অনুবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করে অবশিষ্ট খণ্ডসমূহ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৫৮১]

১৬. كتاب فى أصناف الحميات

'Different Kinds of Fevers' গ্রন্থটিতে গ্যালেন দুই খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রথম খণ্ডে দুই প্রকার জ্বরের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণসমূহ বর্ণনা করেছেন; প্রথমটি নিউমাতে (pneuma) উৎপন্ন হয় এবং অন্যটি শরীরের প্রাথমিক অংশে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি তৃতীয় প্রকার জ্বরের বর্ণনা দিয়েছেন, যা দেহরস পচনশীল হলে উৎপন্ন হয়। হুনাইন বিন ইসহাক ছোটবেলায় জিব্রিল ইবনে বখতিশুর (মৃ.

---

৫৮০. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩

৫৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

২১২/৮২৮ খ্রি.) জন্য এটি প্রথম অনুবাদ করেন। সিরীয় ভাষায় অনূদিত গ্যালেনের অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে এটিই তাঁর প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। পরিণত বয়সে উপনিত হলে অনুবাদকরণের সময় গ্রন্থটির ছুটে যাওয়া কিছু অংশ খুঁজে পান। পরবর্তীতে উক্ত গ্রন্থটির অনুলিপি স্বীয় পুত্রের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি এটি যত্নসহকারে আরবী ভাষায় পুন:অনুবাদ করেন এবং আবুল হাসান আহমদ ইবনে মুসার জন্যও একটি সংখ্যা প্রেরণ করেন।[৫৮২]

১৭. كتاب البحران

গ্যালেন রচিত তিন খণ্ডে বিভক্ত 'Crisis' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটিতে মানব জীবনে কোনো সংকটাবস্থা ঘটবে কি না, যদি ঘটে, তবে কখন ও কীভাবে তা ঘটবে এবং ঘটলে তার পরিণতি কী হবে? এসব বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি কীভাবে অগ্রসর হতে পারে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি সার্জিয়াস আর-রাসী (মৃ. ৫৩৬ খ্রি.) কর্তৃক প্রথম সিরীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং হুনাইন বিন ইসহাক, ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) এবং আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুসার (৭৮১-৮৪৮ খ্রি.) জন্য উল্লেখযোগ্য সংশোধনসহ এটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৫৮৩]

১৮. كتاب فى أيام البحران : গ্যালেনের 'Critical Days' নামক গ্রন্থের অনুবাদ। এটি হুনাইন বিন ইসহাক সিরীয় ভাষা থেকে আরবী ভাষায় সংশোধনমূলক অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি সংকটাবস্থার দিনগুলোর শক্তির তারতম্য, কোন দিনগুলোতে সংকট দেখা দেয়, কোনগুলোতে দেখা দেয় না ? সংঘটিত সংকটগুলোর মধ্যে কোনগুলো অনুকূল এবং কোনগুলো প্রতিকূল ? এগুলো-সহ আরো অনেক বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ডে সংকটাপন্ন দিনগুলোতে শক্তির তারতম্যের কারণসমূহ আলোচনা করেছেন।[৫৮৪]

১৯. كتاب فى حيلة البرء

এটি গ্যালেনের চৌদ্দটি প্রবন্ধ সম্বলিত গ্রন্থ 'Therapeutic Method'-এর আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটিতে উদাহরণ সহকারে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম ছয়টি প্রবন্ধে তিনি একই রকম উপসর্গযুক্ত রোগের চিকিৎসা এবং সপ্তম প্রবন্ধে যৌগিক অঙ্গের রোগের

---

৫৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫; ২১; K. S. Heal, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation,* ibid, p. 32
৫৮৩. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৫৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

চিকিৎসার বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী অষ্টম প্রবন্ধে নিউমাতে (pneuma) উৎপন্ন এমন ক্ষণস্থায়ী জ্বরের চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর নবম প্রবন্ধে গ্যালেন দীর্ঘস্থায়ী জ্বরের, দশম প্রবন্ধে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গকে প্রভাবিত করে এমন জ্বর এবং একাদশ ও দ্বাদশ প্রবন্ধে দেহরসের পচনজনিত জ্বরের চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৫৮৫] সার্জিয়াস আর-রাসী (মৃ. ৫৩৬ খ্রি.) এ গ্রন্থটি সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তবে তার এ অনুবাদে ভুল-ত্রুটি থাকায় সালমুওয়ীহ, হুনাইন বিন ইসহাককে এটি সংশোধন করতে বললে তিনি দীর্ঘ সময় গ্রীক ও সিরীয় সংস্করণদ্বয় অনুশীলনের পর এটি আরবী ভাষায় পুন:অনুবাদ করেন।[৫৮৬]

২০. كتاب في علاج التشريح

এটি গ্যালেনের 'Anatomical Procedures' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। এ গ্রন্থটি সিরীয় অনুবাদক আইয়ুব আল-রাহাওয়ী (মৃ. ৮৩৫ খ্রি.) জিব্রিল ইবনে বখতিশুর (মৃ. ২১২/৮২৮ খ্রি.) জন্য সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন এবং হুনাইন বিন ইসহাক, ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহর জন্য অত্যন্ত যত্ন সহকারে এটি সংশোধন করে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি মোট পনেরোটি প্রবন্ধের আলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে; যার প্রথম প্রবন্ধে হাতের পেশী ও লিগামেন্ট (অস্থিবন্ধনী/টিস্যু), দ্বিতীয় প্রবন্ধে পায়ের পেশী ও লিগামেন্ট, তৃতীয় প্রবন্ধে হাত ও পায়ের স্নায়ু ও শিরা, চতুর্থ প্রবন্ধে গাল, ঠোঁট, চোয়াল, মাথা, ঘাড় এবং কাঁধ সঞ্চালনকারী পেশী, পঞ্চম প্রবন্ধে বুক, পেট, কোমর এবং মেরুদণ্ডের পেশী, ষষ্ঠ প্রবন্ধে পরিপাক অঙ্গসমূহ; যথা পাকস্থলী, যকৃত, প্লীহা, বৃক্ক, মূত্রাশয় এবং এ জাতীয় অঙ্গসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থটির সপ্তম ও অষ্টম প্রবন্ধে তিনি শ্বসন অঙ্গের বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে সপ্তম প্রবন্ধে প্রাণীর মৃত্যুর পর এবং জীবিত থাকা অবস্থায় হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং ফুসফুসীয় শিরার ব্যবচ্ছেদে যা দেখা যায়-এসব বিষয়ে আলোচনা আছে। অষ্টম প্রবন্ধে তিনি বক্ষের ব্যবচ্ছেদে যা দেখা যায় তার বিবরণ, নবম প্রবন্ধে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের বিবরণ, দশম প্রবন্ধে চোখ, জিহ্বা, খাদ্যনালী এবং এ অঙ্গগুলোর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গসমূহের, একাদশ প্রবন্ধে স্বরযন্ত্রের ভেতরে যা আছে তার বিবরণ, দ্বাদশ প্রবন্ধে প্রজনন অঙ্গসমূহের, ত্রয়োদশ প্রবন্ধে স্পন্দনশীল ও অস্পন্দনশীল শিরাসমূহের, চতুর্দশ

---

৫৮৫. K. S. Heal, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation,* ibid, pp. 35-36

৫৮৬. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

প্রবন্ধে মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন স্নায়ুসমূহের এবং সর্বশেষ পঞ্চদশ প্রবন্ধে মেরুরজ্জু থেকে উৎপন্ন স্নায়ুরসমূহের বিবরণ প্রদান করেন।[৫৮৭]

২১. كتاب فى اختصار كتاب لوقس فى التشريح

মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভীদের দেহের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন, অঙ্গ-প্রতঙ্গের অবস্থান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে আলোচিত 'Epitome of Lycus's Anatomy' শীর্ষক এ গ্রন্থটিতে দুটি প্রবন্ধে রয়েছে। গ্রীক ভাষা থেকে এটি আইয়ুব আল-রাহাউয়ী (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রি.) সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু তার অনূদিত গ্রন্থটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে হুনাইন বিন ইসহাক, ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহকে দিয়ে সিরীয় ভাষায় পুন:অনুবাদ করান এবং পরবর্তীতে তাঁর শীর্ষ হুবাইশ বিন আল-হাসান, আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুসার জন্য এটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৫৮৮]

২২. كتاب فى علم ابقراط بالتشريح

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্লেটোবাদী গ্রীক দার্শনিক বোয়েথাস (فويثس /Boethos) হিপোক্রেটিসের (৪৬০-৩৭০ খ্রি. পূ.) অঙ্গসংস্থানবিদ্যা বিষয়ের পাঁচটি প্রবন্ধ সন্নিবেশন করে 'Hippocrates's Knowledge of Anatomy' শিরোনামে গ্রন্থটি রচনা করেন। হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) গ্রন্থটির কিছু অংশ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থটি হুবাইশ বিন আল-হাসান আরবী ভাষায় এবং আইয়ুব আল-রাহাউয়ী সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।[৫৮৯]

২৩. كتاب فى علم ارسطراطس فى التشريح

এটি 'Aristotle's Knowledge of Anatomy' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটিতে দার্শনিক বোয়েথাস, অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.) অঙ্গসংস্থান সম্পর্কিত মতামত আলোচনাপূর্বক তিনি কোন বিষয়ে সঠিক ও কোন বিষয়ে ভুল ছিলেন তা বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থটি হুনাইন বিন ইসহাক

---

৫৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯ ; K. S. Heal, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation,* ibid, pp. 40-42
৫৮৮. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
৫৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

গ্যালেনের অঙ্গসংস্থানবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে হুবাইশ বিন আল-হাসান, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসার জন্য এটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৫৯০]

২৪. كتاب فى تشريح الرحم

এটি গ্যালেনের 'Anatomy of the Womb' প্রবন্ধের আরবী অনুবাদ। তিনি যুবক বয়ষে একজন ধাত্রীর জন্য ছোট এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। এতে জঠর গঠন এবং গর্ভাবস্থায় এর ভেতরে কী কী উৎপন্ন হয় ? সেসম্পর্কে প্রয়োজনীয় সবকিছু আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি হুনাইন ও আইয়ুব আল-রাহাউয়ী (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রি.) সিরীয় ভাষায় এবং হুবাইশ বিন আল-হাসান (মৃ. ৯১৩ খ্রি.) আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসার জন্য আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৫৯১]

২৫. كتاب فى تشريح آلات الصوت

এটি স্বরযন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধ 'Anatomy of the Organs of the Voice'-এর আরবী অনুবাদ। প্রবন্ধটি হুনাইন বিন ইসহাক, ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.)-এর পরামর্শে সংশোধনমূলক অনুবাদ করেন। এ প্রবন্ধের রচয়িতা সম্পর্কে হুনাইন ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, ভুলবশত অনেকে এটি গ্যালেনের লিখিত প্রবন্ধ মনে করেন; কিন্তু এটি গ্যালেনের বা অন্য কোনো প্রাচীন পণ্ডিতের লেখা নয়, বরং এটি গ্যালেনের কোনো এক রচনা থেকে তথ্য নিয়ে একজন আধুনিক পণ্ডিত এটি সংকলন করেন।[৫৯২]

২৬. كتاب فى تشريح العين

এটি গ্যালেনের 'Anatomy of the Eys' প্রবন্ধের অনুবাদ। আইয়ুব আল-রাহাউয়ী (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রি.) সিরীয় ভাষায় প্রবন্ধটি অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে হুনাইন বিন ইসহাক, ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ-এর সহায়তায় এটির সারসংক্ষেপ তৈরি করে আরবী ভাষায় সংশোধনমূলক অনুবাদ করেন। তাঁর মতে এ প্রবন্ধটিও গ্যালেনের নামে আরোপিত করা হলেও মূলত এটি গ্রীক দার্শনিক রুফাস/ Rufus (মৃ. ১০১ খ্রি.) বা তাঁর অধ্যস্তন কোনো ব্যক্তি রচনা করেছিলেন।[৫৯৩]

---

৫৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২
৫৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩
৫৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩; Dimitri Gutas, *Greek Thought, Arabic Culture* (London: Routledge, Rep. 1999) .p. 131
৫৯৩. K. S. Heal, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation,* ibid, p. 50

২৭. كتاب جالينوس فى حركة الصدر والرئة

বুক এবং ফুসফুসের নড়াচড়া সম্পর্কৃত 'Motion of the Chest and Lungs' নামক এ গ্রন্থটিতে মোট তিনটি প্রবন্ধ রয়েছে। গ্যালেন যুবক বয়সে প্রথমবার রোম ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে তাঁর শিক্ষক ভ্যালুপ্সের (Pelops) অধীনে অধ্যয়ন করার কারণে কয়েক বৎসর স্মেরনিয়ায় (Smyrna) অবস্থান করেন। এসময় তাঁর কিছু সহপাঠী উল্লেখিত বিষয়ে গ্রন্থ লিখতে অনুরোধ করলে তিনি প্রথম দুটি প্রবন্ধ তাঁর শিক্ষক ভ্যালুপ্সের কাছ থেকে যা শিখেছিলেন সে আলোকে লিপিবদ্ধ করেন। তৃতীয় প্রবন্ধে তিনি নিজে যা আবিষ্কার করেছিলেন তার বর্ণনা করেন। আলোচ্য গ্রন্থটি ইস্তাফান ইবনে বাসিল (মৃ. ৮৮৮ খ্রি.) আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসার জন্য আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তারপর আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসা, হুনাইন বিন ইসহাককে উক্ত অনূদিত গ্রন্থের বাদ পড়া অংশগুলো সংশোধন করতে বলায় তিনি এটির সংশোধনমূলক অনুবাদ করেন। অতঃপর ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.) হুবাইশ বিন আল-হাসানকে তাঁর জন্য এটি আরবী ভাষা থেকে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করতে বলেন এবং তিনি তা-ই করেন।[৫৯৪]

২৮. كتاب فى علل التنفس

শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণ সম্পর্কিত 'Causing of Breathing' গ্রন্থটি গ্যালেন রোম শহরে তাঁর প্রথম ভ্রমণের সময় গ্রীক পণ্ডিত বোয়েথাসের জন্য রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে দেহের কোন অঙ্গগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটায় এবং কোনগুলো বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তা ঘটায়। আইয়ুব আল-রাহাউয়ী (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রি.) সিরীয় দুর্বোধ্য ভাষায় এটি অনুবাদ করেন। অতঃপর আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসা (৭৮১-৮৪৮ খ্রি.) উক্ত গ্রন্থটি নিয়ে ইস্তাফান ইবনে বাসিলকে (মৃ. ৮৮৮ খ্রি.) হুনাইন বিন ইসহাকের সাথে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দেন। হুনাইন সিরীয় অনুবাদটির অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট করে সহজ-সরল আরবী ভাষায় পুন:অনুবাদ করেন।[৫৯৫]

২৯. كتاب جالينوس فى الصوت

এটি গ্রীক পন্ডিত গ্যালেনের শব্দতন্ত্র বিষয়ক 'Voice' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটির মোট চারটি প্রবন্ধ আলোচনা করা হয়েছে-শব্দের পরিচয়, স্বরূপ, উপাদান, কোন কোন অঙ্গ এর উৎপত্তিতে সাহায্য

---

৫৯৪. ibid, pp. 50-52
৫৯৫. ibid, p. 52

করে এবং উৎপন্ন শব্দসমূহের মধ্যে পার্থক্য কী ? হুনাইন বিন ইসহাক, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক আল-ওয়াজিরের (মৃ. ২২৩ হি.) জন্য এটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির সারসংক্ষেপ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার কারণে আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসা সংস্করণটি পছন্দ করেন এবং তিনি এটির অনুলিপি তৈরি করান। পরবর্তীতে ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ, হুবাইশ ইবনে আল-হাসানের মাধ্যমে এটি আরবী ভাষা থেকে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করান।[৫৯৬]

সাহিত্যিক মূল্যায়ন

হুনাইন বিন ইসহাকের (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) অনুবাদকর্মকে সাহিত্যিকগণ বিভিন্নভাবে মূল্যায়ন করেছেন। যেমন লন্ডনের ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক বিখ্যাত গবেষক ও অনুবাদক ড. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান (জ. ১৩৭৯ হি.) বলেন, "হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন যারা তাঁকে একজন ডাক্তার হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল এবং এর ওপর অনেক গ্রন্থ রেখে গেছেন। অনুবাদে তিনি আমার চেয়েও দক্ষ অনুবাদক ছিলেন এবং তৎকালীন সময়ে সাহিত্যের বিশাল একটি অংশ তিনি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।"[৫৯৭]

ড. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান আরো বলেন, "একজন অনুবাদক হিসেবে হুনাইন বিন ইসহাকের খ্যাতি একজন ডাক্তার হিসেবে তাঁর খ্যাতিকে ছাড়িয়ে গেছে। অবশ্য কিছু গবেষক বিশ্বাস করেন যে, অনুবাদকরণই ছিল তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য প্রথম প্রেরণা।"[৫৯৮] তাঁর সাহিত্যিকর্ম পর্যালোচনা করে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইবনে আল-ইব্‌রী (১০৮২-১১৫৪ হি.) এবং আল-কিফাতী (৫৬৮-৬৪৬ হি./১১৭২-১২৪৮ খ্রি.) বলেছেন, "তিনি হলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎস এবং জ্ঞানের আঁধার।"[৫৯৯]

হুনাইন বিন ইসহাক অনুবাদক হিসেবে কতটা দক্ষ ও প্রাজ্ঞ ছিলেন, তা একটি প্রতিবেদন থেকেই প্রমাণিত হয়। মুসা বিন শাকিরের পুত্রদের নিকট কর্মরত অবস্থায় তিনিসহ অন্যান্য অনুবাদকগণ মাসিক

---

৫৯৬. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৫৯৭. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আদ-দিবয়্যান, *হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাতুন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
৫৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৫৯৯. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, ibid, p, 313

৫০০ দীনার (প্রায় ২৫০ ইউরো) সম্মানী লাভ করতেন এবং খলিফা আল-মামুন তাঁকে পারিশ্রমিক হিসেবে অনূদিত গ্রন্থের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতেন।[৬০০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.)

তাঁর পূর্ণ নাম আবুস সাক্বার ইসমাঈল বিন বুলবুল কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী। তবে তিনি কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী নামেই পরিচিত ছিলেন। পশ্চিমাদের নিকট 'কন্সটেবুলাস' (Constabulus) নামে পরিচিত বিখ্যাত এ সাহিত্যিক ৮২০ খ্রিস্টাব্দে লেবাননের 'বা'লাবাক্কা' শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৬০১] তিনি আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) এবং সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। এ তিনজনই তাঁদের সময়ে দর্শন এবং বিজ্ঞান বিষয়ের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন।[৬০২] জন্মগতভাবে তিনি খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিলেন।[৬০৩] প্রখ্যাত এ চিকিৎসক ও দার্শনিক জ্ঞানার্জনের জন্য বাইজেন্টাইন ভ্রমণ করেন। তাছাড়া গ্রীক ভাষার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ খুঁজে সেগুলো আরবী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য তাঁকে ইরাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং বাগদাদে আফ্রিকান পাণ্ডুলিপি অনুবাদের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।[৬০৪]

প্রথিতযশা এ পণ্ডিত গ্রীক, সুরিয়ানী এবং আরবী ভাষায় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। গ্রীক থেকে আরবীতে বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি অনেক অনূদিত গ্রন্থের ভুল সংশোধন করেন।[৬০৫] তিনি আর্মেনিয়ায়

---

৬০০. ibid, p, 313

৬০১. ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১০৬

৬০২. আবু দাউদ সুলাইমান বিন হাসান আল-আন্দালুসী (ইবন জুলজাল), *তব্কাতুল আতিব্বাউ ওয়াল হুকামাউ* (কায়রো: দারুল কুতুবুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ৭৬

৬০৩. ড. হারবী আব্বাস আতিতু মাহমুদ ও ড. হাস্সান হাল্লাক, *আল-উলুমু ইন্দাল আরাব উসুলুহা ওয়া মালামিহুহাল হাদারিয়্যাহ* (বৈরুত: দারুন নাহদাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৫৯

৬০৪. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬ এবং ৪১১

৬০৫. জুরজি যায়দান, *তারিখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১; ড. হারবী আব্বাস আতিতু মাহমুদ ও ড. হাস্সান হাল্লাক, *আল-উলুমু ইন্দাল আরাব উসুলুহা ওয়া মালামিহুহাল হাদারিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬০; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১১

এক রাজার রাজসভায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৩০০ হি./৯২০ খ্রিস্টাব্দে আর্মেনিয়াতে মৃত্যুবরণ করেন।[৬০৬]

অনুবাদ সাহিত্যে অবদান

কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.) একজন দক্ষ অনুবাদক ছিলেন। গ্রীক ও সুরিয়ানী ভাষার অনেক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করার পাশাপাশি পূর্বে অনূদিত অনেক গ্রন্থ সংশোধন করে পুন:অনুবাদ করেন।[৬০৭] তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-[৬০৮]

১. كتاب الأصول

এটি ইউক্লিড্‌স-এর 'Elements' গ্রন্থের আরবী আরবী অনুবাদ। কুসতা বিন লাওকা ছাড়াও গ্রন্থটি সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.) আরবী ভাষায় দু'বার অনুবাদ করেন। প্রথম অনুবাদে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় দ্বিতীয়বার এটি পরিমার্জিত অনুবাদ করেন। তাছাড়া গ্রন্থটির চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায় দু'টি তিনি ব্যাখা করে আলোচ্য বিষয়গুলো স্পষ্ট করে তুলেন।[৬০৯] গ্রন্থটি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিন মাতার দুইবার অনুবাদ করেন; একবার খলিফা হারুন-অর-রশিদের নির্দেশে এবং দ্বিতীয়বার খলিফা আল মামুনের নির্দেশে।[৬১০]

২. أرسطو عن النوم والأحلام وعن طول العمر

এটি অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.)-এর 'Parva Naturalia' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। ঘুম, স্বপ্ন ও দীর্ঘায়ু সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা হয়েছে।

---

৬০৬. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১; ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৬০৭. জুরজী যায়দান, *তারিখুদ তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

৬০৮. ড. হারবী আব্বাস আতিতু মাহমুদ ও ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *আল-উলুমু ইন্দাল আরাব উসুলুহা ওয়া মালামিহুহাল হ*, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৫৯; কার্ল ব্রুকলমান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০৪; ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭; কার্ল ব্রুকলমান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০৪

৬০৯. আল-কিফাতী, *তারিখুল হুকামা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৬১০. Philip K Hitti, *History of the Arabs*, ibid, pp. 315-316

৩. مسائل لثاوفرسطش

গ্রন্থটি গ্রীক দার্শনিক থিওফ্রাস্ট/Theophrast (৩৭১-২৮৭ খ্রি.পূ.) এর গ্রন্থের অনুবাদ। মানবজীবন ও প্রাণীজগতের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় প্রশ্নোত্তরাকারে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৪. فلوطرخس

প্রাকৃতিক দর্শন এবং এর অনুশীলন বিষয়ে দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিক প্লুটার্ক/Plutarch (৫০ খ্রি. পূ.-১২০ খ্রি.)-এর গ্রন্থের অনুবাদ।

৫. كتاب المطالع لأبسقلاوس

গ্রীক গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ হাইপসিকেল/Hypsicles (১৯০-১২০ খ্রি. পূ.)-এর গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটি আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) পরবর্তীতে পরিমার্জিত অনুবাদ করেন।

৬. كتاب الأكر الذيل الذي ألحقه أبسقلاوس بكتاب الأصول لأقليدس

গ্রীক গণিতবিদ থিওডোসিয়াস/Theodosius (৩৪৭-৩৯৫ খ্রি.)-এর ত্রিকোণমিতি সম্পর্কিত গ্রন্থ ‘Sphaerica’ এর অনুবাদ। কুসতা বিন লাওকা আল-বা’লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.) গ্রন্থটির তৃতীয় প্রবন্ধের পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত খলিফা আল-মু’তাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)-এর নির্দেশে অনুবাদ করেন এবং অন্য একজন অনুবাদক অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করেন। পরবর্তীতে সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.) গ্রন্থটি সংশোধনমূলক অনুবাদ করেন।[৬১১]

৭. كتاب الأيام والليل لثيودوسيوس

গ্রীক গণিতবিদ থিওডোসিয়াস/Theodosius-এর দিবা-রাত্রি সম্পর্কিত গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটি আবু জা’ফর মুহাম্মাদ বিন আলী হাসান আত-তুসীর (৩৪৭-৩৯৫ খ্রি.) সংশোধনমূলক অনুবাদের পূর্বেই কুসতা বিন লাওকা আল-বা’লাবাক্কী (৮২০-৮৯৯ খ্রি.) নিজেই এটির পুন:অনুবাদ করেন।

৮. كتاب شيل الأثقال لإيرن الإسكندرى

প্রকৌশল বিষয়ক এ গ্রন্থটি প্রাচ্যবিদ কারাদে ফু (১৮৬৭-১৯৫৩ খ্রি.) গ্রন্থটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

৬১১. কার্ল ব্রুকলমান, *তারিখুল আদাবুল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৯. كتاب الطلوع والغروب لأوطولوقس

এটি প্রাচীন গ্রীক গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী অটোলিকাস/Autolycus (৩৬০-২৯০ খ্রি.পূ.) রচিত 'On Risins and Settings' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটিতে জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহের পাশাপাশি কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী অনূদিত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো আব্বাসী যুগের আরবী অনুবাদ সাহিত্যকে নতুন মাত্রা প্রদান করেছে।

كتاب المساكن لثيودوسيوس ، فهرست مصنفات لجالينوس ، كتاب في الفلاحة اليونانية أو الرومية، أصول الهندسة ، الكون والفساد ، أسرار الفلاسفة وشرح الإسكندر.

সাহিত্যিক মূল্যায়ন

কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কীর সাহিত্যিক দক্ষতা প্রসঙ্গে সিরীয় ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক আবুল ফারাজ্ আল-মালাত্বী (১২২৬-১২৮৬ খ্রি.) বলেন-[৬১২]

لو قلت حقًا لقلت: إنَّه أفضل من صنف كتابًا، بما احتوى عليه من العلوم والفضائل وما رزق من الاختصار للألفاظ وجمع المعاني.

অর্থাৎ "আমি যদি সত্য কথা বলতে চাই, তাহলে বলব-তিনি যেকোনো গ্রন্থেরই শ্রেষ্ঠ লেখক, কারণ তাঁর রচনায় জ্ঞানের গভীরতা ও গুণাবলির বিস্তৃতি যেমন অনন্য, তেমনি প্রকাশভঙ্গির সংক্ষিপ্ততা এবং ভাবার্থের ব্যাপকতাও অসাধারণ।"

তাঁর অনূদিত গ্রন্থ সম্পর্কে ম্যাক্স মেয়ারহোফ বলেন,[৬১৩] "কুসতা বিন লাওকা আল-বা'লাবাক্কী চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেন।"

তাঁর অনুবাদকর্মের মূল্যায়ন করে ইবনে নাদিম আল-ফিহরিস্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেন-[৬১৪]

وقد ترجم قسطا قطعة من الكتب القديمة ، وكان بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والاعداد والموسيقى لا مطمن عليه ، فصيحا باللغة اليونانية ، جيد العبارة بالعربية.

অর্থাৎ "কুসতা প্রাচীন গ্রন্থের কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন এবং চিকিৎসা, দর্শন, প্রকৌশল, গণিত এবং

৬১২. জুরজী যায়দান, *তারিখুদ তামাদ্দুনিল ইসলামী*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১
৬১৩. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬
৬১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০

সঙ্গীতসহ অনেক বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষায় সাবলীল এবং আরবী ভাষায় বাগ্মী ছিলেন।" ইবনে নাদীম তাঁর সম্পর্কে আরো বলেন, "তিনি আত্মা এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্যের ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ছোট গ্রন্থও লিখেছিলেন; যা গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং আমাদের সময় পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। গবেষকগণ এটি থেকে অনেক উপকৃত হয়েছেন বলে প্রমাণিত।"[৬১৫]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.)

তাঁর পূর্ণনাম আবুল হাসান সাবিত বিন কুররাহ বিন মারওয়ান বিন সাবিত বিন কারায়া বিন ইব্রাহিম বিন কারায়া বিন মারয়ানুস বিন সালামুইউস (ابراهيم ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن كرايا بن ابن كرايا بن مارينوس بن سلاموبوس)। তিনি ২২১/২৩১ হিজরী মোতাবেক ৮২৬/৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের 'হাররান' শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৮৮ হিজরী মোতাবেক ৯০১ খ্রিস্টাব্দে ৭৭ বছর বয়সে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।[৬১৬] তিনি মূলত 'হাররান' বাজারের একজন হুণ্ডি ব্যবসায়ী ছিলেন।[৬১৭] খলিফা আল-মুতাসিম বিল্লাহ (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)-এর রাজত্বকালে তিনি গ্রীস ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন এবং একজন পণ্ডিত ও অনুবাদক হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন।[৬১৮] গ্রীস থেকে ফিরে এসে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল-খোয়ারিজমীর (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) সাথে সাক্ষাত করেন, যিনি তাঁর বাগ্মীতা এবং বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বাগদাদে নিয়ে আসেন এবং খলিফার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।[৬১৯] মেধা ও কর্মদক্ষতার কারণে সাবিত বিন কুররাহ খলিফা আল-মুতাদিদের দরবারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। এমনকি তিনি সর্বদা রাজ দরবারে উপস্থিত থেকে

---

৬১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

৬১৬. জর্জ তারাবিশী, *মু'জামুল ফালাসাফাহ* (বৈরুত: দারুত তালিয়াহ, ২০০৬ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৫১; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ৩৮০

৬১৭. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ৩৮০; ড. এরফান আব্দুল হামিদ, *আল-ফালসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ* (বাগদাদ: দারুত তারবিয়্যাহ, তা.বি), পৃ. ৯২

৬১৮. ড. এরফান আব্দুল হামিদ, *আল-ফালসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৬১৯. ড. আব্দুল হালিম মুনতাসির, *তারিখুল ইলমি ওয়াদ দাওরিল উলামাউল আরাব ফি তাকাদ্দুমিহ* (কায়রো: দারুল মা'য়ারিফ, তা.বি), ৮ম সংস্করণ, পৃ. ১১০

খলিফার সাথে দীর্ঘসময় কথা বলতেন, তাঁকে হাসাতেন এবং খলিফাও তাঁকে দরবারের মন্ত্রী এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের চেয়ে বেশি সম্মান করতেন।[৬২০]

বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী প্রথিতযশা এ সাহিত্যিক যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। তবে তুলনামূলকভাবে গণিতশাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতা ছিল বেশি। ফরাসী দার্শনিক ও গণিতবিদ রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রি.)-এর পূর্বেই তিনি এটি আবিষ্কার করেন; যা ব্যবহার করে ষোড়শ শতাব্দীতে কিছু আরব পণ্ডিত তাঁদের গবেষণায় গাণিতিক কিছু বড় সমীকরণ সমাধান করতে সক্ষম হন। তিনি ক্যালকুলাস আবিষ্কারের পথও প্রশস্ত করেছিলেন, যা বিপুল সংখ্যক জটিল সমস্যা এবং ক্রিয়াকলাপ সমাধানে সাহায্য করেছিল। জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শীতার ফলে তিনি সূর্যের গতিবিধি বের করে চন্দ্র বছরের দৈর্ঘ্য গণনা করেছিলেন, যা ছিল ৩৬৫ দিন, ৬ ঘন্টা, ৯ মিনিট ১০ সেকেন্ড।[৬২১] এজন্য তাঁকে ক্যালকুলাসের পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৬২২] ঐতিহাসিক কার্ল ব্রুকালম্যান (১৮৬৮-১৯৫৬ খ্রি) তাঁকে গণিতজ্ঞ বলে মূল্যায়ন করেছেন। যেমন তিনি বলেন-"সাবিত বিন কুররাহ গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।"[৬২৩]

অনুবাদ সাহিত্যে অবদান

জগদ্বিখ্যাত অনুবাদক সাবিত বিন কুররাহ (৮২৬-৯০১ খ্রি.) যুক্তিবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার বহু সংখ্যক গ্রন্থ গ্রীক ও সিরীয় ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদকরণের পাশাপাশি পূর্বের অনূদিত বিভিন্ন গ্রন্থের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে পুন:অনুবাদ করেন। তাঁর পুত্র সিনান বিন সাবিত (মৃ. ৯৪৩ খ্রি.), পৌত্রদ্বয় সাবিত (মৃ. ৯৭৩ খ্রি.) এবং ইব্রাহিম (মৃ. ৯৪৬ খ্রি.) এক প্রপৌত্র আবুল ফারাজ অনুবাদক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তারা সাবিত বিন কুররাহকে (৮৩৬- ৯০০ খ্রি.) গ্রন্থ অনুবাদে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন।[৬২৪] তাঁর অনুবাদকর্মের মধ্যে রয়েছে-

---

৬২০. আল-কফাতী, *তারিখুল হুকামাউ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬

৬২১. ড. হারবী আব্বাস আতিতু মাহমুদ ও ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *আল-উলুমু ইন্দাল আরাব উসুলুহা ওয়া মালামিহুহাল হাদারিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, ২৫৮-২৫৯

৬২২. ড. আব্দুল হালিম মুনতাসির, *তারিখুল ইলমি ওয়াদ দাওরিল উলামাউল আরাব ফি তাকাদ্দুমিহু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

৬২৩. ড. এরফান আব্দুল হামিদ, *আল-ফালসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৬২৪. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, পৃ. ৩৮; ড. এরফান আব্দুল হামিদ, *আল-ফালসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২; Philip K Hitti, *History of the Arabs,* ibid, p. 315; আল-কিফাতী, *তারিখুল হুকামা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

১. كتاب المجسطى

সাবিত বিন কুররাহ টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি.) জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক 'Almagest' গ্রন্থটি পাঠক মহলে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে তিন খণ্ডে বিভক্ত করে অনুবাদ করার প্রয়াস চালান। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় দু'টি খণ্ড অনুবাদ করেন কিন্তু তৃতীয় খণ্ডটি আংশিক অনুবাদ করেন ফলে এ খণ্ডটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।[৬২৫]

২. فى سكون بين حركتى الشريان

এটি ধমনীর সঞ্চালন সংক্রান্ত দু'টি প্রবন্ধ সম্বলিত একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রথমে সাবিত বিন কুররাহ-এর ছাত্র ইসা ইবনে আসিদ আন-নাসরানী কর্তৃক প্রথম আরবী ভাষায় অনূদিত হয় এবং পরবর্তীতে তিনি এটির সংশোধনমূলক অনুবাদ করেন। তবে কেউ কেউ দাবি করেন যে, গ্রন্থটির অনুবাদক ছিলেন হুবাইশ বিন আল-হাসান (মৃ. ৯১৩ খ্রি.) আল-আসাম; কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ ইবনে কারনিব নামে পরিচিত আবু আহমদ আল-হুসাইন ইবনে ইসহাক, সাবিতের মৃত্যুর পর যুক্তির মাধ্যমে এ ধারণাটি খণ্ডন করেছিলেন। তার মতে গ্রন্থটি অনুবাদের পর হুনাইন বিন ইসহাকের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তিনি এটির অত্যন্ত প্রশংসা করেন। হুনাইন তাঁর অন্য এক গ্রন্থে সাবিতের এ গ্রন্থটির প্রশংসা করার পাশাপাশি তাঁর কল্যাণ কামনা করেন।[৬২৬]

৩. كتاب جالينوس فى الأغذية

এটি গ্যালেনের (১২৯-২১৬ খ্রি.) পুষ্টি ও চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। তিনটি প্রবন্ধ সম্বলিত গ্রন্থটির কিছু অংশ বাদ দিয়ে সাবিত বিন কুররাহ সংক্ষিপ্তাকারে এটি অনুবাদ করেন।[৬২৭] গ্রন্থটিতে খাদ্য, পুষ্টি, মানবদেহের ওপর খাদ্যের প্রভাব, খাদ্য হজম হওয়া ও শরীরে পুষ্টি সরবরাহের পদ্ধতিসহ প্রভৃতি বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

---

৬২৫ . আল-কিফাতী, *তারিখুল হুকামা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৬২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৬২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৪. كتاب الأعضاء العامة لجالينوس

গ্যালেনের (১২৯-২১৬ খ্রি.) চিকিৎসাবিষয়ক অনূদিত এ গ্রন্থটিতে মানব দেহের সাধারণ অঙ্গপ্রঙ্গের বিভিন্ন রোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার বিশদ আলোচনাপূর্বক বৃক্ক ও মুত্রাশয়ের ব্যথা এবং পিত্তথলির সমস্যা ও সমাধান উপস্থাপিত হয়েছে।[৬২৮]

৫. كتاب جغرافيا في المعمورة وصفة الأرض

এটি টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি.) 'The Geograpia' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। অক্ষাংশ (Latitude) ও দ্রাঘিমাংশ (Longitude) ব্যবহারের পদ্ধতিসহ গ্রন্থটিতে প্রায় তিন হাজার স্থানের স্থানাঙ্কের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি জলবায়ুর ভিত্তিতে পৃথিবীকে ভৌগলিক অঞ্চলে বিভিক্ত করে প্রতিটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপূর্বক বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কনের পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

৬. كتاب الأصول الهندسية

এটি আর্কিমিডিস (২৮৭-২১২ খ্রি.পূ.)-এর প্রকৌশলবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ।[৬২৯] গ্রন্থটিতে গণিতশাস্ত্র, বিশেষকরে জ্যামিতির মৌলিক ও সুক্ষ বিষয়গুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রন্থটি সর্বসম্মতিক্রমে সমগ্র বিশ্বে গণিতশাস্ত্রের ভিত্তি হিসেবে পরিণত হয়েছে। কেননা পাটিগনিত, ভূমি-জরিপ, জলস্থিতিবিদ্যা, বায়ুগতিবিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা সবই জ্যামিতির ওপর নির্ভরশীল।[৬৩০]

৭. فيثاغورس الذهبية

এটি গ্রীক দার্শনিক ও গণিতবিদ পিথাগোরাসের (৫২৭-৪৯৭ খ্রি. পূ.) 'The Golden Verses of Pythagoras' শীর্ষক কবিতার আরবী অনুবাদ। গ্রীক ষড়ভুজ ছন্দে রচিত এ কবিতায় পিথাগোরাসের শিক্ষা ও দার্শনিক নীতিমালা সংক্ষিপ্তাকারে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কবিতাটিতে নৈতিকতা, আত্মশুদ্ধি, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়নতা, আত্মসংযোগ, দৈনন্দিন আচরণবিধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।[৬৩১] কবিতাটি তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম

---

৬২৮ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৬২৯. ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৬৩০. *কিতাবু আল-উসুলুল হানদাসাহ*, পৃ. ০৫-০৬

৬৩১. ড. এরফান আব্দুল হামিদ, *আল-ফালসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২; শায়খ আল-ইসাওয়ী, অসিয়্যাতু ফিসাগুরস্ আজ-জাহবিয়্যাহ, পৃ. ৬০৪

শতাব্দীর শুরু থেকেই সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে। পরবর্তীতে অনেক বিদ্বান এর পংক্তিগুলো বিশ্লেষণ করে এটি উপস্থাপন করেন। তাছাড়া সেসময়ে ভিয়েনাবাসীদের মধ্যে এটি এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে তারা এর চরণগুলো বিশ্লেষণ করে নতুনভাবে প্রকাশ করে। ফলে কবিতাটির সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তবে কিছু গ্রন্থ সমালোচক ও গবেষকের মতে এ কবিতাটি পিথাগোরাসের নিজস্ব রচনা নয়, বরং তার পরবর্তী অনুসারী গ্রীক দার্শনিক লাইসিস/Lysis (৪২৪-৩৪৮ খ্রি. পূ.) এটি রচনা করেন। এ ধারণা পোষণকরীদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক লেখক লার্তেয়াস ডায়োজিনিসের/Diogene de Laerte (৪১৩-৩২১ খ্রি. পূ.) অন্যতম।[৬৩২]

বিখ্যাত অনুবাদক সাবিত বিন কুররাহ অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.), সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রি.পূ.) এবং টলেমিসহ (১০০-১৭০ খ্রি.) আরো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদকরণের পাশাপাশি কিছু গ্রন্থের পরিমার্জন ও সংশোধন করেছেন। তাঁর সংশোধিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-[৬৩৩]

١. علم النبات

এটি অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) 'On Plants' গ্রন্থের সংশোধিত অনুবাদ। এ গ্রন্থটি হুনাইন বিন ইসহাকও (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

٢. كتاب السياسة

এ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (৪২৮-৩৪৭ খ্রি.পূ.) ১০ খণ্ড সম্বলিত কালজয়ী গ্রন্থ 'The Republic'-এর সংশোধিত অনুবাদ।[৬৩৪] গ্রন্থটিতে সংলাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, সাহিত্য ও সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। 'রিপাবলিক' সংলাপের প্রধান কথক সক্রেটিস (৪৭০-৩৯৯ খ্রি. পূ.)। তিনি এবং তাঁর সহোদর গ্লোকন এথেন্সের নিকটবর্তী 'পিরিয়াস' বন্দরে আটক অবস্থায় পোলেমারকাসের গৃহে এ সংলাপটি সংঘটিত হয়।[৬৩৫]

---

৬৩২. শায়খ আল-ইসাওয়ী, *অসিয়্যাতু ফিসাগুরস্ আজ-জাহবিয়্যাহ,* পৃ. ৬০৪

৬৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৬৩৪. ড. এরফান আব্দুল হামিদ, *আল-ফালসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ* (বাগদাদ: দারুত তারবিয়্যাহ, তা.বি), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৬৩৫. G.R.F. Ferrari (edi.), *Plato, the Repiblic* (UK: Capbridge University Press, 2000), pp. xlii

৩. كتاب فى تصحيح مسائل الجبر بالبراهين الهندسية

এটি জ্যামিতিক প্রমাণের মাধ্যমে বীজগণিতের সমস্যার সমাধান নিয়ে রচিত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ। এখানে বীজগণিতের সূক্ষ্ম বিষয়াবলি, প্রকারভেদ এবং ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটি গ্রীক গণিতবিদ অ্যাপোলোনিয়াসের (২৪০-১৯০ খ্রি. পূ.) অনুপাত ও জ্যামিতিক ধারণা বিষয়ক একটি গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধের সংশোধিত আরবী অনুবাদ। এতে দু'টি প্রবন্ধ ছিল। সাবিত প্রথম প্রবন্ধের অস্পষ্ট বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে সহজবোধ্য করেছেন। তবে দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু অত্যন্ত দুর্বোধ্য হওয়ায় তিনি সেটির অনুবাদ করেননি।[৬৩৬]

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও সাবিত বিন কুররাহ কর্তৃক অনূদিত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো আব্বাসী যুগের আরবী অনুবাদ সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

১. অ্যাপোল্লোনিয়ুস (১০০-১৭০ খ্রি.)-এর رسالة في الدوائر المتماسة এবং المخروطات

২. رسالة في الحجة المنسوبة الى سقراط

৩. كتاب الأرثماطيقي في علم العدد

৪. كتاب الأشكال الكرية

৫. كتاب الجوامع لابقراط

৬. كتاب الجوامع لجالينوس

৭. حيلة البرء পাটিগণিত বিষয়ক গ্রন্থ[৬৩৭]

৮. **গ্যালেন**-এর كتاب الكيموس

৬৩৬. আল-কিফাতী, *তারিখুল হুকামা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৬৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইউহান্না বিন আল-বাতরিক (মৃ. ২০০ হি./৮১৫ খ্রি.)

يوحنا بن يوسوف بن الحارث بن البطريق (ইউহান্না বিন ইউসুফ বিন হারিস বিন বাতরিক) খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ও বাইতুল হিকমার অনুবাদ বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি ইউক্লিড্‌সসহ (মৃ. ৩০০ খ্রি.পূ.) অনেক বিখ্যাত লেখকের প্রকৌশল বিষয়ক অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। তাছাড়া তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের ওপর যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন।[৬৩৮] তিনি প্রাচীন গ্রীক লিপি জানতেন এবং রোমানদের ল্যাটিন ভাষা সাবলিলভাবে পড়তে ও লেখতে পারতেন।[৬৩৯] বিজ্ঞান বিষয়ক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য খলিফা আল-মামুন তাঁকে রোম দেশে পাঠালে তিনি রোমের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক দূর্লভ ও মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে তাঁর নির্দেশে সেগুলো অনুবাদ করেন। অনুবাদকর্মের নির্ভুলতার কারণে খলিফা তাঁকে পুরস্কৃত করেন।[৬৪০]

অনুবাদকর্ম

ইউহান্না বিন আল-বাতরিক বাক্যের অর্থ প্রকাশে খুবই পারদর্শী ছিলেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের তুলনায় দর্শনশাস্ত্রই তাঁর অনুবাদের মূল লক্ষ্য ছিল। অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.) গ্রন্থ অনুবাদের প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তবে হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) এবং অন্যান্য অনুবাদকদের মতই হিপোক্রিটস (৪৬০-৩৭০ খ্রি.পূ.)-এর কিছু গ্রন্থও তিনি অনুবাদ করেন।[৬৪১] তাছাড়া তিনি প্রকৌশলবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, প্রাণীবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যাসহ বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক মূল্যবাদ গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগগ্য হচ্ছে-

---

৬৩৮. ইবনে জুলজাল, *ত্বব্‌কাতুল আতিব্‌বাউ ওয়াল হুকামাউ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮; আল-কিফাতী, *তারিখুল হুকামাউ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯

৬৩৯. ইবনে আবি উসাইবিয়্যাহ, *উয়ুনুল আনবিয়্যা ফি তব্‌কাতুল আতিব্বা* (বৈরুত: দারুল মাকতাবাতুল হায়্যাহ, তা.বি), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২

৬৪০. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, ৩০৪

৬৪১. আল-কিফাতী, *আখবারুল উলামাউ বি আখবারিল হুকামাউ* (মিশর: দারুল কুতুবুল খুদাইবিয়্যাহ, ১৩২৬ হি.), পৃ. ২৪৮; আল-কফাতী, *তারিখুল হুকামাউ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯

١. سرالأسرار

এটি গ্রীক ভাষায় রচিত অ্যারিস্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Politics'-এর আরবী অনুবাদ। তবে কেউ কেউ বলেন ইউহান্না বিন আল-বাত্বরিক্ব গ্রন্থটি كتاب السياسة في تدبير الرياسة নামে হিজরী ৩য় শতকে অনুবাদ করেন।[৬৪২] রাজনীতি বিষয়ক বিখ্যাত এ গ্রন্থটি 'The Secret of Secrets' শিরোনামে ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে নেদারল্যান্ডসের লিডেনে পুন:প্রকাশিত হয়।[৬৪৩]

'The Politics' গ্রন্থটি পাশ্চাত্যের ইতিহাসের সেই অনন্য মুহূর্তের ফসল, যখন জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রচলিত চিন্তাধারাকে অতিক্রম করে আত্মপ্রকাশ করেছিল এক নতুন বৌদ্ধিক ধারা। যা গ্রীক বিশ্বে 'দর্শন' নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের হাত ধরেই প্রাকৃতিক ও মানবিক ঘটনাবলিকে যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণের প্রবণতা গড়ে উঠে। অ্যারিস্টটলের এ গ্রন্থটি মূলত রাষ্ট্র ও রাজনীতি সম্পর্কে সুবিন্যস্ত ও বিশদ আলোচনার প্রথম যুগান্তকারী প্রচেষ্টা। আলোচ্য গ্রন্থটির মূল বিষয়বস্তু হলো 'রাজনীতি'-তবে আধুনিক অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নয়; বরং গ্রীক নগর-রাষ্ট্র বা polis-এর কার্যক্রম ও সংগঠন। 'polis' শব্দটিকে ইংরেজি 'state' বা এর সমার্থক হিসেবে অনুবাদ করা যথার্থ নয়; কারণ 'polis' একটি পার্থক্যসূচক পরিভাষা-যা বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিচায়ক। এটি এমন একটি রাজনৈতিক রূপকে নির্দেশ করে যা আদিম উপজাতি এবং প্রাচীন প্রাচ্যের সভ্য রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-উভয় থেকেই সমানভাবে দূরবর্তী। গ্রীক স্বর্ণযুগে (খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে তৃতীয় শতাব্দী) প্রচলিত রাজনৈতিক সংগঠনের রূপ 'polis' ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যা একটি নগরকে কেন্দ্র করে সংগঠিত এবং সাধারণত আনুষ্ঠানিক আইন ও প্রজাতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা শাসিত হতো।[৬৪৪] আট খণ্ডে বিভক্ত এ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে মোট ১৩টি অধ্যায় রয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা, রাষ্ট্রের উপাদান, প্রভু ও দাসের সম্পর্ক, সম্পদের প্রকারভেদ ও সম্পদ সংগ্রহের উপায়, অর্থনীতির বিবর্তন, অর্থ উপার্জনের সীমা, জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতির দান এবং পারিবারিক সম্পর্কের প্রকারভেদ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আদর্শ রাষ্ট্রেরনীতি, প্লেটোর প্রস্তাবিত

---

৬৪২. আবু দাউদ সুলাইমান বিন হাসান আল-আন্দালুসী (ইবনে জুলজাল), *ত্বব্কাতুল আতিব্বাউ ওয়াল হুকামাউ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
৬৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭; খায়ের আদ-দীন আল-জিরকালী, *আল-আলাম* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালায়িন, ২০০২ খ্রি.), পঞ্চদশ সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০
৬৪৪. Carnes Lord (tran.), *Aristotle's Politics* (London: The University of Chicago Press, 2013), 2nd Edi., p. 06

সাম্যবাদের সমালোচনা, যৌথ মালিকানার অসুবিধাসমূহ, ব্যক্তি মালিকানার সুবিধা, প্লেটোর আইন বিষয়ক আলোচনা, হিপপোডামাস-এর নগর পরিকল্পনা, প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা (ল্যাসিডিমনিয়্যা, ক্রিট এবং কার্থেজের শাসনব্যবস্থা), ল্যাকোনিয়্যা এবং ক্রিটের শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য, রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের প্রকারভেদ-প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তৃতীয় খণ্ডে নাগরিকের সংজ্ঞা, নাগরিকের গুনাবলী, উত্তম ব্যক্তি ও উত্তম নাগরিক, শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি ও ভিত্তি, শাসন ব্যবস্থার প্রকারভেদ, কতিপয়তন্ত্র (বিত্তবানতন্ত্র) ও গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মালিক কে ? সমতা ও অসমতার প্রকারভেদ, রাজকীয় শাসন ব্যবস্থা, কোনটি উত্তম: সর্বোত্তম ব্যক্তির শাসন না সর্বোত্তম আইনের শাসন ? স্বৈরশাসন ব্যবস্থা, উত্তম শাসন ব্যবস্থা, চতুর্থ খণ্ডে কতিপয়তন্ত্র ও গণতন্ত্রের পার্থক্য, অভিজাততন্ত্র, পলিটিতন্ত্র (বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যে মিশ্রণের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রবণতা প্রকাশ পায়), শাসন ব্যবস্থার নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ, পঞ্চম খণ্ডে বিপ্লবের কারণ ও শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন, গণতন্ত্রের পতনের কারণ, কতিপয়তন্ত্র পরিবর্তনের কারণ, অভিজাতন্ত্রে বিপ্লবের কারণ, স্বৈরতন্ত্র পতনের কারণ ও স্বৈরশাসকের বাঁচার উপায়, ষষ্ঠ খণ্ডে শাসনব্যবস্থা কার্যকর করার উপায়, নাগরিকদের স্বাধীনতাসহ শাসনব্যবস্থা রক্ষার উপায় বর্ণনা করেছেন। অতঃপর সপ্তম খণ্ডে সর্বোত্তম রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনার আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটির অষ্টম খণ্ডে সামাজিক, পারিবারিক, শিক্ষা ও সঙ্গিতবিদ্যা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে।[৬৪৫]

২. طباع الحيوان

উক্ত শিরোনামে ইউহান্না বিন আল-বাতরিক অ্যারিস্টটলের ‘Generation of Animals’ গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।[৬৪৬] আলোচ্য গ্রন্থটিতে প্রাণিজগতের প্রজনন, ভ্রূণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের স্থানান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এতে প্রাণীর জন্মের কারণ, প্রজনন প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের ভূমিকা, ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন ধাপ এবং বিভিন্ন প্রাণীর বংশবিস্তার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।[৬৪৭]

---

৬৪৫. Carnes Lord (tran.), *Aristotle’s Politics*, pp. 39-231

৬৪৬. জর্জ তারাবিশী, *মু’জামুল ফালাসাফাহ* (বৈরুত: দারুত তালিয়্যাহ, ২০০৬ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭৪২

৬৪৭. A.L. Peck (trans.), *Aristotle Generation of Animals* (London: Harvard University Press.), p. vi

৩. كتاب النفس

এটি গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল রচিত 'On the Soul' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ।[৬৪৮] তিন খণ্ডে বিভক্ত বিখ্যাত এ গ্রন্থটিতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু (On Sense and Sensible), স্মৃতি এবং স্বরণ (On Memory and Recollection), ঘুম এবং জাগরণ (On Sleep and Waking), স্বপ্ন (On Dreams), ঘুমের মধ্যে ভবিষ্যদ্বানী (On Propphecy in Sleep), জীবনে দৈর্ঘ্য ও স্বল্পতা প্রসঙ্গ, যৌবন এবং বার্ধক্য, জীবন ও মৃত্যু (On Length and Shortness, On life and Death), শ্বাস-প্রশ্বাস (On Pespiration) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৬৪৯]

৪. كتاب الأربعة

এটি ল্যাটিন ভাষায় রচিত টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি) বিখ্যাত গ্রন্থ 'Quadripartite'এর আরবী অনুবাদ।[৬৫০] চার খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থটিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের (Astrology) তাত্ত্বিক ভিত্তি ও নীতিমালা, রাশি চক্রের প্রভাব, মানবজীবনে বিভিন্ন ঘটনার সাথে এ শাস্ত্রের সম্পর্কসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে।[৬৫১]

৫. كتاب الجمهورية

এটি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (৪২৮-৩৪৭ খ্রি.পূ.) 'The Republic' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ।[৬৫২] ১০ খণ্ডে বিভক্ত কালজয়ী এ গ্রন্থটি ইউহান্না বিন আল-বাতরিকের পাশাপাশি সাবিত বিন কুররাহও (৮২৬-৯০১ খ্রি.) পরিমার্জিত অনুবাদ করেন।

৬. كتاب طيماوس

এটি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর 'Temaeus' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ।[৬৫৩] এটি প্লেটোর রচনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত রচনা। গ্রন্থটিতে সংলাপের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, বিশ্বপ্রকৃতির বিন্যাস ও মানব আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[৬৫৪]

---

৬৪৮. জর্জ তারাবিশী, *মু'জামুল ফালাসাফাহ* (বৈরুত: দারুত তালিয়্যাহ, ২০০৬ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭৪২
৬৪৯. W.S. Heat, *Aristotle On the Soul* (London: William Heinemann Ltd.), pp. v-vi
৬৫০. জর্জ তারাবিশী, *মু'জামুল ফালাসাফাহ* (বৈরুত: দারুত তালিয়্যাহ, ২০০৬ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭৪২
৬৫১. J.M Ashmand, *Ptolemy's Tetrabiblos or Quadripartile* (Londone: W.Foulsham & co. Lit.), New edi. p.xii
৬৫২. ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

অনুবাদকর্মের মূল্যায়ন

গ্রীক, ল্যাটিন, সুরিয়ানী ও আরবী ভাষায় দক্ষ প্রথিতযশা অনুবাদক ইউহান্না বিন আল-বাতরিক আব্বাসী যুগের অনুবাদ আন্দোলনের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তিনি আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অন্যান্য জাতির কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। জামালুদ্দীন আবিল হাসান আলী বিন ইউসুফ আল-কিফাতী (১১৭২-১২৪৮ খ্রি.) তাঁর অনুবাদকর্ম সম্পর্কে বলেন:[৬৫৫]

انه جد في ترجمته ونقله من اللسان اليوناني الى اللسان الرومي ثم من اللسان الرومي الى اللسان العربي.

অর্থাৎ "তিনি গ্রীক ভাষা থেকে রোমান ভাষায়, তারপর রোমান ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদকরণে দক্ষ ছিলেন।"

---

৬৫৩. জর্জ তারাবিশী, *মু'জামুল ফালাসাফাহ* (বৈরুত: দারুত তালিয়্যাহ, ২০০৬ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৭৪২

৬৫৪. Peter Kalkavage (tra. & edi.), *Plato Timaeus* (USA: Hackett Publishging Company, 2016,) 2nd edi. p. xi

৬৫৫. আল-কিফাতী, *আখবারুল উলামাউ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.)

তাঁর পূর্ণনাম أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران بن اسمعيل بن محمد بن الاشعث بن قيس الكندى (আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন আস-সাবাহ বিন ইমরান বিন ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ বিন আল-আশয়াস বিন কায়েস আল-কিন্দী)।[৬৫৬] তিনি খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শুরুতে ইরাকের 'কুফা' নগরীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬০হি./৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে সমকালীন সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি। আরবের 'কিন্দা' গোত্রের বংশভূত হওয়ার কারণে তাঁকে فيلسوف العرب (আরবদের দার্শনিক) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৬৫৭] তাঁর পিতা খলিফা আল-মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.) এবং খলিফা হারুন-অর-রশিদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) শাসনামলে কুফার গভর্নর ছিলেন।[৬৫৮] তাঁর পিতামহ বসরায় বনু হাশিমের গভর্নর ছিলেন। আল-কিন্দী জ্ঞানার্জনের জন্য কিছুকাল পিতামহের সাথে বসরায় বসবাস করেন। পরবর্তীতে তিনি খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) শাসনকালে বাগদাদে চলে যান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার 'বায়তুল হিকমাতে' মৌলিক গ্রন্থসহ আরবী ভাষায় অনূদিত গ্রীক, ফারসী ও ভারতীয় গ্রন্থসমূহ অধ্যায়ন করেন। উপরিউক্ত ভাষার যেসকল মৌলিক গ্রন্থ অনূদিত হয়নি সেগুলো তিনি পাঠযোগ্য করার ইচ্ছাপোষণ করেন। তাই মাত্র দু'বছরের প্রচেষ্টাতেই তিনি গ্রীক ও সুরিয়ানী উভয় ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হন। সেখানে তিনি ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, পাটিগণিত, যুক্তিবিদ্যা, জ্যামিতি, সংখ্যাতত্ত্ব, প্রকৃতিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করেন।[৬৫৯]

খলিফা আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) ও আল-মু'তাসিম বিল্লাহের (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.) শাসনামলে বাগদাদে তিনি প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার হিসেবে আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছিলেন। আর সেই দীপ্তি ও পাণ্ডিত্য তাঁকে ইসলামী বিশ্বের গ্রীক, পারসিক ও ভারতীয় দর্শনের উজ্জ্বল নক্ষত্রে

---

৬৫৬. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭

৬৫৭. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বাইতুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন* (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, তা.বি), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৩৩১; জর্জ তারাবিশী, *মু'জামুল ফালাসাফাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৮

৬৫৮. ইবনে আবি উসাইবিয়্যাহ, *উয়ুনুল আনবিয়্যা ফি তব্কাতুল আতিব্বা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

৬৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬; ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বাইতুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১; ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

পরিণত করে।[৬৬০] তিনি গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.)-এর দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ অনুবাদের প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন। আবুল ফাতাহ আশ-শাহরাস্তানী (১০৭৫-১১৫৩ খ্রি.) এ বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন,[৬৬১] "ইসলামী দার্শনিকদের মধ্যে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দী অ্যারিস্টটলের রচনাশৈলী অনুসরণে অনন্য ছিলেন। তিনি সাহিত্য রচনার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এক্ষেত্রে গ্রন্থ অনুবাদকরণে গ্রীক ভাষার দক্ষতা তাঁকে সক্ষম করে তোলে।" তাঁর অসংখ্য ছাত্র, লেখক ও অনুসারী ছিল–যারা তাঁর অধীনে অধ্যায়ন করার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা ও অনুবাদকর্মে বিভিন্নভাবে তাঁকে সহযোগিতা করতেন। এদের মধ্যে হাসনাবিয়্যাহ, নাফতাবিয়্যাহ, সালমাবিয়্যাহ, আহমাদ ইবনে আত-তাইয়্যিব (৮৩৩-৮৮৬ খ্রি.) এবং আবু মাশারের নাম উল্লেখযোগ্য।[৬৬২]

রচনাশৈলী

আল-কিন্দীর রচনাশৈলীতে গ্রীক দর্শন এবং ইসলামী চিন্তাধারার এক অনন্য সংমিশ্রণ ঘটে, যেখানে তিনি যুক্তি ও প্রমাণের ওপর জোর দিয়ে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। গ্রীক দর্শনের প্রভাব তাঁর লেখায় সুস্পষ্ট। তিনি যুক্তিনির্ভর ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করতেন, যা তাঁর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। তিনি আল্লাহ, আত্মা, প্রকৃতি, জ্ঞানতত্ত্ব এবং ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। মূলত তাঁর রচনাশৈলী ছিল সমন্বিত ও যুক্তিপূর্ণ, যেখানে প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানকে ইসলামী চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম করার অনন্য প্রচেষ্টা স্পষ্ট। তাঁর রচনাশৈলীর এ সেতুবন্ধনই পরবর্তী মুসলিম দর্শনের বৌদ্ধিক বিকাশে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে।[৬৬৩]

তিনি ভাষাতত্ত্ব ও দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন। ভাষার উৎপত্তিগত নিদর্শন ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর শৈলী আধুনিক পাঠককে অবাক করে। তিনি দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করতেন। একটি বাক্য বেশ কয়েকটি লাইনে বিস্তৃত হত, যা যুক্তিসঙ্গত এবং দার্শনিক যুক্তির অগ্রগতি অনুসরণ করার অভিজ্ঞ ব্যতিত

---

৬৬০. কার্ল ব্রুক্যালম্যান, *তারিখুল আদাবীল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৬৬১. ইবনে জুলজাল, *তবকাতুল আতিব্বাউ ওয়াল হুকামাউ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৬৬২. ইবনে আবি উসাইবিয়্যাহ, *উয়ুনুল আনবিয়্যা ফি তব্কাতুল আতিব্বা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭; ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫

৬৬৩. মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী আল-বুরায়দাহ, *রসায়িলুল কিন্দী আল-ফালসাফিয়্যাতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

অন্যদের বোঝা কষ্ঠসাধ্য ছিল। তবে তাঁর রচনাশৈলী ছিল সুস্পষ্ট, বাক্যের গাঁথুনি ছিল দৃঢ়, যুক্তিসঙ্গত এবং অর্থবহ। তাঁর রচনাশৈলীতে এমন একটি মসৃণতা রয়েছে যা বিচক্ষণ লেখকের জন্য আনন্দদায়ক।[৬৬৪]

দার্শনিক উক্তি

আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) আরব দার্শনিকদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর দর্শনের মূলবিষয় ছিল ইসলামী মূল্যবোধ, যা তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণভাবে অনুশীলন করতেন। তিনি কেবল একজন তত্ত্ববিদ নন; বরং ইসলামের মৌলিক নীতিগুলোর প্রকৃত অনুসারী ছিলেন। যিনি ন্যায়সঙ্গত ও দার্শনিক যুক্তির মাধ্যমে তাঁর লেখায় ইসলামী দর্শনের বিষয়গুলো চমৎকারভাবে জীবন্ত করে তুলতেন। তাঁর লেখার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য যেন প্রজ্ঞার মণি। তাঁর অনেক প্রজ্ঞাপূর্ণ দার্শনিক উক্তি আজও দীপ্তিমান প্রদীপের মতো জ্বলছে। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-[৬৬৫]

১. اعتزل الشر فإن الشر للشرير خلق.

"মন্দকে এড়িয়ে চলো, কারণ মন্দ দুষ্টদের জন্যই সৃষ্টি।"

২. من لم ينبسط لحديثك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك.

"যদি কেউ তোমার কথা উপভোগ না করে, তাহলে তাকে তোমার কথা শোনানো থেকে বিরত রাখো।"

৩. اعص الهوى واطع من شئت.

"তোমার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করো এবং যাকে তুমি পছন্দ করো তার আনুগত্য করো।"

৪. لا تغتر بمال وإن كثر.

"সম্পদ যত বেশি হোক না কেন, তাতে প্রলুব্ধ হবে না।"

৫. العاقل يظن أن فوق علمه علما.

"জ্ঞানী ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, তার চেয়ে বড় জ্ঞানী আছে।"

---

৬৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৬৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

আল-কিন্দীর সাহিত্যচর্চা

আব্বাসী শাসনামলের সাহিত্যিকদের মধ্যে আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) অন্যতম। সাহিত্য চর্চার জগতে স্বীয় প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনেক মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থ রয়েছে। ইবনে নাদীম (মৃ. ৯৯৫/৯৯৮ খ্রি.) তাঁর আল-ফিহরিস্ত গ্রন্থে আল-কিন্দীর ২৫১টি মৌলিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক ২৫টি, যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত ৯টি, গণিতশাস্ত্র সম্পর্কিত ১১টি, ঘন জ্যামিতি বিষয়ক ৯টি, সংগীতবিদ্যা ৭টি, নক্ষত্রবিদ্যা সম্পর্কিত ২৫টি, প্রকৌশলবিদ্যা বিষয়ক ২৩টি, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত ১৬টি, চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক ২২টি, বিধি-বিধান বিষয়ক ১০টি, গাণিতিক যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত ১৭টি, মনোবিজ্ঞান বিষয়ক ৫টি, রাজনীতি বিষয়ক ১২টি, স্থানাঙ্ক বিষয়ক ১৪টি, মাত্রিক জ্যামিতি বিষয়ক ৮টি, গাণিতিক ক্রমধারা বিষয়ক ৫টি এবং গাণিতিক শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক ৩৩টি মৌলিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।[৬৬৬]

অনূদিত গ্রন্থ

প্রাচীন মুসলিম সভ্যতার অন্যতম মনীষী আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-[৬৬৭]

১. الجغرافية فى معرفة اقاليم المعمورة و غيرها

এটি টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি.) 'Geographia' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটি বর্তমানে সিরীয় ভাষায় বিদ্যমান আছে।[৬৬৮] আট খণ্ড সম্বলিত এ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৪০টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে রোমান ভূগোলবিদ ও গণিতবিদ মারিনাসের (৭০-১৩০ খ্রি.) ভৌগোলিক বর্ণনাসহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য-ভূগোল (Geography) এবং ভূসংস্থানের

---

৬৬৬. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮-৩৬৫

৬৬৭. ড. আসমা আব্দু আউন শায়া, *ইবরাজুল মুতারজিমিনা ফিল আসরিল আব্বাসীল আওয়াল, মাজাল্লাতু কুল্লিয়্যাতুত তারবিয়্যাহ* (জামিয়াতু ওয়াসিত, মে, ২০২০ খ্রি.), সংখ্যা, ৩৯, পৃ. ১৭৫-১৭৬; ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৬৬৮. ইবনে জুলজাল, *তবকাতুল আতিব্বাউ ওয়াল হুকামাউ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী আল-বুরায়দাহ, *রসায়িলুল কিন্দী আল-ফালসাফিয়্যাতি* (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৩৬৯ হি/১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ০৯

(Topography) মধ্যে পার্থক্য কী? ভূগোলে কোন পূর্বানুমানগুলো ব্যবহার করতে হবে, Meridian বা দ্রাঘিমা রেখা এবং Stadia বা দূরত্ব পরিমাপক এককের বর্ণনা, মারিনাসের ভৌগোলিক বর্ণনা, পৃথিবীর অক্ষাংশ সম্বন্ধে মারিনাসের মতামত, বাসযোগ্য পৃথিবীর পরিধি গণনায় মারিনাসের ভুলসমূহ, স্থল ও সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে পৃথিবীর দ্রাঘিমাংশের গণনা পদ্ধতি, ভূগোলের যে বিষয়গুলোতে মারিনাস দ্বিমত পোষণ করেছেন সেগুলোর বর্ণনা, প্রদেশগুলোর সীমানা নির্ধারণে মারিনাসের ভুলসমূহ, বাসযোগ্য পৃথিবীর সীমা নির্ধারণে মারিনাসের পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ, সমগ্র পৃথিবীকে সীমায়িত করার ক্ষেত্রে গ্যালেন ও তাঁর অনুসারীদের পদ্ধতির সুবিধার বিবরণ, মারিনাস অঙ্কিত ছবিতে প্রতিসাম্যের (Symmetry) ঘাটতি বা অভাব, পৃথিবীকে একটি সমতলে চিহ্নিতকরণে করণীয় কী হবে, বাসযোগ্য পৃথিবীকে একটি গোলকের ওপর কীভাবে দেখানো উচিত, গ্যালেন ও তাঁর অনুসারী কর্তৃক সীমা নির্ধারণে ব্যবহৃত দ্রাঘিমা রেখা ও অক্ষরেখাগুলোর ব্যাখ্যা।[৬৬৯]

আলোচ্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের শিরোনাম 'ইউরোপ'; এ খণ্ড দু'টিতে গ্রেট ব্রিটেনের হাইবারনিয়া ও অ্যালবিয়ন দ্বীপ, প্রাচীন রোমের তিনটি প্রদেশ হিস্পানিক বেটিকা ও হিস্পানিক লুসিটানিয়া ও হিস্পানিক ট্যারাকোনেনসিস, স্প্যানিশ বেটিকা, হিস্পানিক লুসিটানিয়া এবং হিস্পানিক ট্যারাকোনেনসিস, অ্যাকুইটানিয়ান গ্যালিয়া (বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স এবং উত্তর-পূর্ব স্পেনের অবস্থিত অঞ্চল), লুগডুনেনসিয়্যান গ্যালিয়া (রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন প্রদেশ বর্তমানে ফ্রান্সের একটি প্রদেশের অংশবিশেষ), বেলজিক গ্যালিয়া (রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ, বর্তমানে উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়্যাম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস ও জার্মানির কিছু অংশে অবস্থিত), নারবোনেনসিয়ান গ্যালিয়া (এটি রোমান সাম্রাজ্যের পর্বতমালা বেষ্টিত একটি প্রদেশ, যা বর্তমানে দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত), বৃহত্তর জার্মানি, রেটিয়া এবং ভিন্ডেলিকা (রোমান সাম্রাজ্যের দু'টি প্রতিবেশী প্রদেশ, যা মধ্য ও পূর্ব আল্পস এবং উত্তর আল্পস পর্বতমালার পাদদেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল), নোরিকাম (এটি রোমান সাম্রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত একটি প্রদেশ, যা বর্তমানে অস্ট্রিয়া ও স্লোভেনিয়্যার অন্তর্ভুক্ত), উচ্চ ও নিম্ন প্যানোনিয়া (দানিউব নদীর তীরবর্তী ও প্যানোনিয়ান সমভূমিতে অবস্থিত রোমান সাম্রাজ্যের দু'টি

---

৬৬৯. Edward Luther Stevenson (Tran. & Ed.), *Claudius Ptolemy the Geograyhy* (New York: Dover Publications, Inc. 1991), First Pub., pp. vii (content); Thomas Glazebrook Rylands, The Geography of Ptolemy Elucidated (Dublin: University Press, Ireland's, 1893), Content, pp. xix-xx

প্রদেশ), ইলিরিয়া বা লিবুর্নিয়া এবং ডালমাশিয়্যা (ইউরোপের অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত রোমান সাম্রাজ্যের দু'টি প্রদেশ), ইতালি, কর্সিকা দ্বীপ, সার্ডিনিয়্যা দ্বীপ, সিসিলি দ্বীপসহ ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলে এবং পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মোট ৩০টি অঞ্চলের ভৌগলিক বর্ণনা মানচিত্রসহ আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডের শিরোনাম 'আফ্রিকা'; এ খণ্ডে মৌরিতানিয়া, টিঙ্গিটানা, সিজারিয়ার মৌরিতানিয়া, মিশর, লিবিয়া, ইথিওপিয়াসহ 'আফ্রিকার' মোট ৮টি অঞ্চলের ভৌগলিক বর্ণনা মানচিত্রসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডের শিরোনাম 'এশিয়া'; এ তিনটি খণ্ডে বৃহত্তর এশিয়া মহাদেশের দূরবর্তী ৪৬টি অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থটির অষ্টম খণ্ডে দু'টি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে; ১. মানচিত্রে আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবীকে বিভক্ত করার জন্য কী কী পূর্বানুমান প্রয়োজন এবং ২. প্রতিটি মানচিত্রে কী কী অভিযোজন প্রয়োজন ? তাছাড়া অষ্টম খণ্ডের শেষে বিশ্ব মানচিত্রসমূহের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে।[৬৭০]

গ্রন্থটির শেষে তিনি সমগ্র ইউরোপের জন্য ১০টি, আফ্রিকার জন্য ৪টি এবং সমগ্র এশিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন ১২টি মানচিত্র তৈরী করে প্রতিটি মানচিত্র কোন মহাদেশের অন্তর্গত এবং প্রতিটি মানচিত্রে কতগুলো অঞ্চল রয়েছে-সেগুলো বিশ্লেষণ করেছেন।[৬৭১]

২. المجسطي

এটি টলেমির (১০০-১৭০ খ্রি.) জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ 'Almagest'-এর অনুবাদ। বিখ্যাত গ্রন্থটি হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিন মাতার ৮২৭ অথবা ৮২৮ খ্রিস্টাব্দে সিরীয় ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি খলিফা হারুন-অর-রশিদের (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) উজির ইয়াহইয়া বিন খালিদ বিন বারমাকী (মৃ. ১৯০ হি.) এটি অনুবাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন কিন্তু সফল হয়ে উঠেননি। পরে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ আবুল-ওয়াফা মুহাম্মদ আল বুজ্জানী আল-হাসিবের (মৃ. ৯৯৮ খ্রি.) উদ্যোগে এটি অনুবাদ করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া এ গ্রন্থটি হুনাইন বিন ইসহাকসহ অনেক আব্বাসীয় অনুবাদক আরবী ও সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।[৬৭২]

---

৬৭০. ibid, pp. viii-x (content).
৬৭১. ibid, pp.166-167
৬৭২. Philip K Hitti, *History of the Arabs,* ibid, p. 315

Dhaka University Institutional Repository

৩. الادوية المفردة

এটি গ্যালেনের (১২৯-২১৬ খ্রি.) বিখ্যাত গ্রন্থ 'Simple Drugs'-এর আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটি মোট এগারোটি প্রবন্ধে বিভক্ত। প্রথম দু'টি প্রবন্ধে তৎকালীন ভ্রান্ত চিকিৎসা-পদ্ধতির সমলোচনা করে ঔষধের কার্যকারিতা নির্ধারণে সঠিক মূল্যায়ণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধে ঔষধের প্রাথমিক কার্যকারিতা নির্ণয়ের পদ্ধতি, চতুর্থ প্রবন্ধে ঔষধের গৌণ বৈশিষ্ট্য (স্বাদ ও গন্ধ), পঞ্চম প্রবন্ধে ঔষধের কার্যকরী প্রভাব, পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধে উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত ঔষধের বৈশিষ্ট্য, নবম প্রবন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ঔষধের বৈশিষ্ট্য (মৃত্তিকা, পাথর এবং খনিজ পদার্থ থেকে প্রাপ্ত ঔষধের বৈশিষ্ট্য), দশম প্রবন্ধে প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ঔষধের বৈশিষ্ট্য এবং একাদশ প্রবন্ধে সমুদ্র এবং লবণাক্ত পানিতে উৎপন্ন ঔষধের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে।[৬৭৩]

আল-কিন্দীর পাশাপাশি গ্রন্থটির প্রথম পাঁচটি প্রবন্ধ বিখ্যাত চিকিৎসক, গণিতবিদ ও অনুবাদক ইউসুফ আল-খুরী (মৃ. ৯১২ খ্রি.) সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে আইয়ুব আল-রাহাউয়ী (মৃ. ১৯১ হি./৮০৬ খ্রি.), সালমুওয়ীহ ও সার্জিয়াস আর-রাসী (মৃ. ৫৩৬ খ্রি.) এটি সিরীয় এবং হুবাইশ বিন আল-হাসান (মৃ. ৯১৩ খ্রি.) আবু জাফর মুহাম্মদ বিন মুসার (৭৮১-৮৪৮ খ্রি.) জন্য আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৬৭৪]

৪. الميتافيزيقيا

এটি গ্রীক ভাষায় রচিত অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) বিখ্যাত গ্রন্থ 'Metaphysics'-এর আরবী অনুবাদ। আল-ফিহরিস্ত গ্রন্থাকার ইবনে নাদিমের (৯৩২-৯৯৫/৯৮ খ্রি.) মতে গ্রন্থটি হুনাইন বিন ইসহাক (৮০৯-৮৭৭ খ্রি.) আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া বিন আদীর কাছে প্রেরণ করেন। আল-কিন্দীর (৮০১-৮৭৩ খ্রি.) কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে তিনি এটি সেসময়ের বিখ্যাত চিকিৎসক গ্রীক ভাষায় পারদর্শী اسطاث (উস্তাস)-এর কাছে পাঠান। কিন্তু আল-কিন্দীর নিকট পৌঁছলে তিনি নিজে এটি

---

৬৭৩. K. S. Heal, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation,* p. 12

৬৭৪. ড. আব্দুর রহমান বাদাওয়ী, *নায়াদিরুল ফালাসিফাতি ওয়াল হুকামায়ি ওয়া আদাবিল মুয়াল্লিমিনাল কুদামায়ি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ না করে গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত اسطاث (উস্তাস)-কে অনুবাদ করার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তীতে তিনি গ্রন্থটিকে সংশোধন করে একটি মার্জিত আরবী শৈলীতে উপস্থাপন করেন।[৬৭৫]

৫. استعمال الحساب الهندي

এটি ভারতীয় পাটিগণিত ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে খলিফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ (২১৮-২২৭ হি./৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)-এর কাছে লেখা একটি চিঠির অনুবাদ।

৬. كتاب الربوبية

এটি গ্রীক ভাষায় রচিত অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) 'Theology' গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক এ গ্রন্থটি আল-কিন্দী ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেন।[৬৭৬] আলোচ্য গ্রন্থটিতে সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিজগৎ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে গভীর আলোচনা করা হয়েছে।

৭. إيساغوجى

গ্রীক দার্শনিক পোরফারির/Porphyry (২৩৪-৩০৫ খ্রি.) যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ 'Eisagoge'-এর আরবী অনুবাদ। গ্রন্থটিতে পাঁচটি মৌলিক দার্শনিক ধারণা ; Genus তথা প্রতিটি প্রজাতির উৎপত্তির মূলনীতি, Species তথা প্রতিটি প্রজাতির প্রকৃতি, Diffrernence তথা প্রতিটি প্রজাতির পার্থক্যের প্রকৃতি; Property তথা সম্পত্তির প্রকৃতি এবং Accident তথা দুর্ঘটনার প্রকৃতি প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[৬৭৭]

দার্শনিক পোরফারির (২৩৪-৩০৫ খ্রি.) যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক এ গ্রন্থটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণে পরবর্তীতে বিখ্যাত অনেক অনুবাদক বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত অনুবাদক আল-আবহারীর আরবী ভাষায় ব্যাখামূলক অনুবাদটি উল্লেখযোগ্য।

---

৬৭৫. ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, *বাইতুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১-৩৩২
৬৭৬. মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী আল-বুরায়দাহ, *রসায়িলুল কিন্দী আল-ফালসাফিয়্যাতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৬৭৭. Andrew M. Steele, STM, *Divisio Textus of Porphyry's Isagoge*, pp. 1-4

Dhaka University Institutional Repository

আল-আবহারী অনূদিত ' ايساغوجي ' গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি ।[৬৭৮]



الصفحة الأولى من النسخة أ

৬৭৮. হিসাম উদ্দীন হাসান আল-কাতিবী, *শারহু কিতাবি ইসাগুজি ফি ইলমিল মানতিকী* (বৈরুত: দারুদ দুখ্খান, ১৪৩৬ হি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

আল-কিন্দীর ‘ فى الفلسفة الأولى ’ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি।[৬৭৯]



صفحة من كتاب الكندى فى الفلسفة الأولى
ص ١٠٤ س ١٥ ، ص ١٠٩ س ٦ من الرسائل المطبوعة

৬৭৯. মুহাম্মদ আব্দুল হাদী আল-বুরদী, *রসাইলুল কিন্দী আল-ফালসাফিয়্যাহ* (মিশর: মাতবায়াতুল ইতিমাদ, ১৩৬৯ হি./১৯৫০ খ্রি.), পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর পূর্বে সংযুক্ত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদকর্মে সাহিত্যিক মূল্যায়ন

আব্বাসী যুগে অনুবাদ আন্দোলনের ইতিহাসে যে চারজন অনুবাদক বিখ্যাত হয়েছিলেন, আল-কিন্দী ছিলেন তাঁদের একজন। এ প্রসঙ্গে আবু মাশার (৭৮৭-৮৮৬ খ্রি.) তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'شاذان' (শাজান)-এ উল্লেখ করেন:[৬৮০]

حذاق التراجمة في الاسلام أربعة: حنين بن اسحاق، ويعقوب بن اسحاق الكندي ، وثابت بن قرة الحراني، وعمر بن الفرخان الطبري.

(ইসলামের চারজন সবচেয়ে দক্ষ অনুবাদক ছিলেন: হুনাইন বিন ইসহাক, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দী, সাবিত ইবনে কুররাহ আল-হাররানী এবং ওমর ইবনে আল-ফারখান আত-তাবারী।)

সালমান বিন হাসান (জ. ৯৬১ হি./১৫৫৪ খ্রি.)-এর মতে, ইসলামের ইতিহাসে আল-কিন্দী ছাড়া আর কোনো দার্শনিক ছিলেন না যিনি তাঁর লেখায় অ্যারিস্টটলের গ্রন্থগুলো ব্যাপকভাবে অনুসরণ করেছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রের বিরল গ্রন্থাবলি অনুবাদকরণের পাশাপাশি এ শাস্ত্রের অনেক জটিল ও অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলো ব্যাখা করেন।[৬৮১]

ইবনে জুলজাল তাঁর সম্পর্কে বলেন:[৬৮২]

كان عالما بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق والهندسة وطبائع الاعداد والهيئة و علم النجوم ولم يكن في الاسلام فيلسوف غيره احتذى في تواليفه حذو ارسطوطاليس وله تواليف كثيرة في فنون من العلم وخدم الملوك مباشرة بالأدب وترجم من كتب الفلسفة الكثير.

(তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, জ্যামিতি, সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ইসলামী দর্শনে তাঁর মতো করে অ্যারিস্টটলের দর্শন অনুসরণকারী কেউ ছিলেন না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে তিনি সরাসরি সাহিত্যের মাধ্যমে শাসকদের সেবা করেছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন।)

---

৬৮০. ইবনে আবি উসাইবিয়্যাহ, *উয়ুনুল আনবিয়্যা ফি তব্কাতুল আতিব্বা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬; ড. খিদর আহমাদ আতাল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

৬৮১. ইবনে আবি উসাইবিয়্যাহ, *উয়ুনুল আনবিয়্যা ফি তব্কাতুল আতিব্বা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

৬৮২. ড. আসমা আব্দু আউন শায়া, *ইবরাজুল মুতারজিমিনা ফিল আসরিল আব্বাসীল আওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত অনুবাদকগণ ছাড়াও আব্বাসী যুগে অনুবাদ আন্দোলনে যারা বিশেষ অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-[৬৮৩]

জরজিস বিন বখতিশু (মৃ. ১৫২ হি./৭৬৯ খ্রি.), মুহাম্মাদ বিন মুসা আল-খাওয়ারেজমী (৭৮০-৮৫০ খ্রি.), ইউহান্না বিন মাসুবিয়াহ (৭৭৭-৮৫৭ খ্রি.), আবু বিশার মুতী বিন ইউনুস (৮৭০-৯৪০ খ্রি.), আবু সাহাল আল-ফাজাল বিন নওবখত (মৃ. ৮১৫ খ্রি.), মানকা আল-হিন্দী, আল-বালাজুরী, সাবিত বিন কুররাহ (মৃ. ৯৭৩ খ্রি.)-এর পৌত্র, ইব্রাহিম (মৃ. ৯৪৬ খ্রি.) আবুল ফারাজ (সাবিত বিন কুররার প্রপৌত্র), জাবাল বিন সালিম, ইসহাক বিন ইয়াজিদ (মৃ. ৯০ হি.), মুসা বিন ইসা আল-কুর্দী (মৃ. ১৮২ হি.), যাদুবিয়াহ বিন শাহবিয়াহ আল-ইস্পাহানী, মুহাম্মাদ বিন বাহরাম বিন মাতার আল-ইস্পাহানী, বাহরাম বিন মারদান শাহ, ওমর বিন আল-ফাররুখ খান, মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম আল-ফাজারী (মৃ. ১৮০হি./৭৯৬ খ্রি.), হাজ্জাজ বিন ইউসূফ বিন মাতার (৭৮৬-৮৩৩ খ্রি.), সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ (৭২৫-৮১৫ খ্রি.), মুহাম্মদ বিন জাবির আল-বাতানী (৮৫৮-৯২৯ খ্রি.), আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-ফার্গানী (২৪৭ হি./৮৬১ খ্রি.), দাউদ বিন হুনাইন, মুহাম্মদ বিন জাহাম আল-বারমাকী (মৃ. ৩২৯ হি.), লাকীত বিন মু'য়াম্মার (মৃ. ৩৮০ খ্রি.), আল-ফযল বিন খাতিম, সালেহ বিন বাহলাহ আল-হিন্দী, আবুল হাসান আলী বিন সালিম, ইসহাক বিন যায়েদ, যাদবীহ বিন হাশবীহ আল-ইস্পাহানী, খালিদ বিন মুসা, সিনান বিন সাবিত (মৃ. ৯৪৩ খ্রি.), হিশাম বিন কাসিম, আবুল হাসান আলী বিন যিয়াদ আত-তামিমী, হাসান বিন সাহল (১৬৬-২৩৬ হি.) এবং হুবাইশ বিন আল-আ'সাম (৮৭৮ খ্রি.)।

---

৬৮৩. ড. ফাদিল মুহাম্মাদ আল-হুসাইনী, *আফাকুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ* (ওমান: দারুশ শুরুক, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৮১-৮২; আহমাদ আমীন, *দুহাল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭; Philip K Hitti, *History of the Arabs*, ibid, p. 315; ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পৃ. ৮৮-১১৫

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের ফলাফল

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে আব্বাসী যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশধারা সহজভাবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এ অভিসন্দর্ভের প্রত্যাশিত ফলাফল নিম্নরূপ:

১. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিতৃব্য আব্বাস বিন আবদিল মুত্তালিব বিন হিশাম বিন আবদ মানাফ আল-কুরাইশী আল-হাশেমী বংশধরগণই ইতিহাসে আব্বাসী যুগের প্রবর্তক এবং আল-আব্বাসের নামানুসারে এ বংশ بنو العباس (বানুল আব্বাস) বা আব্বাসীয় বংশ নামে পরিচিতি।

২. দীর্ঘ ৫০৮ (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) বছরের শাসনামলে ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে ৩৭ জন খলিফা আব্বাসীয় শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আব্বাসীয় শাসনামলের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আস-সাফ্ফাহ (৭৫০-৭৫৪খ্রি.) এবং শেষ খলিফা আব্দুল্লাহ আল-মুসতাসিম বিল্লাহ (১২৪২-১২৫৮ খ্রি.)।

৩. আব্বাসীয় শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তার বীজ মূলত গ্রীক, সিরীয় ও পারস্যের সংস্কৃতির মিলনে উমাইয়্যা যুগেই উপ্ত হয়েছিল। তাই এ যুগকেই আরবী অনুবাদ সাহিত্যের সূচনাপর্ব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এসময়ে অনুবাদের মাধ্যমে আরবরা গ্রীক, পারস্য ও ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সীমিত পরিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

৪. আব্বাসীয় যুগে আরবী অনুবাদ সাহিত্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়। এসময় বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বেশকিছু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদকগণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যভাণ্ডার থেকে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এজন্য আব্বাসী যুগকে অনুবাদ সাহিত্য বিকাশ ও সমৃদ্ধির 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

৫. অনূদিত গ্রন্থে সমাজ-সভ্যতা, কলা, সংস্কৃতি, ধর্মীয়-রাজনীতি প্রভৃতির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জীবনের একটি অন্তরঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠতো। বিভিন্ন শাসক, মনীষী, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও বিখ্যাত মানুষের মেধা মননশীলতা, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, চিন্তাধারা, মূল্যবোধসহ প্রভৃতি বিষয় জানার জন্য জীবনচরিত রচনা আব্বাসীয় যুগের এক স্বতন্ত্র সাহিত্যশিল্পে পরিণত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৬. আব্বাসীয় শাসনামলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎসকেন্দ্র بيت الحكمة প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজই ছিল গ্রীক, রোমান, পারসিক ও সংস্কৃতসহ বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থাবলির অনুবাদ করা। এ প্রতিষ্ঠানটিকে অনুকরণ করে সেসময়ে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

৭. আব্বাসী যুগে অনুবাদ সাহিত্য বিকাশের মূল কারণই ছিল খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা। এক্ষেত্রে খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর (৭১৪-৭৭৫ খ্রি.), খলিফা হারুন-অর-রশিদ (৭৬৩-৮০৯ খ্রি.) ও খলিফা আল-মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) অবদান অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

অনুবাদ বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে যোগসুত্র স্থাপনের মাধ্যমসমূহের মধ্যে অন্যতম। আরবরা নতুন জাতি ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অনুবাদের মাধ্যমে আরবরা প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ও বিখ্যাত গ্রন্থাবলি সম্পর্কে জানতে পারে। প্রাক-ইসলামী ও ইসলামী যুগের অনুবাদ অনেকাংশেই মৌখিক ও পত্রাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও উমাইয়্যা শাসনামলে সাহিত্যিক অনুবাদের সূচনা হয়; যা অনেকাংশেই ব্যক্তি নির্ভর ছিল। আব্বাসী যুগে অনুবাদ সাহিত্য ক্রমবিকাশের শীর্ষে পৌঁছেছিল। এসময় রাজ্য বিস্তার ব্যাপকতা লাভ করলে আরব শাসকগণ অনারবদের দ্বারা যেমন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়, তেমনি আরবী সাহিত্যও অনারব সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। আব্বাসীয় শাসনামলে জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক জোয়ার শুরু হলে আরবী ও ফারসী ভাষায় দক্ষ একদল পণ্ডিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদকরণে আত্মনিয়োগ করে অল্প সময়ে আরবী অনুবাদ সাহিত্য সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও বিভিন্ন ভাষার মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ করে আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি আরব ও অনারব সাহিত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। তাঁরা ক্ষুরধার লেখার মাধ্যমে পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেছেন শাসক, শাসিত ও শাসন সম্পর্কে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা। সামাজিক অবক্ষয়ের কথা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি তুলে ধরেছেন সমসাময়িক শাসকদের জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতার চিত্র। ধর্ম ও বুদ্ধির সংঘাতের প্রতি যেমন ইঙ্গিত করেছেন তেমনি অংগুলি নির্দেশ করেছেন আবেগ ও বিবেকের টানাপোড়নের প্রতি।

আব্বাসী যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদকরণের ক্ষেত্রে আব্বাসীয় শাসকগণও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুবাদকগণ বিভিন্ন দেশের সাহিত্যভাণ্ডার থেকে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যাসহ অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। এযুগে খলিফা, লেখক, গবেষক, অনুবাদক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কেবল ব্যক্তিগত ব্যবহারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; বরং সেগুলো জ্ঞানান্বেষী শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য উন্মুক্ত এক প্রাণবন্ত বিদ্যাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। দূর-দূরান্ত থেকে আগত পাঠক এসব গ্রন্থাগারে অধ্যয়নের সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

পেতেন; গ্রন্থাগারের স্বত্বাধিকারীগণ তাঁদের জন্য দুর্লভ ও মূল্যবান গ্রন্থ সহজলভ্য করতেন এবং জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে আর্থিক ব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থসমৃদ্ধ এ সংগ্রহশালাগুলো জ্ঞানের প্রতি আব্বাসীয়দের গভীর অনুরাগ ও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে। ব্যক্তিগত সম্পদকে সমাজের বৌদ্ধিক পুঁজিতে রূপান্তর করার এ প্রবণতা অনুবাদ আন্দোলোনের বিকাশ এবং সামাজিক সংহতির প্রতি এক সুস্পষ্ট দায়িত্ববোধের প্রতিফলন হিসেবে ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

আব্বাসী যুগে শিক্ষা কেবল তথ্য আহরণের অনুশীলন ছিল না; এটি ছিল এক মহৎ জীবনদর্শন-যার স্তম্ভের ওপর নির্মিত হতো সমাজের কাঠামো, রাষ্ট্রের নীতিমালা এবং মানুষের নৈতিক চরিত্র। জ্ঞান তখন নিছক বিদ্যা ছিল না; বরং ছিল দায়িত্ব, সাধনা ও আত্মশুদ্ধির এক উজ্জ্বল পথ। খলিফাদের দূরদর্শী পৃষ্ঠপোষকতা, আলেম-উলামাদের নিরলস অধ্যবসায় এবং বিদ্যানুরাগী জনগোষ্ঠীর আন্তরিক সহযোগিতায় শিক্ষাব্যবস্থা লাভ করে সুসংগঠিত রূপ। মসজিদ থেকে রাজদরবার–সর্বত্রই জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল। শিক্ষালাভ ছিল সম্মানের, শিক্ষাদান ছিল মর্যাদার; আর জ্ঞানচর্চা পরিণত হয়েছিল ইবাদতের এক পবিত্র রূপে। তাছাড়া আব্বাসী যুগের অন্তিমপর্বে মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয় আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে আজও এ প্রতিষ্ঠান ইসলামী শিক্ষা ও চিন্তার জগতে আলোর দিশারী হয়ে আছে; যার মিনার থেকে বিচ্ছুরিত জ্ঞানের আভা কেবল মিশরেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় অনির্বাণ শিখা প্রজ্বলিত করে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী

১. আল-কুরআন।

১. আল-হাদীস।

২. আদ-দামুর, হামিদ হাসান, *আত-তারবিয়্যাতু ওয়াত তা'লিমি ফিল ইরাকী ফিল আসরিল আব্বাসীল আওয়াল* (জর্ডান: জামিয়াতু মু'তাহ, ১৯৯৬ খ্রি.)।

৩. আতাল্লাহ, ড. খিদর আহমাদ, *বাইতুল হিকমাহ ফি আসরিল আব্বাসীয়িন* (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, তা.বি), ১ম সংস্করণ।

৪. আদ-দিবয়্যান, আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ, *হুনাইন বিন ইসহাক, দিরাসাতুন তারিখিয়্যাতুন ওয়া লুগুবিয়্যাহ* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল ফাহাদ আল-ওতানিয়্যাহ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড।

৫. আদ-দিফা, আলী আব্দুল্লাহ, *আল-উলুমুল বাহসাহ ফিল হাদারাতিল আরাবিয়্যাহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, (বৈরুত: মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, ১৯৮৩ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

৬. আদ-দীন, হাকিম আস'আদ মুজাফফার, *ইলমুত তারজামাতু নাজরি* (দামেস্ক: দারুত তালাস, ১৯৮৯ খ্রি.)।

৭. আদ-দামেস্কী, হাফিজ বিন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বৈরুত: মাকতাবুতুল মায়া'রিফ, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.), ১০ম খণ্ড, ৮ম সংস্করণ।

৮. আস-সাইয়্যাল, ড. জামাল উদ্দীন, *তারীখুত-তারজামাহ ওয়াল-হারাকাতুস-সাকাফাহ-ফি আসরি মুহাম্মদ আলী* (মিশর: দারুল-ফিকরিল আরবী, ১৯৫১ খ্রি.)।

৯. আল-মাহিরী, আব্দুল কাদির, *কিতাবুন নিমরু ওয়াস সা'লাবু লি সাহল বিন হারুন* (তিউনিসিয়াহ: জামিয়াতু তিউনিস, ১৯৬৪ খ্রি.)।

১০. আল-কাতিবী, হিসাম উদ্দীন হাসান, *শারহু কিতাবি ইসাগুজি ফি ইলমিল মানতিকী* (বৈরুত: দারুদ দুখ্‌খান, ১৪৩৬ হি.), ২য় সংস্করণ।

১১. আল-বুরদী, মুহাম্মদ আব্দুল হাদী, *রসাইলুল কিন্দী আল-ফালসাফিয়্যাহ* (মিশর: মাতবায়াতুল ই'তিমাদ, ১৩৬৯ হি./১৯৫০ খ্রি.)।

১২. আল-কাত্তানী, মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, *নিজামুল হুকুমাতিন নাবওয়াতিল মুসাম্মা আত-তারাতিলুল ইদারিয়্যাহ* (বৈরুত: শারিকাতু দারিল আরকাম ইবনিল আরকাম, তাবি), ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আল-কিফাতী, *আখবারুল উলামাউ বি আখবারিল হুকামাউ* (মিশর: দারুল কুতুবুল খুদাইবিয়্যাহ, ১৩২৬ হি.)।

১৪. আল-হুসাইনী, ড. ফাদিল মুহাম্মাদ, *আফাকুল হাদারাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ* (ওমান: দারুশ শুরুক, ২০০৬ খ্রি.)।

১৫. আল-ইসফাহানী, আল-রাগিব, *আল-মুফরাদাতু ফি গ'রিবিল কুরআন* (মিশর: মুসতাফা আল-বাবি আল-হালাবি, তা.বি)

১৬. আয-যায়্যাত, আহমদ হাসান, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (দারুন-নাহদা: মিশর তা.বি.), ২৪তম সংস্করণ।

১৭. আল-গামরাভী, আহমদ, *আন-নাকদুদ তাহলীলী, ফিল আদাবিল জাহেলী* (কায়রো: মাকতাবাতুস-সালাফিয়্যাহ, ১৯২৯ খ্রি.)।

১৮. আল-কাক, ফকতূর, *ইবনুল-মুকাফফা আদীব-আল-আকল* (বৈরুত: দারুল কুত্তাব আল-লুবানী, ১৯৭৩ খ্রি.)।

১৯. আল-ফাখুরী, হান্না, *তারিখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল বুলিসিয়্যাহ, ১৯৮০ খ্রি.), ১০ম সংস্করণ।

২০. আল-যারকানী, মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, *মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ।

২১. আল-বাশারী, আজীজ ও আহমদ দায়েফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (মিশর: মাতবা'আহ আল-মা'আরিফ, তা.বি), ১ম ও ৪র্থ খণ্ড।

২২. আত-তানুখী, আবু আলী আল-হাসান, *নাশরুল মুহাদারা ওয়া আখবারুল মুজাকারাহ* (দামেস্ক: ১৩৪৮ হি.), ৮ম খণ্ড।

২৩. আল-ইসফাহানী, আবুল ফারাজ, *আল-আানী* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রি.)।

২৪. আল-আন্দালুসী, আবু দাউদ সুলাইমান বিন হাসান (ইবনে জুলজাল), *তব্কাতুল আতিব্বাউ ওয়াল হুকামাউ* (কায়রো: দারুল কুতুবুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৫৫ খ্রি.)।

২৫. আদ-দাওরী, আব্দুল আজিজ, *ইলমুত তারিখ* (বৈরুত: আল-কুলিকিয়া, ১৯৬০ খ্রি.)।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. আন-নিশাপুরী, আল-হাকিম, *মা'য়ারিফাতু উলুমিল হাদিস* (কায়রো: মাতবায়াতু দারিল কুতুব, ১৯৩৭ খ্রি.)।

২৭. আমিন, আহমাদ, দুহাল ইসলাম (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১৯৩৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, ১০ম সংস্কারণ।

২৮. আমীন, আহমাদ, *জহরুল ইসলাম* (কায়রো: মাকতাবাতুল লাজনাহ ওয়াত তালিফ ওয়াত তাজামাহ ওয়ান নাসর, ১৩৭১ হি./১৯৫২ খ্রি.), ১ম খণ্ড।

২৯. ইব্রাহীম, ফাদিল খলীল, *খালীদ বিন ইয়্যাজিদ সীরাতুহু ওয়া ইহতিমামুহুল ইলমিয়্যাহ: দিরাসাতান ফীল উলুমি ইন্দাল আরব* (বাগদাদ: দারুল হুররিয়্যাহ, ১৯৮৪ খ্রি.)।

৩০. ইবনে কাসীর, ইমাদ উদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাইল, *আল-বিদায়্যাহ ওয়ান নিহায়্যাহ* (বৈরুত: মাকতাতুল মা'য়ারিফ, ১৯৮৫ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ৯ম খণ্ড।

৩১. ইবনে খাল্লিকান, শামসুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আবু বকর, *ওফায়্যাতুল আ'য়ানি ওয়া আনবাউ আবনায়ীজ জামান* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, ১৩৬৭ হি./১৯৪৮ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ।

৩২. ইবনে কুতাইবা, *আশ-শিরু ওয়াশ-শু'আরা* (বৈরুত: দারুস সাকাফা, ১৯৬৪ খ্রি.)।

৩৩. ইবনে নাদিম, *আল-ফিহরিস্ত* (বৈরুত: দারুল মা'য়ারিফ, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্কারণ।

৩৪. ইবনে খালদুন, আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ, *আল-মুকাদ্দিমাহ* (বৈরুত: দারুল জাইল, ১৯৮২ খ্রি.), ৫ম সংস্করণ।

৩৫. ইবনে হাম্বল, ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি), ৫ম খণ্ড।

৩৬. ইসমাইল, রাফিদাহ ইসমাইল আতাউল মান্নান, *বাইতুল হিকমাহ আল-বাগদাদী ওয়া আসারুহু ফিল হারাকাতিল ইলমিয়্যাহ ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যাহ* (সুদান: জামিয়াতু খুরতুম, ২০০৯ খ্রি.)।

৩৭. উদ্দীন, আহমদ ইসাম, *হারাকাতুত-তারজামাহ ফি মিশর ফিল করনিল ইশরীন* (মিশর: আল হাই'আহ আল-মিসরিয়্যাহ আল-আমাহ লীল কিতাব, ১৯৮৬ খ্রি.)।

৩৮. উসাইবিয়াহ, ইবনে আবি, *উয়ুনুল আনবিয়্যা ফি তব্কাতুল আতিব্বা* (বৈরুত: দারুল মাকতাবাতুল হায়্যাহ, তা.বি)।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. কামাল বাশশার, *দিরাসাতুন ফি ইলমিল লুগাহ* (কায়রো: দারুল গারিব, তা.বি)।

৪০. কাসিম, আবদুহু কাসিম, *আদ-দিনু ওয়াত তালিমু ওয়াল ইলমু ফিল আসরিল আব্বাসী* (ইংল্যান্ড: আল মারকাজুল কওমী লিত তারজামাতি, ২০১৬ খ্রি.), ১ম সংস্করণ।

৪১. খুরশীদ, ইব্রাহীম জাকি, *আত-তারজামাতু ওয়া মুশকিলাতুহা* (মিশর: আল-হাইয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ আল-আমাহ লীল কিতাব, ১৯৮৫ খ্রি.)।

৪২. জাইতুনী, লতীফ, *হারাকাতুত তারজামাহ ফি আসরিন-নাহদাহ* (বৈরুত: দারুল-নাহার, ১৯৯৪ খ্রি.)।

৪৩. তাক্কুশ, ড. মুহাম্মাদ সুহাইল, *আত-তারিখুল ইসলামিল ওয়াযিজী* (বৈরুত: দারুন নাফাইস, ১৪৩২ হি./২০১১ খ্রি.), ৫ম সংস্করণ।

৪৪. দায়িফ, ড. শাওকী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আসরুল আব্বাসীল আওয়াল* (মিশর: দারুল-মায়ারিফ, তা. বি), ৯ম সংস্করণ।

৪৫. নাজ্জার ড. আমের, *হারাকাতুত তারজামা ওয়া আহাম্মু আ'লামুহা ফিল আসরিল আব্বাসী* (কায়রো: দারুল মা'য়ারিফ, ১৯৯৩ খ্রি.)।

৪৬. নাজিব, আব্দুর রহমান হিকমত, *দিরাসাতু ফি তারিখিল উলুমি ইন্দাল আরব* (ইরাক: জামিয়াতুল মুসিল, ১৯৯৭ খ্রি.)।

৪৭. নাসির, ড. জামাল আবদে ও ড. আব্দুল ওয়াহাব আল্লুব, কিতাবু ফান্নুত তারজামাহ (কায়রো: দারুস সিকাফাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৯৮৯ খ্রি.)।

৪৮. ফররুখ, ওমর, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালায়িন, ১৯১২ খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

৪৯. ফারহাত, হাশেম, *হারাকাতুত তারজামা ফি মিশর* (কায়রো: আল-আরাবী লিন-নাসরী ওয়াত-তাওজী, ১৯৯১ খ্রি.)।

৫০. বাসারী ও আহমদ দারফ, *আল-মুফাসসাল ফি তারীখিল আদাবিল আরাবী* (বৈরুত: দারুল ইয়াহইয়া আল-উলুম, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ।

৫১. ব্রুকলম্যান, কার্ল, *তারিখুশ শু'উবুল ইসলামিয়্যাহ* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালায়িন,, ১২৭৯ হি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৫২. ব্রুকলম্যান, কার্ল, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, অনু. ড. আব্দুল হালিম আন-নাজ্জার (কায়রো: দারুল মা'য়ারিফ, তা.বি), ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংস্কারণ।

৫৩. মারসাফী, হাসান নাসিল (সম্পা.), ইবনুল-মুকাফফা, *কালীলা ওয়া দিমনা* (বৈরুত: দারুল-মাসিরা, ১৯৮০ খ্রি.)।

৫৪. মাহমুদ, হাসান আহমাদ এবং আশ-শারিফ, আহমাদ ইব্রাহিম, *আল-আলামুল ইসলামী ফিল আসরিল আব্বাসী* (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৭৭ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ।

৫৫. মুনতাসির, ড. আব্দুল হালিম, *তারিখুল ইলমি ওয়াদ দাওরিল উলামাউল আরাব ফি তাকাদ্দুমিহী* (কায়রো: দারুল মা'য়ারিফ, তা.বি), ৮ম সংস্করণ।

৫৬. মুহাম্মাদ, ড. ফওজী আতিয়া, ইলমুত তারজামা মাদখালুন লুগবিউন (কায়রো: দারুস সাফা আল জাদিদাহ, তা.বি)।

৫৭. যায়দান, জুরজী, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ* (বৈরুত: মানশুরাতু দারি মাকতাবাতিল হায়াহ, ১৯৯২ খ্রি.)।

৫৮. রুহী বেক, *তারিখু ইলমুল আদব* (মিশর: ইদারাতুল-হেলাল বিল ফাজালাহ, ১৯১২ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

৫৯. সালমা, মারিয়াম, (অনু.) ড. নাজীব গাজাভী, *আত-তারজামাতু ফিল আসরিল আব্বাসী* (দামেস্ক: মানশুরাতু ওয়াজারাতু-আস-সাকাফাহ, ১৯৯৮ খ্রি.।

৬০. হাসান, আলী ইব্রাহিম, *আত-তারিখুল ইসলামী আল-আমুল জাহিলী আদ-দাওলাতিল আরাবিয়াহ, ওয়াদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদা আল-আরাবিয়্যাহ, ১৯৬০ খ্রি.)।

৬১. হাসান, ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলামিস সিয়াসী ওয়াদ দিনী ওয়াস সাকাফী ওয়াল ইজতিমায়ী* (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাহ, ১৯৫৩ খ্রি.), ২য় খণ্ড।

৬২. হামাদা, মুহাম্মাদ মাহির, *আল-অসায়িকুস সিয়াসাতিল ইদারাতিল আয়িদাহ লিল আসরিল আব্বাসীয়্যাতিল মুতাতাবিয়্যাহ* (বৈরুত: মুয়াসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮২ খ্রি.)।

৬৩. হামিদ, ড. এরফান আব্দুল, *আল-ফালসাফাতুল ইসলামিয়্যাহ* (বাগদাদ: দারুত তারবিয়্যাহ, তা.বি)।

৬৪. হুসাইন, ড. ত্বহা, *ফিল আদাবিল জাহেলী* (মিশর: দারুল মা'য়ারিফ, তা.বি) ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. হুসাইন, মুহাম্মদ ও কুদুর মুলুক, *দাওরু হারাকাতিত তারজামাহ ওয়ান নাক্‌ল ফিল হায়াতিল ইসলামিয়্যাতি ইবানাল আসরিল আব্বাসিল আওয়াল* (আলজেরিয়া: আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা মন্ত্রনালয়, ২০১৪ খ্রি.)।

৬৬. শাহারজাদ, বিন উসমান, *মাদ্‌খাল হাউলু ইলমুত তারজামাহ* (আলজেরিয়া: আবি বকর বেলকাইদ ইউনিভার্সিটি, তা.বি)।

বাংলা

১. আলী, ড. আহমদ, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস* (চট্রগ্রাম: আল-আকিব প্রকাশনী; ২০০৪ খ্রি.)।

২. আব্দুস সাত্তার, *আধুনিক আরবী সাহিত্য* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৪ খ্রি.।

৩. আসাদুজ্জামান, মুহাম্মদ, *অনুবাদের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০০৮ খ্রি.)।

৪. ইসলাম, ড. মুহাম্মদ শহীদুল, *আরবী অনুবাদ সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (*ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১৯ খ্রি.), প্রথম প্রকাশ।

৫. উদ্দীন, আ.ত.ম মুছলেহ, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ খ্রি.), ৩য় প্রকাশ।

৬. করীম, মুহাম্মদ রেজা-ই, *আরব জাতির ইতিহাস* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৯ খ্রি.), ৬ষ্ঠ মুদ্রণ।

৭. চৌধুরী, ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল, *প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন* (চটগ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৯ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

৮. জাহাঙ্গীর, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত* (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রি.), প্রথম প্রকাশ।

৯. বারী, ড. এম.এম. শরিফুল, *আব্বাসীয় খেলাফত ও আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০২২ খ্রি.), ১ম প্রকাশ।

১০. মুখোপাধ্যায়, বিমল কুমার, *সাহিত্য বিচারতত্ত্ব ও প্রয়োগ* (কলিকাতা: দে'জ পাবলিসিং, ১৯৮৯ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

১১. মেহেরুল্লাহ, জি.এম, *আরবী কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য* (ঢাকা: নাহদা প্রকাশনী, ২০১৪ খ্রি), ২য় সংস্করণ।

১২. সরকার, মো. আবুল কালাম, *বাংলাদেশে ফারসী অনুবাদ সাহিত্য* (বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১৫ খ্রি.), প্রথম প্রকাশ।

১৩. সাজ্জাদ, হোসায়েন সৈয়দ, *আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

ইংরেজি

১. Armajani, Yahya, *Middle East Past and Present* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, USA, 1970).

২. Adetunji, Dr. Barihi, *Translation, Arabic-English* (Nigeria: National Open University, 2010.).

৩. Brugman, J. (ED), *An Introduction to the History of the Modern Arabic Literature in Egypt* (Leiden: E. J. Brill, 1984).

৪. Gutas, Dimitri, *Greek Thought, Arabic Culture* (London: Routledge, Rep. 1999).

৫. Hastings, James (Edited), *Encyclopedia of Religion and Ethics* (New York: Charles Scribner's son) Vol. 1-4.

৬. Haywood, John, *A Modern Arabic Literature1800-1970* (London: Lund Humphries, 1971).

৭. Heal, S. Kristian, *Hunayn Ibn Ishaq on His Galen Translation* (USA: Brigham Young University Press, 2016).

৮. Hitti, P.K., *History of the Arabs* (London: Macmillan & Co.Ltd, 1961).

৯. Imarah, Muhammad, *Rifaah Al-Tahtawi* (Cairo: Darul Sharuq, 1988).

১০. John Tolan and others, *Europe and the Islamic World* (USA: Princiton University Press, 2013).

Dhaka University Institutional Repository

১১. J.M Ashmand, *Ptolemy's Tetrabiblos or Quadripartile* (Londone: W.Foulsham & co. Lit.), New edi.

১২. Kalkavage, Peter (tra. & edi.), *Plato Timaeus* (USA: Hackett Publishging Company, 2016,) 2nd edi.

১৩. Mahdi, Ismat, *Modern Arabic Literature 1900-1967* (Hyderabad: Da'iratul Ma'arif Press, 1983), 1st Pub.

১৪. Nicholson, R.A., *A. Literatury History of the Arabs* (*London*: Cambridge University Press, 1930).

১৫. Rylands, Thomas Glazebrook, *The Geography of Ptolemy Elucidated* (Dublin: University Press, Ireland's, 1893).

১৬. Stevenson, Edward Luther (Tran. & Ed.), *Claudius Ptolemy the Geograyhy* (New York: Dover Publications, Inc. 1991), First Pub.

১৭. Waheed K. Abdul, *Islam and the Ornigins of Modern Science* (Lahar: Islamic Publication, 1967).

অভিধান ও গবেষণা পত্রিকা

১. আল-জিরকালী, খায়ের আদ-দীন, *আল-আলাম* (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালায়িন, ২০০২ খ্রি.), পঞ্চদশ সংস্করণ, ২য় খণ্ড।

২. তারাবিশী, জর্জ, *মু'জামুল ফালাসাফাহ* (বৈরুত: দারুত তালিয়্যাহ, ২০০৬ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ।

৩. নাজিব, ড. উজুদ্দীন মুহাম্মাদ, *উসুসুত তারজামাহ মিনাল ইনজিলিঝ্যিায়াতি ইলাল আরাবীয়্যাতে ওয়া বিল আকসী* (কায়রো: মাকতাবাতু ইব্ন সীনা, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.)।

৪. নাসির ড. জামাল আবদে, *আত-তারজামাতু ওয়াত তা'রিব, মাজাল্লাতুল ফায়সাল আস-সাকাফাতুশ শাহ্‌রিয়্যাহ* (রিয়াদ: জমাদিউল উলা, ১৪১৭ হি./সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯৬ খ্রি.), সংখ্যা, ২৩৯।

৫. বা'লাবাক্কী, মুনির ও ড. রমযী মুনির বা'লাবাক্কী, *আল-মাওরিদ আল-হাদীস,* ইংরেজি-আরবী (বৈরুত: দারুল ইলম লিল্ মালায়িন)।

Dhaka University Institutional Repository

৬. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র, *সংসদ (বাংলা-ইংরেজি) অভিধান* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০০ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ।

৭. মেসবাহ, আবু তাহের, আল-মানার (ঢাকা: মুহাম্মদী লাইব্রেরি, ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রি.)।

৮. রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৭ খ্রি.), ৪র্থ সংস্করণ।